

প্রকাশক :  
শ্রীঅনিলকুমার সরকার  
এ. কে. সরকার অ্যান্ড কোং  
১/১এ বক্স চ্যাটার্জী স্ট্রীট  
কলিকাতা-৭০০ - ৭০

প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৯,

মুদ্রাকর :  
বনোদা মাইতি  
জিনিমুদ্রণ  
৫২/১ নীতারাং ঘোষ স্ট্রীট  
কলিকাতা-৭০০ ০০২

## উৎসর্গ

প্রাচীন ইরানীর শাস্ত্রে আমার শিকাগুরু, শকাব্দিয়ার পাঠে ও গবেষণায়  
আমার দীক্ষাগুরু পরম প্রফেসর অধ্যাপক ডঃ ইবাচ্, জাহাজীর মোরারবজী  
ভারাপুরওয়ারা-র শতাব্দির অগ্নিনির্ভেদে তাঁর গুণাবলির উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থখানি  
গুরুপূজারূপে নিবেদন করলুম ।



## ভূমিকা

প্রবন্ধাবলী ( ১ম খণ্ড—বিচিত্র-সেবত! ) বইটিতে যে প্রবন্ধগুলি সংকলিত সেগুলির অধিকাংশই শাবকীয় ও বার্ষিক আনন্দবাজার পত্রিকায় বার হয়েছিল। তিনটি ছাড়া বাকিগুলি বেরিয়েছিল বিশ্বভারতী পত্রিকায়, চতুর্থ, বিতাব, দক্ষিণীবার্তা, অব্যত ইত্যাদি পত্রিকায়। রামকথার তত্ত্ব প্রবন্ধটি বেরিয়েছিল ‘রাম কথার উদ্ধাবীজ’ নামে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায়। ‘ধর্মঠাকুরের ইতিহাস’ ও ‘নাথ-পন্থের সাহিত্যিক ঐতিহ্য’, দুটি গ্রন্থের ভূমিকারূপে প্রকাশ হয়েছিল। সে বইটির তেমন প্রচার না হওয়ায় এখানে দেওয়া গেল।





## সূচী-পত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. বিষ্ণু-কৃষ্ণ-কথা	১
২. আদিতে বাক্য ছিলেন	১৭
৩. কি এ বক	২৫
৪. দেবীজ্জন্ম	৩২
৫. ইন্দ্রের উদয়াস্ত	৪৬
৬. তত্ত্বের আদ্য কথা	৫৭
৭. লঙ্কাভ্রম-ক্লেমে চণ্ডী কমলে-কামিনী ?	৬৭
৮. মহাদেবী নিত্য	৭৬
৯. চূর্ণাপূজার বোধন কেন	৯০
১০. হরি-হর, সান্না-কালো দেবতা ও তিন কালী	১০৯
১১. ধর্মঠাকুরের ইতিহাস	১১০
১২. ত্রীক্ষেত্রের ঠাকুর	১১৩
১৩. রথযাত্রা : ত্রীক্ষেত্রের পুরুষোত্তম পুণী ও ত্রিদেব	১৪১
১৪. সিদ্ধিদাতা দেবতা	১৪৬
১৫. ভারতচন্দ্রের অন্নদা	১৫০
১৬. শিব-ঠাকুর ও সম্পর্কিত নারী-দেবী	১৫৩
১৭. জৈন বৌদ্ধ ও সিদ্ধ সাধনার প্রাগিতিহাস	১৬১
১৮. নাথ-পন্থের সাহিত্যিক ঐতিহ্য	১৬৮
১৯. রামকথার তত্ত্ব	১৯৭
২০. সীতাকথা প্রাচীনত্ব ?	২৪০
২১. কর্তাভাষার কথা ও গান	২৫০



## বিষ্ণুকৃষ্ণ-কথা

ঋগ্বেদে যে প্রাচীন দেবতাদের স্মরণীয়তাই আছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিষ্ণু। ঋগ্বেদীয় দেবতার মধ্যে বিষ্ণুর প্রাধান্য ও মাহাত্ম্য এককথায় সোজাছবি বলা যায় না। ঋগ্বেদের সূক্তগুলিতে বিষ্ণুর বহুটা উল্লেখ আছে কিন্তু তাঁর বিষয়ে সূক্ত চার-পাঁচটির বেশি নেই। এই হিসেব ধরলে বিষ্ণুর স্থান ঋগ্বেদীয় দেবতাদের মধ্যে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে। কিন্তু বিষ্ণুর পরাক্রমের ও মাহাত্ম্যের যে বিবরণ পাই ঋগ্বেদের বিভিন্ন সূক্তে তাতে তাঁকে প্রধানতম দেবতা ইন্দ্রের পাশাপাশি এমন কি ইন্দ্রের চেয়েও বড়ো স্থান দিতে হয়। ঋগ্বেদের মুখ্য দেবতা যে ইন্দ্র তাতে কোনও সন্দেহ নেই। প্রায় এগারো শ সূক্তের মধ্যে ইন্দ্রের স্তব সংখ্যায় প্রায় এক-চতুর্থাংশ। তবুও বিষ্ণুর কৃতিত্ব ও মাহাত্ম্য কিছু কম নয়, এমন কি অনেক বেশি। ইন্দ্রের সকল বীরকর্মে বিষ্ণু তাঁর সহায়তা করেছেন, বৃদ্ধবধে, শব্বরের নিরানন্সইটি দুর্গ জয়ে (এই কাজে চরিশ বছর লেগেছিল), স্থূল-ওষ্ঠ দাসের মারা শক্তিনাশে, অশ্বর বচীর লক্ষ সৈন্যের পরাভবে। সর্বত্র বিষ্ণু ইন্দ্রের সহায়ক ও সখা (“ইন্দ্রস্ত বৃজাঃ সখা”)। ইন্দ্র নবীন দেবতা এবং তিনি কৃতিত্বের দ্বারা সমস্ত প্রাচীন দেবতাকে পরাজিত করেছিলেন (“দেবো দেবান্ ক্রতুনা পৰ্ব্ভবৎ”)। তাহলে বিষ্ণুর সম্বন্ধে এই ব্যক্তিক্রম কেন?

বিষ্ণুর সঙ্গে যে ইন্দ্রের প্রতিযোগিতা হয়েছিল তা ঋগ্বেদেই পাওয়া যায়।

উভা জিগ্যথু ন পরাজয়েথে

ন পরাজিপ্যে কত্তরশ্চনৈনোঃ।

ইন্দ্রশ্চ বিষ্ণো যদপ্পৃথোঃ

জ্জোহা সহস্রং বি তদ্ ঐরদেধাম্ ॥ ৬.৬২.৮ ॥

‘উভয়ে লড়েছিলেন, কিন্তু পরাজিত হননি। এঁদের দুজনের কেউই পরাজিত হননি। হে বিষ্ণু, আপনি আর ইন্দ্র যখন লড়েছিলেন তখন তিন হাজার বার চীৎকার করেছিলেন।’

এর থেকে অনুমান করা যায় যে, বিষ্ণু-দেবতার দলের সঙ্গে ইন্দ্র-দেবতার দলের বিরোধ হয়েছিল এবং সে বিরোধের বীমাংসা হয়েছিল দেবতাদ্বয়ের সম্মুখীন। সুতরাং ঋগ্বেদে বিষ্ণু ইন্দ্রের সহযোগী এবং প্রধান দেবতা।

নিজের কৃতিত্বে বিষ্ণু ঋগ্বেদের সর্বপ্রধান দেবতা। তিনি আকাশকে উর্ধ্বে তুলে দিবে (এ ব্যাপার অস্ত্র দেবতার উপরও আরোপ করা আছে) এবং পৃথু দিগন্তকে হৃদয়প্রসারী করে দিবে তিনি বিশ্বতুবন পায়ে বেড়িয়ে যার দেবতা সকলের জন্তে ঠাই করে দিয়েছিলেন। তাঁরই তিন পদক্ষেপ ক্ষেত্রে “অবিক্রিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা”, বিশ্বতুবন বিস্তার করে। বিষ্ণুর উর্ধ্বতম পদ ব্যোমের উচ্চতম লোকে, তা সদা দেখতে পার ভক্তেরা, যেন টানা চোখ আকাশের এপার ওপার (“দিবীচক্ষুঃ আততম্”)। উর্ধ্বতম বিষ্ণুপদ আনন্দে থাকে দেবভক্ত ব্যক্তির। (“নরো যত্র দেবয়বো যদন্তি”)। মাছুবেও ইন্দ্র ও বিষ্ণুর সেই লোকে যাবার কামনা করে (“তা বাৎ বাতুনি উশ্বসি গম্যে”)। সেখানে মধুর স্বরগা বলে যায় (‘বিক্ষো পদে পরমে মধু উৎসঃ’), সেখানে শৃঙ্গবান্ কিশিপ্রগামী গোক আছে প্রচুর (‘যত্র গাবো ভুরিশৃঙ্গা অব্যমঃ’)।

এই যে বিষ্ণুলোকের ছবি পাই এতে তো পৌরাণিক ভাবনার গোলোকেরই পূর্বাভাস পড়েছে। তবে বৈদিক কবি পরবর্তী কালের ধর্মচিন্তকদের মতো পুরোপুরি পরলোকপরমী ছিলেন। তাঁরা আর দুটি বিষ্ণুপদকেও—অন্তরীক্লোক এবং ভুলোক—মকর মধুপূর্ণ বলেছেন (‘যস্য জীঃ পূর্ণা মধুনা পদানি অক্ষীরমাণা অবরা যদন্তি’)।

কৃষ্ণের ব্রজলীলার আরও পূর্বাভাসও বেদের সূক্তে যে পড়ে নি তা নয়। বিষ্ণু গোক চরান (“বিষ্ণুঃ গোপাঃ” ১.২২.১৮)। তিনি গোয়ালের আগড় খুলে দেন সখার সঙ্গে (“ব্রজঃ চ বিষ্ণুঃ সখিবী অপোগৃতে” ১.১৫৬.৪)। তবে তিনি শিশু নয়, প্রকাণ্ডকার নবাব। (“বৃহচ্ছরীর... যুবাকুমাঃ” ১.১৫৫.৬)।

ঋগ্বেদের ইন্দ্র ও বিষ্ণু যেন পুরাণের বলদেব ও বাহুদেব। গোকুলে তাঁরা খেলাধুলার ঝগড়া মাঠামারি করতেন। বিষ্ণু ইন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সখা (“ইন্দ্রস্ত যুজাঃ সখা”), তাঁরা পরস্পর লড়াই করতেন এবং কেউ কাউকে হারাতে পারতেন না।

উভা জিগ্যাথু ন পরাজয়েথে

ন পরাজিগ্যে কতরশ্চনৈনোঃ।

ইন্দ্রশ্চ বিক্ষো যদপসৃধেথাঃ

জেষা সহস্রং বি তদ্ ঐরয়েথাঃ ১.৬২.৮।

‘ব্রজমেই জিতেন, কেউ পরাজিত হলেন না। ঐদের দুজনের কেউই পরাজয় পেয়েছেন না। হে বিষ্ণু, ইন্দ্র (আর আগনি) যখন পরস্পর কুবেছিলেন তখন তিন হাজার বার লড়াই করেছিলেন।’

ঋগ্বেদের বিশিষ্ট দেবতাদের মধ্যে ছিলেন যুগলদেব ধানের পুরানো নাম ছিল নাসত্য, কিন্তু ঋগ্বেদে ধারা অশ্বী (অর্থাৎ অশ্ববান্ দেবতা) নামেই প্রায় সর্বদা উল্লিখিত। এই যুগল দেবতাকে ইন্দ্র-বিষ্ণু জোটের সঙ্গে তুলনা করা যায়, বিশেষ করে বিষ্ণুর সঙ্গে (ইন্দ্রের সঙ্গে এঁদের বোধ হয় কিছু অসমতাব ছিল)। বিষ্ণু মধুর ভাগুরী অর্থাৎ আড়তদার, stockist আর অশ্বীরা হলেন মধুদাতা অর্থাৎ দোকানদার, distributor।

অশ্বীরা হলেন ছৌ-এর পুত্র ("দিবোন পাতা", গ্রীক ঐতিহ্যে Dios kouri। এঁদের সব কর্মই একত্র। এঁরা মহোদর, ভগিনী হল এঁদের উবা। উবা আবার প্রেমসীও বটেন। ঘরের ঠাকুর, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের ভালোমন্দের জন্তে যে দেবতার দোহাই পাড়া হয় তেমন দেবতা ঋগ্বেদে প্রধানত, এমন কি একমাত্রও বলা চলে, এঁরাই। দুঃস্থ ও দুর্গত মানুষ ও জীব এঁদের দ্বারা উদ্ধার পেয়েছে। এসব মাহাত্ম্য এঁদের উল্লিখিত আছে ঋগ্বেদে। তাঁরা ভূজ্ঞাকে সমুদ্রে নৌকাডুবি থেকে উদ্ধার করেছিলেন, বৃদ্ধ চাগনকে যুবা করে দিয়েছিলেন, অত্রিকে অগ্নিদাহ থেকে এবং বন্দনকে গভীর গর্ত থেকে উদ্ধার করেছিলেন, ক্ষতবিক্ষত মৃতকল্প রেশমকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন, বিম্বকে পত্নী জুটিয়ে দিয়েছিলেন, ক্রুদ্ধ পিতা কর্তৃক অস্বীকৃত ঋজ্ঞাকে চক্ষুমান্ন করে দিয়েছিলেন, খণ্ড বিশ্ণুলাকে কাঠের পা করে দিয়েছিলেন, আইবুড়ো ঘোষার বিবাহ ঘটিয়ে দিয়েছিলেন, শয়ুর বুড়ো গাইকে দুধালো করে দিয়েছিলেন, বটের পার্থিকে নেকড়ে বাঘের মুখ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

অশ্বীরা উবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন। এঁরা তিনজনে যেন রাত্রি-দিন ও দিনরাত্রির সন্ধিকণের প্রতীক ছিলেন। বৈদিক কবির ভাবনায় যেমন নক্স (রাত্রি) ও উবা ছিলেন দুই বোন, একজন কালো একজন করসা, তেমন অশ্বী দুজনও ছিলেন রাত্রির ও দিনের প্রতীক; একজন হলেন কালো দিন ("অহশ চ কক্ষম্") আর একজন হলেন করসা দিন ("অহর্ অর্জুনঃ চ")। এই কালো সাদার বৈপরীত্য পৌরাণিক কৃষ্ণবিষ্ণু-কথার বাহুদেব ও বলরাম (এবং মহাত্মারতীর আখ্যানে কৃষ্ণ ও অর্জুনের) মধ্যে দেখা যায়। ইন্দ্র ও বিষ্ণুর মধ্যে রঙে এমন বৈপরীত্য ছিল কিনা জোর করে বলা যায় না, তবে অতীতকাল দিয়ে বৈদিক ইন্দ্রবিষ্ণু যে পৌরাণিক সন্ধ্যা-বাহুদেবের ও মহাত্মারতীর কৃষ্ণার্জুনের সঙ্গে তুলনীয় তা পরের আলোচনার প্রতিপন্ন হবে।

ঋগ্বেদের পরে (অথবা সঙ্গে সঙ্গে) ঋগ্বেদীয় (এবং অতিরিক্ত অজ্ঞাত) মিথের সোজানুজি দ্বারা প্রবাহিত হয়েছিল যে পথে তার কোনও সমসাময়িক চিহ্ন নেই। সামান্য কিছু অর্থবোধে আছে তবে তা পৌরাণিক বিশ্বগুলি বোঝার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এই চিহ্নবিহীন মিথের দ্বারা কিছু লুপ্ত হয়নি, তা প্রকাশ পেয়েছে পুরাণের বিভিন্ন আখ্যায়িকার, মহাভারতে, জনশ্রুতিবাহিত লোককথা-রূপকথায়। তবে সেখানে শুধু স্ফুটই পাকায়নি, খিটুড়িও পেকেছে। তাই পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে বৈদিক, প্রাক-বৈদিক ও অ-বৈদিক মিথের যোগাযোগ আবিষ্কার (অথবা কল্পনা) করা এত কঠিন। কিন্তু কঠিন হলেও তা সবক্ষেত্রে অসম্ভব নয়। সেই অসম্ভবের চেষ্টা অনেকে করেছেন, আমিও করছি। তবে আমার দৃষ্টিকোণ আমার পূর্বগামীদের দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু ভিন্ন। সে দৃষ্টিকোণ ঋগ্বেদের স্মৃতি আর ব্রাহ্মণের গল্পকথার পরস্পর সম্পর্ক নিয়ে।

বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীন গল্পগ্রন্থগুলি (তার মধ্যে মাঝে মাঝে অল্পস্বল্প শ্লোকও আছে) ঋগ্বেদের পরবর্তী রচনা, ঠিকই। কিন্তু কত কাল পরবর্তী রচনা, অর্থাৎ অব্যবহিত কিনা সে সম্বন্ধে গুরুতর সন্দেহ আছে। ভাষায় যে পার্থক্য দেখা যায় তার উপর নির্ভর করলে বলতেই হয় যে, ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি চের পরবর্তী কালের রচনা। কিন্তু ঋগ্বেদের স্মৃতিগুলিও তো সা একসময়ে রচিত হয়নি। ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তের (১০.৯০) ভাষা কি প্রাচীনতম ব্রাহ্মণগ্রন্থের ভাষার চেয়ে প্রাচীনতর?

আসল কথা হল ঋগ্বেদ একজাতের গ্রন্থ, ব্রাহ্মণগুলি অজ্ঞাতের। ঋগ্বেদের স্মৃতিগুলি ছিল স্মৃতিকর্তা (অথবা বিশেষ বিশেষ দেবযাজী) পুরোহিতের বংশগত সম্পত্তি এবং তা দেবপূজার প্রধান অঙ্গ-স্তব। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলি হল বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর বড় বড় যজ্ঞযাজী পুরোহিতদের দর্পণ বা কাণ্ডুক। তার মধ্যে কিছু কিছু ব্যাখ্যান এবং কথকতাও আছে। প্রধান ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি যখন লেখা হয়েছিল তখন এদেশে ধর্মকর্মে ও দেবভাবনার কিছু কিছু নুতনত্বও এসেছিল। তখন সমাজ গড়ে উঠছে রাজ্যকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণপুরোহিতদের দ্বারা। বাইরে থেকে এসেছে বিরাট অর্থসেধ-যজ্ঞের রীতি, তৈরি হয়েছে রাজসূত্র-যজ্ঞ। এলবের কোন ইঙ্গিত ঋগ্বেদে নেই। এ সবই গড়ে উঠেছিল সোমরস পান-উৎসব উপলক্ষ করে। সোম-রসের উত্তর খাকলেও আসলে সোমরস বস্তুটি যে কী তা ব্রাহ্মণরচয়িতাদের জানি-

ছিল না। তাঁরা এর অভাব সৃষ্টি করেছিলেন সম্ভবত ভাঙ। এই যে “রাখা” “রাখণ” (পুরোহিত) আর বৃহৎ বজ্রকাণ্ড তাঁর সঙ্গে জনসাধারণের বিশেষ কোনও যোগাযোগ ছিল না। এ ছিল অত্যন্ত high brow ব্যাপার। জনসাধারণের ধর্ম-অজ্ঞান ও ধর্ম-ভাবনা সরাসরি ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদের দ্বারা বেয়ে অত্যন্ত অনেক ধারাবাহী মিথের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে-রূপ ও মূর্তি নিয়েছিল তাঁর সঙ্গে ব্রাহ্মণগ্রন্থের তত্ত্বধার সঙ্গে সরাসরি যোগ নেই। তবে গোড়ার দিকে যোগ না থাকলেও অচিরে তা ঘটেছিল। দেশে ধর্মের অর্থ্যাৎ সক্তিভবন ব্যক্তির সংখ্যা বাড়ছিল এবং আভিজাত্যের জন্তে তাঁদের দাবি হতে হত ব্রাহ্মণদের। জনসাধারণের ধর্ম-ব্যাপারের ঘোঁটামুটি মিল থাকলেও তাদের এক-এক গোষ্ঠীতে (এবং জনপদে) এক-এক মিথের ও তদ্ব্যজ্ঞিত দেবতার প্রাধান্য থাকার তাদের মধ্যে দেবারাধনা-বৈচিত্র্য দেখা গেল। আমাদের অজস্র ইতিহাস-সূত্র এইখান থেকেই খুঁজে নিতে হবে।

কিন্তু আমাদের আলোচনার ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিকে উপেক্ষা করতে পারি না। লৌকিক (অর্থ্যাৎ জনসাধারণে প্রচলিত) ধর্মবিষয়ের অনেক বিশিষ্ট বস্তুর মিথ ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতেই প্রথম জন্মে উঠেছিল। ঋগ্বেদের প্রধানতম দেবতা ছিলেন অগ্নি, কেননা তিনি সকল দেবতার প্রতিভূ। সকল দেবতাকে প্রদত্ত যি দুধ রুটি ( পুরোডাশ ), মাংস, বস, অগ্নিতে উৎসর্গ করতে হত। তিনি ধার যা প্রাণ্য তা সকলকে পৌছে দিতেন। প্রত্যেক গৃহস্থগৃহে গৃহদেবতারূপে অগ্নি থাকত। সেই অগ্নিকে গৃহস্থকে (“গৃহপতি”) বিবাহকাল থেকে শুরু করে আজীবন সমস্ত পরিচর্যা করতে হত। গার্হপত্য অগ্নিকে জ্ঞান করা হত ঘরের ছেলে (“শিষ্ঠদন”)।

বিভিন্ন বৃত্তিতে বড়ো হয়েও অহরেরা দেবতাদের কাছে হটে গিয়েছিল যজ্ঞপরায়ণতার জন্তে। এই মর্মের গল্প কিছু লেখা আছে ব্রাহ্মণগ্রন্থে। তখন বিষ্ণু হয়ে দাঁড়িয়েছেন যজ্ঞের প্রতীক। হুতরাং ব্রাহ্মণে বিষ্ণুদেবতারই প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে। ঋগ্বেদে পুনঃপুনঃ উল্লিখিত বিষ্ণুর জিগাম নিক্বেপ কাহিনী ব্রাহ্মণগ্রন্থে গল্পের রূপ পেয়েছে, এবং সেই গল্পই পরে পুরাণকাহিনীতে বলি-বামনের আখ্যানে পরিণত হয়েছে। এই আখ্যান আবার প্রহ্লাদ ও হিরণ্যকশিপু পর্বত টেনে নিয়ে গিয়ে পরে বিষ্ণুর দুটি অবতারে—নুসিং ও বামন—ব্যাপ্ত হয়েছে।

ব্রাহ্মণগ্রন্থ রচনার কালে যজ্ঞপরায়ণ ব্রাহ্মণদের উচ্চ অধ্যাবৃত্তি বজ্রকাণ্ডের



নিরর্থ জটিলতার দিশাহারা হয়ে থাকেনি। সে চিন্তা দেবতা অহর ও বহু-কাণ্ড ছেড়ে বিভক্ত ব্রহ্মচিন্তার উন্নীত হয়েছিল। এই চিন্তাই প্রাচীন ভারতীয় অধ্যাত্মতাবনার উচ্চতম ক্রমের পরিচয় দেয়। প্রধান ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির পরিশিষ্ট অংশ উপনিষদগুলিতে সেই নিরপেক্ষ ব্রহ্মচিন্তাই স্থান পেয়েছে। বলতে পারি উপনিষদেই প্রাচীন ভারতবর্ষের অধ্যাত্মচিন্তার দূরতম টার্মিনাস। এই উপনিষদ থেকেই বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শনতত্ত্বের সূত্রপাত।

ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিকে বাদ দিলে আমরা ঋগ্বেদ-অথর্ববেদ আর পুরাণ-ইতিহাসের মাঝখানে পাই প্রত্নলেখ এবং দু'চারটি প্রামাণিক গ্রন্থে উল্লিখিত অথবা উদ্ধৃত কিছু কিছু তথ্য অথবা গল্পাংশ। প্রামাণিক গ্রন্থ মানে যে রচনাকে কোন নির্দিষ্ট কালে অথবা নির্দিষ্ট কালসীমার মধ্যে লিখিত বলে ধরে নেওয়া যায়। যেমন পাণিনির সূত্র, পতঞ্জলির মহাভাষ্য, পালি নিকায়গ্রন্থ, কালিদাসের কাব্যনাটক ইত্যাদি। নির্দিষ্ট কালসীমার মধ্যে যা ফেলা যায় না—যেমন মহাভারত ও পুরাণগুলি—তাকে প্রত্নলেখের ও নির্দিষ্ট কাল মধ্যে লিখিত রচনার ঐতিহাসিক মূল্য দেওয়া যায় না। এইখানে আমার আলোচনার স্বতন্ত্রতা। আমার বিবেচনায় মহাভারতের ও পুরাণগুলির বক্তব্যের ঐতিহাসিক নিট-কালমূল্য সেই সেই পুঁথি লেখার কালের বেশি উপরে যায় না। মহাভারত যে রূপে আমাদের কাছে এসে পৌছেছে তার মূল রূপ বষ্ট শতাব্দীর আগে যায় না। মহাভারতের প্রাচীন পুঁথির—তাও সমগ্রের নয়, এক-আধটি পর্বের—লিখিকাল একাংশ-দ্বাদশ শতাব্দীর আগে যায় না। অধিকাংশ পুঁথিই পঞ্চদশ-ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা। সুতরাং মহাভারতের কোন উদ্ধৃতি দিয়ে খ্রীষ্টপূর্ব কালের ঘটনার সত্যতা নিরূপণ করবার কাজ, তথ্যযুক্তির নয়। পুরাণগ্রন্থগুলির সম্বন্ধে এই কথা আরও বেশি করে খাটে। মহাভারতে জন্মতে শুরু হবার বেশ কিছুকাল পরে তবেই পুরাণগুলি জন্মতে শুরু করে। ব্যতিক্রম হল 'হরিবংশ'। এটির প্রাচীনত্ব প্রায় মহাভারতের সমসাময়িক।

ঋগ্বেদের ইজ্রাবিকু পড়ে গিয়েছিলেন উচ্চবর্ণের—ব্রাহ্মণদের ভাগে, আর অশ্বী দুজন পড়েছিলেন নিরবর্ণের—জনসাধারণের ভাগে। দুটি জোড়া দেবতাই পরে ব্রাহ্মণ্যধর্মের মিশে গিয়েছেন—প্রথমে জোড়া হয়ে সত্ত্ববর্ণ-বাহুদেব বা কৃষ্ণ-বলরাম রূপে, এবং অগ্নিকাল পরে বা সমসময়ে—ভিন্ন জনগোষ্ঠীতে—এক হয়ে কৃষ্ণ-বিকু রূপে।

এখন দেখা যাক কিতাবে জোট পাকিয়ে এই নতুন জোড় গড়ে উঠেছিল।

ঋগ্বেদে ইন্দ্রের সহকারী বিষ্ণু, ব্রাহ্মণগ্রন্থে ইন্দ্র দেবতাদের বলিষ্ঠ স্তব্ধ এবং বিষ্ণু কনিষ্ঠ। বিষ্ণু ঋগ্বেদে নবযুবা, ব্রাহ্মণে শিশু। পুরাণে বিষ্ণুর এক নাম 'উপেন্দ্র', এর দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে যে তিনি ইন্দ্রের ছোট ভাই। ব্রজলীলার কৃষ্ণ প্রথমে শিশু পরে কিশোর। তারপরে তিনি নবযুবা। ইন্দ্রের সঙ্গে বিষ্ণুর ক্রীড়াযুদ্ধের যে উল্লেখ ঋগ্বেদে পেরেছি তার দুরকম ছবি উঠেছে পুরাণে। এক বালকক্রীড়ার বিরোধ, তার উল্লেখ আছে পুরাণ-কাহিনীতে। দুই সত্য সত্য বিরোধ, যার কোন প্রত্যক্ষ উল্লেখ নেই ঋগ্বেদে তবে অবাস্তবভাবে থাকতে পারে। বৃজ-ইন্দ্রের বিরোধ পুরাণ কাহিনীতে ইন্দ্র-কৃষ্ণের বিরোধ বলে—ব্রজার শিশুবৎস হরণ ও গোবর্ধন ধারণ ঘটনা—ধরে নিলে একরকম সমাধান হয়। এর সঙ্গে অথবা এ ছাড়া আর একটি ঋগ্বেদের গল্পের কিছু যোগাযোগ থাকতে পারে। একটি স্মৃতির তিনটি ঋকে অর্থাৎ শ্লোকে (৮.২৬.১৩-১৫) ইন্দ্রের বিরুদ্ধে এককৃষ্ণ (অহর ? দাস ?) দশ হাজার সৈন্য নিয়ে অভিযান করে অংগুমতী (যমুনা ?) নদীর তীরে এসে পতাকা গেড়েছিলেন। ইন্দ্র-শত্রু (১) এই শ্রাক্ ঐতিহাসিক (?) কৃষ্ণের সম্বন্ধে শ্লোক তিনটি এখানে অন্তবাদসহ উদ্ধৃত করছি। এখানেও যুদ্ধ যেন ক্রীড়াযুদ্ধ, বাজি রেখে যুদ্ধ।

অব ত্রপ্সো অংগুমতীম্ অস্তিষ্ঠ

ঈয়ানং কৃষ্ণো দশভিঃ সহস্রৈঃ।

আবং তম্ ইন্দ্রঃ শচ্যা ধমন্তম্

অপ স্নেহিতীর্ নৃমণা অধন্ত ॥

‘অংগুমতীর ভাটিতে পতাকা গাড়া (হ’ল)। দশ হাজার (সেনা) নিয়ে এসে কৃষ্ণ রইলেন (সেখানে)। আমাদের দুজনের সাহায্য পেয়ে মাহুযের প্রতি দয়ালু ইন্দ্র (যুদ্ধের শাণ) বাজিয়ে তার উপর ধারা বর্ষণ করলেন।’

ত্রপ্সম্ অপশ্রং বিষুণে চরন্তম্

উপহরয়ে নন্তো অংগুমত্যাঃ।

নন্তো ন কৃষ্ণম্ অপতস্থিবাংসম্

ইব্যামি বো বৃষণে যুধ্যাতাজো ॥

‘অংগুমতী নদীর বিজন ভূমিতে একদিকে পতাকা নড়তে দেখেছি। কালো মেঘের মতো দূরে রয়েছে যে কৃষ্ণ তার সঙ্গে তোমরা দুজন বীর বাজি রেখে যুদ্ধ করো, চাই (আমি)।’

অথ ব্রহ্মসো অংগত্যা উপবে

অবারহং তবং তিচ্ছিবাণঃ ।

বিশো অসেবীর্ অভ্যা চরতীর্

বৃহস্পতিনা বৃজেদ্রঃ সগাহে ।

‘এখন অংগত্যা একান্তে পতাকা নিত্যের রূপের উদ্ভলতা বিকীর্ণ করতে করতে স্থির হয়েছে সখা বৃহস্পতির সহযোগে সম্মুখীন হয়ে ইন্দ্র দেবতাদের বিরোধী দলকে পরাস্ত করলেন।’

( ইন্দ্র ও কৃষ্ণের প্রত্যেক বিরোধের একটি কাহিনী আছে পুরাণে— পারিজাত-হরণ। ভার্য্য সত্যতাকে খুলি করবার জন্তে কৃষ্ণ বর্ণের উদ্ভান থেকে পারিজাত কেড়ে নিয়ে এসেছিলেন—এই গল্প। )

বেদে এক বাহুব-কৃষ্ণেরও সন্ধান পাই। তিনি ছিলেন অজিতস-গোত্রীয়, অশ্বিনের উপাসক কবি। ঋগ্বেদে সংকলিত তাঁর একটি স্তোত্রে অর্থাৎ কবিতার তাঁর ভূমিতা আছে (৮.৮৫)। সে ভূমিতা-শ্লোক দুটি এই—

অয়ং বাঃ কৃষ্ণো অশ্বিন।

হবতে বাজিনীবহু

মধ্বঃ সোমস্ত পীতরে ॥ ৩ ॥

‘হে অশ্বিনঃ, তোমাদের ক্ষমতার অন্ত নেই। এই (বাক্তি) কৃষ্ণ তোমারে আহ্বান করছে যধু আর সোম কিছু পান করতে।’

শুশুভং অয়িতুর্ হবং

কৃষ্ণস্তত্ত্বতো নরা।

মধ্বঃ সোমস্ত পীতরে ॥ ৪ ॥

‘হে বীরবর, কান দাও শুভকারী কৃষ্ণের আহ্বানে - যধু আর সোম কিছু পান করতে।’

ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ অধ্যাত্মজ্ঞানী গুরুবংশতালিকার অজিতস-গোত্রীয় ষোড়শের শিষ্য যে কৃষ্ণ দেবকীপুত্রের উল্লেখ আছে তিনি এই বৈদিক কবি হওয়াই সম্ভব। বৌদ্ধ ঘটজাতক কাহিনীতে যে বাহুবদেবের গল্প আছে তা এই বৈদিক কবি অজিতস-শিষ্য কৃষ্ণ দেবকীপুত্রের সম্পর্কিত বলে বোধ হয়।

ইন্দ্রসখা, ইন্দ্রশত্রু ও কবি কবি-পণ্ডিত এই ত্রিবিধ কৃষ্ণের ইঙ্গিত ছাড়া আরও এক কৃষ্ণের ইঙ্গিত পাই বৈদিক সাহিত্যে। তিনি ছিলেন এক

অগ্নিদেবতা, গন্ধর্ব, বাঁর বোঁক ছিল জীলোকের উপর, বিশেষ করে সম্বর্ষ জীলোকের উপর। গন্ধর্বগৃহীত নারীর উল্লেখ বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে। এই গন্ধর্ব কালো এবং “গন্ধর্বকেশবঃ” অর্থাৎ তাঁর সর্বাঙ্গে কেশ। অনেক পদবর্তী কালের লৌকিক কুক-কথা থেকে এই গন্ধর্বকুক বা কেশব-ভূতের সূত্র আবিষ্কার করা খুব দুর্লভ নয়। কৃষ্ণের তমল বৃক্ষে অধিষ্ঠান এবং তাঁর নারীলোভ্য এই সূত্রেই হৃদয় দেয়। একদা যে ভূত-কৃষ্ণের কাহিনী অজ্ঞাত ছিল না তার প্রমাণ পাই বিহারের কোন কোন লোক-কথার যেখানে বৃন্দাবনে ঈশ্বর-কৃষ্ণের নয় ভূত-কৃষ্ণের গতিবিধি ছিল (রাঃচৌধুরী লিখিত, সাহিত্য অকাদেমী প্রকাশিত ‘কোকিলের অব-বিহার’ হটব্য)।

বৈদিক সাহিত্যের পর—অর্থাৎ বাইরে—আর পৌরাণিক সাহিত্যের আগে—তখন পৌরাণিক সাহিত্য বলতে যা ছিল তা অস্ফুট ও অগ্নিগত অর্থাৎ যোচামুটি বলতে পরি খ্রীষ্টপূর্ব সহস্রাব্দীর শেষ চার শতকে এবং তারপরে দু’তিন শতাব্দীতে—দুটি দেবতার সাক্ষাৎ পাচ্ছি যাঁরা পৌরাণিক বলরাম ও কৃষ্ণের প্রাচীনতর রূপ। এঁরা হলেন সঙ্ঘর্ষণ ও বাহুদেব। সঙ্ঘর্ষণের নামান্তর ছিল ‘অজুর্ন’ (বলদেব অর্থাৎ শুভ্রকান্তি দেবতা)। এই নামেই তিনি পাণিনির সূত্রে (৪.৩.২৫) উল্লিখিত হয়েছেন বলে মনে করি। মহাত্মারতের অন্ততম নায়ক অজুর্ন বেশি খ্যাত হয়ে পড়ার বোধ করি অজুর্ন নামটি পরিত্যক্ত হয়েছিল। ‘সঙ্ঘর্ষণ’ মানে যিনি টেনে আনতে পারেন। বলদেবের বিশিষ্ট অস্ত্র তাই লাঙল যা ভূমিকর্ষণ করে। বলরামের একটি বিশিষ্ট কর্ম তাই বমুনা নদীকে টেনে নিয়ে যাওয়া। তাঁর জন্মকাহিনীতেও তাই বলা হয়েছে যে তিনি প্রথমে দেবকীর উদরে জন্ম নিয়েছিলেন তারপর সেই গর্ভ টেনে নিয়ে এসে রোহিণীর উদরে স্থাপিত করা হয়। এই গল্প দুটি, বিশেষ করে শেষেরটি, সঙ্ঘর্ষণ নামটিকে যথার্থ প্রতিপন্ন করবার ভ্রান্তে বিরচিত বলে মনে হয়। আর কোন বীরবোদ্ধার লাঙল অস্ত্র সাধারণ বৃত্তিতে উপহাস্য মনে হয়। বলরাম কৃষ্ণের দেবতানন, তাহলে লাঙল অস্ত্র চলত। তবে ‘লাঙল’ শব্দের একটা অর্থ ছিল আঁকশি (অজুশ) : সঙ্ঘর্ষণের অস্ত্র অজুশ হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

বাহুদেব মানে বললম্বর দেবতা। নামটির আসল মানে বহুদেবের পুত্র নয়। বরং পিতা বহুদেবের করুণা বাহুদেব নাম থেকেই গঠিত হয়েছে। ‘বাহু’ ও ‘বহু’ একই শব্দ। যেমূল ভাষা থেকে সংস্কৃত ভাষা উদ্ভূত সেই ভাষার শব্দ দুটির রূপ ছিল যথাক্রমে \*Sweah ও \*Swēah; প্রথম শব্দটি

আইরিশ ভাষায় চলে এসেছে, আর সংস্কৃত ভাষায় এসেছে 'বাহুদেব' এই নামে এবং 'বাহু' (অর্থ জ্বলন্ত নারী) ও 'বাহুয়া' (অর্থ দ্ব্যস্তি) নামে। সত্বৰ্ণ ও বাহুদেব সঙ্গসংগি এসেছিলেন তাঁদের ভগিনী ও প্রিয়। একানংসা হুভত্রাকে নিয়ে ঋগ্‌বৈদিক অবিষয় ও উগা থেকে। তাঁরা ছিলেন বিশেষ এক যৌথবংশের - নাম সাব্বত (বা বৃক্ষি)—বিশিষ্ট উপাস্য দেবতারূপে। এই উপকথার ঐতিহাসিক প্রমাণ মিলেছে অন্তত খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে। বাড়বারে যোহুতী গ্রামে প্রাপ্ত শিলালেখে ভগবান্ সত্বৰ্ণ ও বাহুদেবের উল্লেখ আছে, সেই সঙ্গে আছে 'অনিহিতা'র উল্লেখ। এটি একানংসা-হুভত্রার প্রাচীন নামান্তর বলেই জাহায্য। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে নানাখাটু গুহালিপিতে বন্দনা অংশে ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ, ধর্ম এই বৈদিক ও লৌকিক দেবতাদের সঙ্গে সত্বৰ্ণ ও বাহুদেবও আছেন। এই সত্বৰ্ণ বাহুদেবের সঙ্গে পরে আরও দু'তিন জন বৃক্ষিবংশ বীরের উল্লেখ (এবং পূজা) দেখা যায়। পৌরাণিক কাহিনীতে এঁরা বাহুদেবের পুত্র-পৌত্র—প্রহ্লাদ, অনিহিত, শাষ। এই সাব্বত-বৃক্ষি বীরেশ্বরদের কাহিনী হরিবংশে বিস্তৃতভাবে আছে। এই ঐতিহ্য খানিকটা আনাড়োয়ালিয়া (ফ্রিজিয়া) থেকে আগত হতে পারে।

সত্বৰ্ণ-বাহুদেবের গল্পকথা পৌরাণিক বলদেব-কৃষ্ণের কথার সঙ্গে মিশে গেছে। অনাহিতা একানংসা-হুভত্রার কাহিনী তেমন মিলে যেতে পারে নি। গোড়ার দিকে যশোদানন্দিনী একানংসা চিল হয়ে উড়ে গিয়েছিলেন এবং স্বর্গে ইন্দের পূজা পেয়েছিলেন। আর শেষের দিকে তিনি বলরাম-কৃষ্ণের ভগিনী হুভত্রারূপে অভূতপত্নী হয়েছিলেন।

কিন্তু গল্পে বাই চোক না কেন, জনসমাজে ভাইবোন তিনজনের পূজা চলে এসেছে আজ পর্যন্ত—উড়িয়ার নীলাচলে ত্রীক্ষেত্রে। উড়িয়ার বাইরেও যে এ ত্রয়ী দেবতার পূজার প্রচলন ছিল তার প্রতিমা ও শিলালেখের সাক্ষ্য মিলেছে।

অবিষয় ও বিষ্ণু-কৃষ্ণের একটি প্রধান যোগসূত্র হল 'মাধব' নামে। আগেই বলেছি বিষ্ণু বিশ্বের মধুর ভাণ্ডারী আর অবিষয়ই ছিলেন মধুর বিতরণকারী। হুভত্রাঃ মাধব নামটি হু'ভত্রকেই সমান প্রযোজ্য। পৌরাণিক আমল থেকে আজ পর্যন্ত বজ্রাদি পূজার কাজে বিনি সর্বাধিনায়ক দেবতা তাঁর মাধব নামটিই যেন বিশিষ্টতম। তুলনা করুন এই মন্ত্র

মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি।

স্বরস্তি মাধবঃ সর্বে সর্বকাৰ্থেষু মাধবঃ।

বিকৃষ্টদেবতার আরাধনায় গোড়ার কথাটি আশ্রয় করে আছে ভক্ত, ভক্তি ও ভগবান—এই তিনটি শব্দকে। তিনটি শব্দ সবধাতুজ, ভক্ত ধাতু থেকে উৎপন্ন, যথাক্রমে ধাতুতে - 'ভ' ("ক্ত") ও-'তি' ("ক্তি") ও প্রত্যয় দিয়ে এবং ক্ত ধাতুজ ভগ শব্দে-'বন্ত্' ("মতুপ্") প্রত্যয় দিয়ে গড়া। 'ভক্ত' ধাতুয় মানে বেঁটে দেওয়া, অংশ পাওয়া, দায়াদ হওয়া। 'ভক্তি' মানে যিনি অংশভাক, দায়াদ ইংরেজীতে sharer, share-holder। 'ভক্তি' মানে বাটোয়ারা, ভাগ করে দেওয়া, ইংরেজীতে to apportion, distribute, অথবা দলভুক্তির চিহ্ন, ইংরেজী করে বললে share certificate বা share mark। 'ভগবান্' মানে ভাগ বাটোয়ারার মালিক, ইংরেজী করে বললে stockist, যথার্থ প্রতিশব্দ হল lord ("রুটির মালিক")। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে শব্দগুলির মূলে ব্যবহার হয়েছিল সামন্ততান্ত্রিক (feudal) সমাজভাবনার আওতায়।

ভক্ত-ভক্তি-ভগবান্ এই ত্রিমূল আশ্রয় করে উৎপন্ন ও বিকশিত বৈষ্ণব-ধর্মের ইতিহাস নির্ভর করেছে প্রাচীনতর 'ভগ' শব্দটির উপর। এ শব্দ 'ভগবন্ত্' (ভগবান্) শব্দের মূল এবং এ শব্দ এসেছে ভক্ত, ধাতুতে -'অ' ("অচ্") প্রত্যয় যোগ করে। শব্দটির মূলে মানে ছিল "ভাগবোগ্য (দাতব্য) দ্রব্য (বাণ্য) ভাগ্য"। আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছরেরও আগে সংস্কৃত-গ্রীক-লাতিন প্রভৃতি ভাষা যাদের মাতৃভাষা ছিল তাঁদের বহু পূর্বপুরুষ যে ভাষাটি বলতেন সেই অসুমানলব্ধ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার শব্দটি প্রচলিত ছিল এখনকার দিনের ভগবান্, বিশেষ করে 'দাতা ভগবান্' অর্থে। এইখানে তখন যে দেবভাষনা ছিল তা খানিকটা সঙ্কুচিত হলেও ঋগ্বেদেও পৌছেছিল। ঋগ্বেদে "ভগ" দেবতা আছেন, তিনি একজন "আদিত্য" অর্থাৎ সূর্যবর্গের দেবতা। তাঁর সম্বন্ধে ঋগ্বেদের এই শ্লোকটি (৭.৯.৪,৫) অসুধাবনীয় :

ভগ এব ভগবী অস্ত দেবাস্

তেন বয়ং ভগবন্তঃ স্যাম।

'হে দেবগণ, ভগ যেন দানশীল হন। তাহলে আমরা ভগবান্ (অর্থাৎ ধনী) হব।'

লক্ষ্য করতে হবে যে, তখন ভগবন্ত শব্দটির আধুনিক অর্থ এসে যায়নি। বৈদিক ভগ দেবতার অন্তর্ধানের পরে তবে ভগবন্ত শব্দ ইন্দো-ইউরোপীয়

‘তগ’ দেবতার প্রতিশব্দ হয়েছে। ‘তগ’ শব্দটি রয়ে গেছে ‘ভগবন্ত’ শব্দের প্রকৃতির অর্থে ( অর্থাৎ বন, ঐশ্বর্য )। ‘তগ’ যে একটা ফিউড্যাল-ভাবনার ঈশ্বর ( God ) ছিলেন তার স্পষ্ট উল্লেখ আছে ঋগ্বেদে (৫.৭৬.২) : “ভগো বিভক্তা”।

পরবর্তীকালে ধর্মবিবর্তনে ‘ভক্তি’ শব্দটির অর্থে পরিবর্তন ঘটেছে, ‘ভক্ত’ শব্দের অর্থেও অল্পরূপ পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু ‘ভগবন্ত’ শব্দে বিশেষ কিছু পরিবর্তন ঘটেনি। যে কালে বিষ্ণু-উপাসনার উপর বাহুদেব উপাসনার গভীর ছাপ পড়ল সেই কালে ‘ভগবন্ত’ শব্দটি সর্বোত্তমের প্রধান অভিধারকপে চলে গেল। বিষ্ণু-উপাসনা বা আরও বেশ কিছুকাল পরে ‘বৈকব’বর্ম নাম পেয়েছিল তা এখন ‘ভাগবত’ মত বলে প্রতিষ্ঠিত হল। এর সাক্ষী মিলবে প্রচুর প্রাচীন প্রত্নলেখে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে (হেলিওদোরের স্তম্ভলেখ প্রভৃতি)।

আনুমানিক ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে বিষ্ণু-উপাসনা আমাদের দেশে চলে এসেছে আজ পর্যন্ত। এই সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস পরীক্ষা করলে আমরা বুঝতে পারি যে, এই উপাসনার ( বা ‘ধর্মে’ ) ধীরে ধীরে সিংহাসন থেকে বিষ্ণুর মূর্তি মুছে এসেছে। তার স্থানে সূটে উঠেছে বাহুদেব ও কৃষ্ণ (অথবা বাহুদেব-কৃষ্ণ)। তাবের দিক দিয়ে বিষ্ণুর উপর বাহুদেবের ছাপ পড়ল অশ্বিনয়ের। দুটি দেবতাবনা সহজে বাঁধা পড়ে গেল ‘মাদব’ (=মধুভাগারী ও মধুদাতা) অভিধার শিকলে। অশ্বি দুজনের মধ্যে একজন ছিলেন, যাক্ষের নিকট অজ্ঞসারে রাজির পুত্র (=কৃষ্ণ বাহুদেব), আর একজন উবার পুত্র (=অজুন, বলদেব সর্বার্পণ)।

‘বিষ্ণু’ নামটির অর্থ বখন কোন পণ্ডিত অজ্ঞমান করেন ‘কর্মশীল’, তাঁদের মতে শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে ‘বিব্’-ধাতু থেকে। এ ধাতুর আর একটি অর্থ হল ‘পরিবেষণ করা’। ঋগ্বেদে আছে, বিষ্ণু ইন্ড্রের জন্তে প্রচুর ভোজ্য পাক করেছিলেন। পৌরাণিক ‘মধুসূদন’ নামেও তার ইঙ্গিত রয়েছে। (‘মধুসূদন’ নামটির আসল তাৎপৰ্য তুলে গিয়ে এবং হনন করা অর্থে এক ‘সূদ’-ধাতু করন। করে পৌরাণিকেরা এক ‘মধু’ দৈত্যের নাম করেছেন।) মনে হয় ‘বিষ্ণু’ নামটি আসলে ইন্দো-ইউরোপীয় ‘বেইস্-(weis-)’ ধাতু থেকে উৎপন্ন। এ ধাতুটি সংস্কৃতে বিলুপ্ত, এর অর্থ ছিল ‘বেড়ে ওঠা, বিস্তারিত হওয়া’। এই ব্যুৎপত্তি যে বিষ্ণুর সম্বন্ধে সব দিকেই খাটে তার প্রমাণ রয়েছে।

আগেই বলেছি যে, ঋগ্বেদে বিষ্ণু শিত নন, কিনোর বুঝ। তিনি “বুঝ-  
কুমারঃ”—‘বুঝ, বালক নন’, তিনি “বৃহচ্ছরীরঃ”—‘প্রকাণ্ডকার’ (১.১৫৫.৬)।  
তিনি লম্বা লম্বা পদক্ষেপ করেন (“উরুক্রমঃ”), তিনি দৃগমায়ী (“উরুগায়ঃ”)। বিষ্ণু  
তিন পদক্ষেপ করে বিশ্বভুবনকে ঘেঁষে কেলেন এবং তাঁর তিন পদক্ষেপে বাস  
করে মায় দেবতার সন্মত সবাই। বাহ্যিক অর্থেও বিষ্ণু ঋগ্বেদীয় দেবতাদের  
মধ্যে উচ্চতম স্থানারূঢ়। তাঁর চরমধাম ত্রালোকের উর্ধ্বতম স্থানে। সে স্থান  
বিষ্ণু উপাসকদের কাছে প্রতিষ্ঠিত হয় যেন আকাশে বিস্তীর্ণ একটি চোপ জলজল  
করতে।

তদ বিষ্ণোঃ পরমং পদং

সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ।

দিবীব চক্ষুর আততম্ ॥ ১.২২.১০ ॥

(এই ধাম প্রাচীন পৌরাণিক কল্পনার ‘বৈকুণ্ঠ’, নবীন পৌরাণিক কল্পনার  
‘গোলোক’।) বিষ্ণু (ও ইন্দ্রের) সেই ধামে (বা আশ্রমে ‘বাস্তুনি’) উপাসকেরা  
গমন করতে চান (“উশ্বসি গমধো”)। যেখানে আছে “ভূরিশূজ” ক্ষিপ্ৰগামী\*  
গোক, যেখানে মধুর পরম উৎস (১.১৫৬.৬)। শুধু সেখানে কেন বিষ্ণুর আর  
দুটি পদাশ্রমেও অকস্ম মধুর পরিপূর্ণ আনন্দ উৎসার (১.১৫৬.৭)।

বিষ্ণু ঠিক সূর্যদেবতা নন। সূর্য সবিভা বা পৃথার সঙ্গে তাঁর মিল থাকলেও  
তাঁকে ঊর্দ্বের কারো সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া যায় না। বিষ্ণুকে বলা যায় সৌর-  
মণ্ডলের বা কালচক্রের দেবতা। তিনিই সূর্যকে চক্রভ্রমণারূঢ় করেছেন,  
তিনিই দিবারাত্রি চতুঃসংবৎসর বিভাগ ব্যবস্থা করেছেন (১.১৫৬.৬ কথ ;  
১.১৬৭.৮)। পৌরাণিক ঐতিহ্যে বিষ্ণু হলেন “সবিত্তমণ্ডলবর্তী নারায়ণ”  
সম্ভবত এ কল্পনা এসেছে “দিবীব চক্ষুর আততম্” ভাবনা থেকে। পৌরাণিক  
বিষ্ণুর প্রধান অস্ত্র, এমন কি তাঁর সিংহল, হল চক্র অর্থাৎ সূর্য।

বিষ্ণুর অস্ত্র চক্র তাঁর সিংহল হবার আগে সিংহল হয়েছিল গরুড় (পক্ষী)।  
ভগবান্ বাহুদেবের গরুড়ধ্বজ প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে পুরানো নথির পাচ্ছি খ্রীষ্টপূর্ব  
দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে (বেলনগরে হেলিওডোরের স্তম্ভ)। বিষ্ণুর গরুড়  
সিংহলের সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছা হয় আবেস্তার আহরমজ দ্বার সিংহল পাখী  
ছড়ানো পাখির সঙ্গে। এখানে মনে রাখতে হবে, আবেস্তার যেমন আহর-  
মজ দ্বার কোন মূর্তি নেই বেলনগরে স্তম্ভের অথবা ওবিসম খ্রীষ্টপূর্ব প্রাচীন  
প্রত্নসামগ্রীতে বিষ্ণু-বাহুদেব-চক্রের কোনও মূর্তি পাওয়া যায় না।



বাহুদেব (কৃষ্ণ) ও সত্বর্ষণ (বলদেব) বৈদিক ঐতিহ্যের দেবাত্মক (পরবর্তীকালে দেবদানব) মিলে যেভাবে উদ্ভূত হয়েছিলেন তা নকশা কেটে দেখালে স্পষ্ট হবে।

দেব	অসুর-দানব
বিষ্ণু অশ্বী (কৃষ্ণ) অশ্বী (ভক্ত)	কৃষ্ণ বল রৌহিণী*
বাহুদেব (কৃষ্ণ)	সত্বর্ষণ (বলদেব)

বাহুদেব ও সত্বর্ষণের উপাসনা নিয়েই ‘ভাগবত’ ধর্মের শুরু। এইটাই বৈষ্ণব-ধর্মের প্রথম নাম। খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীগুলিতে এবং খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত এই নামই চলিত ছিল। বৈষ্ণব অর্থে ‘ভাগবত’ শব্দটির প্রথম প্রয়োগ যা আমরা জানি না—পাই খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর একটি প্রত্নলেখ (মধ্যভারত বেগনগরে প্রাপ্ত হেলিওদোরের গুরুভক্ত লিপিতে) ভাগবতধর্মের—শুধু ভাগবতধর্মের কেন ভারতীয় ধর্মচিন্তার—বোধ করি মহত্তম বাণী রয়েছে এই লেখে উৎকীর্ণ।

॥জিনি অমৃতপদানি [ইতঃ] [হু-] অজ্ঞাতিতানি নেঅস্তি [বগঃ] দমচাগ অপ্রমাদ॥

‘তিনিই অক্ষয় সোপান হু-অজ্ঞাতিত হলে স্বর্গে নিয়ে যায়—প্রবৃত্তিসংযম, ভোগসংযম ও সজাগ সতর্কতা।’

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল থেকে শিব-উপাসনায়—বা প্রথমে “যোগী”—ধর্মের আওতায় ছিল তা স্বতন্ত্র হয়ে ভক্তি-সাধনার রঙ গ্রহণ করেছিল। কালক্রমে “ভাগবত” অভিধাটি এঁদের সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হতে থাকে, বিশেষ করে নিবের ভার্য্য ‘ভগবতী’ নাম পাওয়া যায়। তার ফলে নৃপতিত্বের শাসনে পরমভাগবতের স্থানে “পরম বৈষ্ণব” দেখা দেয়। ‘বৈষ্ণব’ শব্দটি এখানে বাহুদেব’ শব্দের বৈপরীত্যেই প্রযুক্ত হতে থাকে।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মাঝামাঝি ভাগবত-বৈষ্ণব ধর্মে লোকভাবনায় ও লোকসাহিত্যে শিশু-কৃষ্ণের সমাদর জাগ্রত হয়েছিল। ঋগ্বেদে বিষ্ণু শিশু নন, বালকও নন, তিনি প্রৌঢ়কিশোর বা যুব! কিন্তু তাঁর যে অগ্নিধরূপ গৃহস্থের ঘরে ঘরে গৃহদেবতার মতো প্রত্যহ পূজিত হত সেই গার্হপত্য অগ্নিকে বৈদিক কবি ঘরের ছেলের মতো দেখতেন। তাই গার্হপত্য অগ্নিকে ঋগ্বেদের কবি বলেছেন “শিশু হন” অর্থাৎ ঘরের শিশু, ঘরের কর্তা-গিন্নির (“পত্নী হন”) বৈপরীত্যে ‘ব্রাহ্মণ’ নামক বৈদিক সাহিত্যের গুরুগ্রন্থগুলিতে বিষ্ণু বজ্রীয় অগ্নি ও বজ্রের সঙ্গে মিলে যায় এবং তাঁর শিশুরূপ অবলম্বন করে গল্প গড়ে ওঠে। এই গল্পে পাই যে দেব-অসুর ছিলেন বৈদ্য জাতিগোষ্ঠী।

অহরেরা ছিলেন কর্মিষ্ঠ, দেবতার ছিলেন অলস। এই সূত্রে অহরদের মধ্যে জ্ঞাতিবিশোধের ভাব আগে! তাঁরা দেবতারের না জানিয়ে পৃথিবীর সব স্থান নিজেদের খাপ করে নিলেন। তখন দেবতার খুব কাপরে পড়েন। তাঁদের অন্তত সামান্য একটুও নিজস্ব স্থান চাই নইলে যজ্ঞ করবেন কি করে। তাঁরা শিশু-বিষ্ণুকে সঙ্গে করে অহরদের কাছে সামান্য একটু স্থান—বিষ্ণু শুলে যতটুকু হয় ততটুকু—যজ্ঞ করার জন্তে চাইলেন। অহরেরা তা দিলেন। বিষ্ণু মাটিতে গুরে চারিদিকে হু হু করে বাড়তে লাগলেন। তার ফলে অহরেরা পৃথিবী (অর্থাৎ ভারতবর্ষ?) থেকে বহিষ্কৃত হয়ে গেলেন।

এই ব্রাহ্মণের গল্পটি ঋগ্বেদের উরুক্রম বিষ্ণুর মিথের সঙ্গে মিলে গিয়ে পৌরাণিক গ্রন্থে বলি-বামন উপাখ্যানের সৃষ্টি হয়েছে।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে শিশু-কৃষ্ণের লীলাকাহিনী যে সাধারণ জনসমাজে বিশেষ করে নারীসমাজে গানে-গাথায় ও গল্পে সমাদৃত ছিল তার অনেক প্রমাণ আছে। কিন্তু এই লোকভাবনার প্রত্যক্ষ ফলরূপে যে শিশু-কৃষ্ণের পূজা চলিত হয়েছিল তা বলা যায় না। এখানে ইতিহাসের অহরোধে খ্রীষ্টীয় ধর্মের কিছু প্রভাব মানতে হয়। শিশু-কৃষ্ণের বা বাল-গোপালের পূজা খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রাব্দী শেষ হবার আগেই দেখা দিয়েছিল। যতদূর অহমান করা যায় তাতে মনে হয় এ পূজারীতি দক্ষিণ ভারত থেকে উত্তর ভারতে এসেছিল। দক্ষিণ ভারতে কেবলে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে সিরীয় খ্রীষ্টানের হৃদয় ঘাঁটি স্থাপিত হয়। সেই আদি আগত সিরীয় খ্রীষ্টানদের ধর্ম-আচরণ সম্বন্ধে আমার কিছু জানা নেই। তবে একথা ঠিক যে তাঁরা মেবী মাতা ও তাঁর শিশু পুত্রকে পূজা করতেন। সেই সূত্রে আমাদেরও শিশু-কৃষ্ণের ভাবনার দেবভাবনার ও বিষ্ণু ভক্তির সঞ্চার হয়েছিল।

গোপাল কৃষ্ণের উপাসনা আমাদের বাংলাদেশে যে অষ্টম শতাব্দীর আগেই এসেছিল তার একটি অবাস্তব প্রমাণ হল পালরাজা ধর্মপালের পিতার নাম, ‘গোপাল’। দেবতার নামে নাম রাখা আমাদের দেশের খুব প্রাচীন রীতি। যেমন, ইন্দ্রদ্রাঘ, দেবদত্ত, অগ্নিমিত্র, রুদ্রদাম, বিষ্ণুরাত ইত্যাদি। (ধর্মপালেরা যে বৈষ্ণব উপাসক বংশ ছিলেন তা আরও বোঝা যায় তাঁর প্রপিতামহের নাম ‘দয়িতবিষ্ণু’ থেকে। ধর্মপালের পিতামহের নাম ‘বশাট’—ডাক নাম, মানে, ‘বেরায়া’।)

বালগোপালের উপাসনা বৈষ্ণবধর্মকে সর্বাঙ্গিক ভক্তিমর্মে পরিণত করলে।

এর মধ্যে খানিকটা বৌদ্ধ মহাবান হতেও প্রভাব আছে। মহাবানীধের উপাস্ত ককশাঘন অবলোকিতেশ্বর বিষ্ণুরই যে পরিণত রূপ। চৈতন্তের ধর্ম, যা বৈষ্ণবধর্মকে তার চরম পরিণতি দিয়েছে, তাতে অবলোকিতেশ্বরের ককশাঘন যোগান অনেকটাই আছে “জীবে দয়া”—এ মন্ত্র সেই সূত্রেই এসেছে।

এ প্রবন্ধ আর বাড়ার না। বাড়ালে শেষ হবে না। শুধু একটি কথা বলবার আছে। চৈতন্ত বৈষ্ণবধর্মকে চরম রূপ দিয়ে গেছেন। সে রূপের তিনটি স্বরূপ—(১) জীবে দয়া, (২) নায়ে কচি, (৩) ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক।

দ্বিতীয় স্বরূপটি চৈতন্তের ধর্মকে ইউনিভার্সাল ধর্মে উন্নীত করেছে। চৈতন্ত মূর্তিপূজা করতে বলেননি, ঈশ্বরের নাম নিতে বলেছেন এবং আরও বলেছেন ঈশ্বরের অসংখ্য নাম, তার থেকে যে কোনটি নিলেই হবে। এইখানে চৈতন্ত হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মধ্যে মিলনের সেতু বেঁধে দিয়েছিলেন।

### পাদটীকা

১। সম্ভবত ‘অনাহিতা’ টিক পাঠ হবে। শব্দটির অর্থ একানংসার তুলা। ‘অনাহিতা’ মানে অবিবাহিতা বা নিঃসঙ্গা, ‘একানংসা’ ম’নে এক (=অবিবাহিতা) ও অম্পুষ্টা। দেবী অনাহিতা’র উল্লেখ আবেদ্যার ও প্রাচীন পারসীক শিলালেখ আছে।

২। উবার পুত্র হিসাবে ‘সম্বর্ধন’ নামটির সার্থকতা আছে। উগা ভেগে উঠে তার ব্রজের দ্বার খুলে দেন, গোকুল বেরিয়ে আসে। তাদের ডেকে নিয়ে জড় করে যিনি চরাতে নিয়ে যান তিনিই ‘সম্বর্ধন’। গোপবালক হিসাবে এইখানে সার্থকতা।

৩। হরিণের মতো শাখাময় শিঙবৃক্ষ গোকুল মূর্তি মহেশ্চন্দ্রোড়-হরমায় মিলেছে।

৪। ‘নারায়ণ’ শব্দটির আসল মানে হল “বীরকীর্তি”। এই অভিধাটি বিষ্ণু-কৃষ্ণ-হাইকে’র মতো কীর্ণমূর্তি দেবভাবনার পটভূমি অস্তিত্বভাবনার সেতু মতো।

৫। ইন্দ্রশক্তি রৌহিণের উল্লেখ আছে কঙ্গবেদে (২.১২.১২)।

## আদিতে বাক্য ছিলেন

ছেলেবেলায় একদা পড়েছিলুম বোহন লিখিত স্থলমাচারের প্রথমেই

আদিতে বাক্য ছিলেন

বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন

বাক্যই ঈশ্বর ছিলেন ।

কেন জানি না হঠাৎ সেদিন মনের মধ্যে এই ভিনটি ছত্র গুঞ্জনিত হয়ে উঠল  
আমি সঙ্গে সঙ্গে বোম্ব হল যেন যেদেও কোথায় এমনি বাক-ব্রহ্মের ইঙ্গিত আছে ।  
আইডিয়াটা জুড়োতে না দিয়ে ঋগ্বেদ খুলে দশম মণ্ডলের ১২৭ নম্বর সূক্তটি  
দেখলুম । সূক্তটি বাক-সূক্ত নামে পরিচিত । প্রাচীন বেদবিশারদ পণ্ডিতেরা  
বলে গেছেন সূক্তটি অদ্ভুৎ ঋষির কল্পা বাকের উক্তি । ( অদ্ভুৎ নামে কোন  
ঋষির উল্লেখ কোথাও নেই, তবে এই নামে এক অসুর উল্লিখিত আছে  
ঋগ্বেদে । তবে কি অদ্ভুৎ ছিলেন অসুরদের ঋষি ? ) সূক্তটিতে কিছু  
বাকের নামগন্ধ নেই । অথচ কবিতাটি নারীর উক্তি এবং সে নারী মুখ্য মুখ্য  
দেবতার পরিচালিকা বলে দাবি করেছেন । পরবর্তী কালে শাস্ত্রকারেরা  
সূক্তটিকে এই কারণেই ঈশ্বরকে নারীরূপে ভাবনার উৎস বলে মেনে  
নিরেখেছিলেন । তাই কবিতাটি এখন “দেবীসূক্ত” নামে চলে ।

সূক্তটির যথাযথ অসুবাদ করে বন্ধনী মধ্যে টীকা দেওয়া গেল । তাতে  
আমার বক্তব্য অসুসরণ করা সহজ হবে । যৎকিঞ্চিৎ পাঠান্তর সমেত সূক্তটি  
অথর্ব-সংহিতায়ও আছে । তবে সেখানে ঋক্গুলির পৌর্বাগম্য ঋগ্বেদের  
তুলনায় বিপর্যস্ত । অথর্বসংহিতায় থাকার মানে হল সূক্তটি খুব প্রাচীন নয়  
( অথবা ঋগ্বেদের মূল ধারাবাহী নয় । ) এবং আথর্বগণ বক্তকাণ্ডে সূক্তটির  
ব্যবহার ছিল ।

১। আমি কল্পদের, বসুদের সঙ্গে চরে বেড়াই । আমি আদিত্যদের  
বিশ্বদেবদের সঙ্গেও ।

আমি মিত্র-বরুণ উভয়কেই পোষণ করি । আমি ইন্দ্র-অগ্নিকে, উভয়  
অধিনীকে ।

কল্পদের মানে কল্পপুত্র বরুণগণের । বরুণেরা গণদেবতা । বসুরা  
সংসদেবতা, পুণ্ড্রতার বরুণগণের উপরে । বরুণগণের কারো ব্যক্তি নাম নেই

বহুদের কারো কারো আছে। আদিত্যরা অমিত্তিপুত্র, এঁদের অনেকেই ব্যক্তি নামে সুপরিচিত। এঁরা প্রভুদেবতা। বহুরা ঋতুদেবতা, কজেরা বোজাদেবতা। বিশ্বদেব বলতে ঠিক সব দেবতার সমষ্টি বোঝায় না, যজ্ঞ-অহুতানে আহুত প্রধান প্রধান দেবতার নাম না করে একত্র উল্লেখ বোঝায়। মিত্র ও বরুণ “আদিত্য” হয়েও পৃথকভাবে উল্লিখিত হয়েছেন এই কারণে যে সূক্তটির রচনাকালে মিত্র ও বরুণ যুগ্মদেবতারূপে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন।

ঋকটির মর্মার্থ—আমি ছোট দেবসমাজের সংঘশক্তি, তাঁদের পালিকা। আমি বড় দেবতাদের পুষ্টিশক্তি, তাঁদের ধাত্রী।

২। আমি নিকলিত সোমকে পোষণ করি। আমি তুষ্টাকে পুষনকে আর ভগকে।

আমি ধন দিই হবিম্যান্ সূস্তোতা সোমবাজী যজমানকে।

(মর্মার্থ—যেসব দেবতার মাহাত্ম্য যজ্ঞকাণ্ডেই খ্যাপিত, তাঁদের মূলে আমিই।)

৩। আমি বহুদের পাচনবাড়ি জ্ঞানময়ী, যজ্ঞার্হাদের মধ্যে প্রথম।

সে আমাকে দেবতার বহু পায়ে স্তুত করেছে,—বহুস্থলবাসিনী,

বহুস্থানদায়িনী।

(প্রথম অর্ধে নতুন কথা নেই। দ্বিতীয় অর্ধের মর্মার্থ—আমি অংশকলারূপে সর্বভূতে ব্যাপ্ত হয়ে আছি।)

৪। আমার দ্বারা সে অন্ন খাচ্ছে যে দেখছে যে বেঁচে আছে যে কানে শুনেছে।

না জেনে তাঁরা আমাতেই রয়েছে। শোন শ্রোতা, শ্রদ্ধার কথা তোমাকে বলছি।

(মর্মার্থ—আমিই সর্বজীব পোষণ ও পালন করি।)

৫। আমি নিজে এ কথা বলছি—দেবতাদের ও যাতুদের ঋচিকর। যাকে চাই তাকে, তাকে আমি উদ্দীপ্ত করি, তাকে ব্রহ্মা, তাকে ঋষি, তাকে মেধাবী।

ব্রহ্মা মানে বেদজ্ঞ যাজক। ঋষি মানে বেদস্মৃতির প্রণেতা, সর্বমাত্র যৎপরনায় পুঙ্খ।

(মর্মার্থ—যাতুদের দেহমনের সব শক্তিই আমার থেকে।)

৬। আমি কতের হয়ে বহুকে টান দিই ব্রহ্মদেবী শক্তিকে সারতে।

আমি জনে জনে বিরোধ লাপাই। আমি ছালোকে-ভুলোকে প্রবিশি।

(প্রথম ছত্রের মর্মার্থ—ছুটে-সংহারে কতের শক্তি আমিই। দ্বিতীয় অর্থের মর্মার্থ—ছুটে-শক্তিও আমি। ত্রিত্ববন আমার শক্তিকেই।)

৭। আমি প্রসব করি পিতাকে এর মাথায়। আমার উৎপত্তি সলিলে সমুদ্র মধ্যে।

সেখান থেকে জুড়ে আছি বিশ্বভূবন। এবং এই ছালোক আমি প্রাণ্ডতায় ছুঁয়ে আছি।

(প্রথম অর্থের মর্মার্থ—আমার আদি ও অন্ত সীমা করা যায় না, কার্যকারণের বাইরে। দ্বিতীয় অর্থের মর্মার্থ—বিশ্বভূবন আমাতে ওতপ্রোত। অর্থাৎ উপনিষদের অধ্যাত্মচিন্তার সর্বং-খলু-ইদং বে ব্রহ্ম সে আমিই।)

৮। আমিই যেন হাওয়ার মতো বয়ে যাই বিশ্বভূবনকে কোলে নিয়ে।

ছালোকের বাইরে এই পৃথিবীর বাইরে—এমন মহিমায় আমি সমুদ্র।

(প্রথম অর্থের মর্মার্থ—সংসারচক্র আমারই আবর্তন। দ্বিতীয় অর্থের মর্মার্থ—ব্রহ্মাও আমার পরিসীমা নয়।)

হৃদয়টিকে নারী-ঈশ্বরের বাণী বলে ধরলে ব্যাখ্যা ও ভাবার্থ একটু ঘুরিয়ে নিতে হবে। প্রথম ঋকে বলা হয়েছে—ছোট দেবতা সব আমার পত্ত। বড় দেবতা সব আমার শিশু। কেউ কেউ বা কিঙ্কর। প্রথম ঋকের ভাবাত্মবৃত্তি করে দ্বিতীয় ঋকে বলা হয়েছে যজ্ঞের মূল দেবতা, অর্থাৎ যজ্ঞকল দাতা আমিই। তৃতীয় ঋকে বলা হয়েছে—আমি গিন্নী, আমিই কর্তা, বিশ্বব্রহ্মাও আমার ধরকন্না। সে ব্যবস্থা বন্দোবস্ত আমার পোষ্য দেবতারই করে দিয়েছে। চতুর্থ ঋকে ছান্দোগ্য উপনিষদে তৎ-স্বম্-অসিরই উল্লেখ। বাণী—সে সব আমিই। অর্থাৎ তত্-আহম্-অস্মি। আমিই জীবের জীবন, সর্বভূতাত্তরাত্মা। পঞ্চম ঋকের বক্তব্য—আমি সব করতে পারি, আমি পরম ঈশ্বর। পুরাণ-কাহিনীতে কতের সঙ্গে নারী-পরমেশ্বরের যে অত্যন্তসংযোগ উল্লিখিত আছে তার আভাস রয়েছে ঐ ঋকে। নারী-পরমেশ্বর কতের বাহবল তাঁর শক্তি। (মার্কণ্ডেয়-পুরাণের চণ্ডী-সপ্তশতীতে দেবী শুধু কতের নন সমস্ত দেবতার শক্তির ধনীকৃত মূর্তি। এ যেন তৃতীয় ঋকে উল্লিখিত বিভজন ব্যবহার বিপরীত। ইনি লোকসাহিত্যের, চণ্ডীর মতো বিবাহ সংসর্গের মূলও আছেন। সপ্তম ঋকে

বলা হয়েছে—ইনি বিশ্ববাতা, সৃষ্টিকর্তারও বাতা। অষ্টম শতকের প্রতিপাদ—  
ইনি বিশ্বকুবনের ধাত্রী তবে বিশ্বকুবনে বাধা নন।

ঋক্-সংহিতার অষ্টক্ৰমণী অহুসারে হুক্তটির “ঋবি” (অৰ্থাৎ প্রাণেতা বা উৎস)  
এবং “দেবতা” (অৰ্থাৎ উদ্ভিষ্ট উদ্ভিষ্টদেব) দুই “বাগ্, অভ্গ্ণী”। নামটিকে  
ব্যাখ্যা করে সারণ বলেছেন যে, বাক ছিলেন এক ব্রহ্মজ্ঞা ঋষিকা, অভ্গ্ণের

“অভ্গ্ণ” শব্দটি ঋক্বেদে শুধু এই একস্থানে পাওয়া যায় (১.১৩৩.৫)

পিশঙ্গভূটিম্ অভ্গ্ণং

পিশাচিম্ ইন্দ্র সং যুগ।

সর্বং রক্ষো নি বর্হয়।

অহুবাদ করলে হবে

রক্তাশ্র শূলধারী অভ্গ্ণ পিশাচিকে (অথবা পিশাচি অভ্গ্ণকে) ইন্দ্র,  
বিচূর্ণ কর। সব রক্ষকে ধ্বংস কর।

সন্দেহ রয়ে যায়, “অভ্গ্ণং” নাম না বিশেষণ। এই নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে  
মতভেদ আছে। “পিশাচি” আর কোথাও নেই, তবে “পিশাচী” আছে অথর্ব-  
সংহিতার। স্পষ্টই এ শব্দটি পিশাচের সঙ্গে সংবদ্ধ। আপাতত পিশাচিও  
পিশাচের সঙ্গে সংবদ্ধ ধরা যেতে পারে। ঋক্-সংহিতার বাক্যব্যবহার অহুসারে  
“পিশাচি” ব্যক্তি নাম আর “অভ্গ্ণ” বিশেষণ। সেইভাবে গেল্ডনেরও ব্যাখ্যা  
করেছেন। কেউ কেউ আবার “পিশঙ্গ ভূটি”, “পিশাচি” এবং “অভ্গ্ণ”  
তিনটিকেই ব্যক্তি নাম ধরতে চান। সে যাই হোক, শ্লোকটি থেকে বোঝা  
যাচ্ছে যে “অভ্গ্ণ পিশাচি” অথবা “পিশাচি অভ্গ্ণ” একজন প্রধান ঋক্।  
“ঋক্” মানে “যজ্ঞত”—(অৰ্থাৎ দেব-) উপাসকদেব অনিষ্টকারী বিপক্ষ দেবশক্তি  
যার থেকে দেবধাত্রীরা রক্ষা চাইতেন। অষ্টক্ৰমণীর নির্দেশ মানলে আলোচ্য  
হুক্তের প্রণেত্রীকে অভ্গ্ণ-উপাসকদের (অহুরদের ?) ব্রহ্মবাদিনী বলব।

এখন আসল কথাটি ফিরে আসি।

হুক্তটির “অহু” যে বাক্ তা বোঝাবার কোন হুক্ত তার মধ্যে নেই।  
তবে অভ্গ্ণ সে হুক্ত আছে এবং তা ধরে সে অহুয়ানে নির্খাত পৌছানো যায়।  
সে হুক্ত দেখাই।

যদ্ বাগ্, বরতি অবিচেতনানি

ব্রাহ্মী সেবানাং নিব্বাদ বজ্রা।

চতুর্থ উর্জা হুহুহে পরাংসি

ক খিন্ অস্তাঃ পরমঃ অগায় । ৮.১০০.১০

দেবতাদের কর্তা ( রাণী, দণ্ডনায়িকা ) বাক্ ( তখন ) অক্ষুট-বধূর ( হয়ে )  
অজান ( প্রাণীদের ) মধ্যে বসেছেন যখন ( তারা ) কথা বলে ।

চার ( ধারার ) দোরা হল শক্তি, হুহু ।

কে কোথায় এর শেষ পৌঁছেছে ।

দেবী বাচম্ অজানয়ন্ত দেবাস্

তাং বিশ্বরূপাঃ পশবো ববন্তি । ৮.১০০.১১ কথা ।

দেবী বাককে দেবতারা অস্ব মিরেছিল ।

বিশ্বরূপ পশুরা তা ব্যবহার করে ।

আমাদের আলোচ্য সৃষ্কের তৃতীয় ঋকের দ্বিতীয়ার্ধ এই সঙ্গে তুলনা করা যায় ।

বৈদিক কবিতাবনার বাক্ যেন গোবাতা, দেবমাতা অদিতির মতো ।  
আলোচ্য সৃষ্কের “অহম্” এই অদিতি-বাক্-ধেহু হতে বাধা নেই । বরং  
সঙ্গতি আছে । বাছুরের সঙ্গে গোক চরে, সে বাছুরকে রক্ষা করে । গোকর  
দুখে পুষ্টি হয়, শক্তি লাভ হয়, খনলাভও হয় ।

রুদ্রদের, বহুদের ও আদিত্যদের সঙ্গে যিনি চরে বেড়ান সেই “অহম্” যে  
নারী তা বিশেষণ থেকেই উপলব্ধ হয় । ইনি যে গোকৃপা এবং রুদ্রতনয়দের  
মাতা, আধুনিক কালের ভগবতী, আর ইনি যে বহুদের কস্তা এবং আদিত্যদের  
ভগিনী, তা বলা হয়েছে অন্তর্জ ( ৮.১০১.১৫ ) । পুরাণ কাহিনীতে দক্ষকস্তা  
শতী যজ্ঞরূপে আত্মাহুতি করেছিলেন । এখানে দেখছি তাঁকে যেন যজ্ঞীর পত্ন  
করে বধের উদ্ভোগ হচ্ছে । তিনি যেন জানীদের নিবেদন করেছেন, বলছেন—  
( আমি ) অদিতি, নিম্পাপ । ( আমাকে ) বধ ক’রো না ।

মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বহুনাং

অসাদিত্যানাম্ অমৃতন্ত নাভিঃ ।

প্র গু বোচং চিকিত্তুবে জনাং

মা গাম্ অনাগাম্ অদিতং ববীষ্ট । ৮.১০১.১৫ ।

রুদ্রদের মাতা, বহুদের দুহিতা,

আদিত্যদের ভগিনী, অমৃতের কণ্ড ।

জানীজনকে ভালো করে বলছি,

নিম্পাপ অদিতিকে বধ করো না ।



বজার্ণে (?) বধ-ভর্যাতা গোরুপথরী উর্বীর অহ্ননর আবেতার প্রাচীনতম অংশে পাওয়া, প্রতিধ্বনিত আছে। হুতরাং এ কল্পনা বেশ প্রাচীন। আবেতার গো-বাতার অহ্ননর বীর বিচক্ষণের কাছে নয় স্বয়ং “জানমনজং ব্রহ্ম” অহ্ননমজনার কাছে।

যদি কল্পনা করে নিই বধভীত গো-বাক্ মাতা অস্তহিত হয়েছিলেন তাহলে পরের ব্যাপারটুকু দশম মণ্ডলের একটি সূক্তে ( ৭১. ৫-৬ ) ধরতে পারি। অত্যন্ত কবিত্বময় বর্ণনা।

যজ্ঞেন বাচঃ পদবীৰ্যম্ আয়ন্  
তাম্ অরবিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ।  
তাম্ আভূত্যা ব্যাদধুঃ পুরুষা  
তাং সপ্ত রেভা অভিসংনবন্তে ॥৩॥

( পলাতক ) বাকের পরচিরু পেলেন ( দেবতার )। ঋজে পেলেন ঋষিদের মধ্যে প্রবিষ্ট ( তাঁকে )

তাঁকে নিয়ে এসে অনেক ভাগ করলেন। তাঁর উদ্দেশ্যে সাতজন রেভ স্তব করে থাকে ॥

( “রেভ” কথাটির মানে জানা নেই। তবে এর সঙ্গে সংবদ্ধ “রৈভী” শব্দ এক রকম “গাথা” অর্থাৎ গান অর্থে ঋক্-সংহিতায় ব্যবহৃত আছে। )

এই যে বাকের বহুবিভাজন এ স্বরগ্রামের সাত স্তব হতে পারে, এবং তার চেয়েও বেশি স্তব সাত রকমের-ছন্দঃস্তবক হতে পারে। অস্ত্রজ যে সপ্ত-বাণীর উল্লেখ আছে তা বিচার করলে শেষের অহ্নমানই গ্রহণ করতে হয়। প্রথম মণ্ডলের বিখ্যাত ১৬৪ নম্বর সূক্তটিতে এই প্রসঙ্গে যেটুকু বলা আছে তা এখানে আলোচনার যোগ্য।

গৌরীর্ষিষায় সলিলানি তক্ষতী  
একপদী দ্বিপদী সা চতুঃপদী ।  
অষ্টোপদী নবপদী বৃদ্ধবৃষী  
সহস্রাক্ষরা পরমে যোগ্যম্ ॥৪১॥

গৌর-গাই জলশ্রোত কাটতে কাটতে ডাক পাড়লে। সে একপদী দ্বিপদী চতুঃপদী

অষ্টপদী, নবপদী হয়ে হয়ে পরম যোগ্যে সহস্রাক্ষরা ॥

ধাকে “সপ্ত রেতা অস্তি সং নবন্তে” সেই বাক্যকে

উত স্বঃ পত্ন্য ন দর্শ বাচম্

উত স্বঃ শৃণু ন শৃণোতি এনাম্ ।

উত স্বৈশ্ব তদ্ব্যং বি সত্রে

জায়েব পতো উশতী স্বাসাঃ ॥৪॥

কেউ হয়ত দেখেও দেখতে পায় নি, কেউ হয়ত এঁকে শুনেও শোনে নি ।

কাউকে হয়ত ( ইনি ) নিজেকে ধরে দিয়েছেন যেন অজ্ঞানিণী পত্নী বেশভূষা করে পতির কাছে ॥

উত স্বঃ সথ্যে স্থিরপীতম্ আহম্

নৈনং হিষন্তি অপি বাজিনেষু ।

অথেষা চরতি মায়ৈষ্য

বাচং শুক্রবী অফল্যম্ অপুণ্যম্ ॥৫॥

( লোকে ) বলে ( এঁর ) সথিতে কেউ হয়ত এমন দৃঢ় ও পরিরক্ষিত যে তাকে বাদবিসম্বাদেও টলাতে পারে না ।

ধেমুহীন সে মিছামিছি ( গোদোহন ইত্যাদি ) আচরণ করে, ( যে ) ফলহীন পুণ্যহীন বাক্য শুনেছে ॥

বাক্য হল প্রীতির ডোর, সফলতার দুয়ার, মাহুবে মাহুবে বিশ্বাসের সমভূমি ।

মাহুবে মাহুবে বিশ্বাস যে নষ্ট করে সে দুর্ভাগা ।

যন্তিত্যাজ সচিবিনং সথায়ং

ন তস্মা বাচি অপি ভাগো অস্তি ।

যদীং শৃণোতি অলকং শৃণোতি

ন হি প্রবেদ স্কৃততস্মা পত্ন্যম্ ॥৬॥

যে সহায় সথাকে পরিত্যাগ করেছে বাক্য-বিষয়ে তার কোনো ভাগ নেই ।

যা কিছু শোনে ( সে ) অলীক শোনে । সৌভাগ্যের পথ ( সে ) চেনে নি ॥

আলোচ্য ঋক্-যুক্ত অজ্ঞানারে বাক্য দেবতাদের সর্বশক্তি । ( চৈতন্তের ধর্মে

যেমন ঈশ্বরের নাম “নাম্নাম্ অকারি বহতা নিজ-সর্বশক্তি স্তত্রাপিতা” । ) ইন্দ্র

বধন দেবতাদের মধ্যে সর্বাভিলাষী হলেন তখন তাঁর নিজস্ব শক্তি কল্পনা করে

তাঁর নাম দেওয়া হল “শচী”, অর্থে এবং ব্যুৎপত্তিতে “শক্তি”র সঙ্গে সংবন্ধ ।

ঋগ্বেদে ইন্দ্রপত্নীর কথা অনেক আছে কিন্তু কোথাও তিনি ইন্দ্রের শক্তি নন

আর শচী বলে উল্লিখিতও নন । কোন দেবতার শক্তিকে সে দেবতার পত্নীরূপে

কল্পনার আভাসটুকুও বাক-সংহিতায় নেই। সে কল্পনার শুরু পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে, প্রতিষ্ঠা পৌরাণিক সাহিত্যে। দেবতাদের শক্তি বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে।

বাচং দেবা উপজীবন্তি বিধে

বাচং গন্ধর্বাঃ পশবো মনুষ্যাঃ।

বাচীনা বিশ্বা ভুবনানি অর্পিতা

সা নো হবং জুবতাম্ ইঙ্গপতী ॥ ২-৮-৮ ॥

সমস্ত দেবতা বাক নিয়ে বেঁচে আছে, বাক নিয়ে গন্ধর্বেরা পশুরা মানুষেরা। বাক মধ্যে এই বিশ্ব ভুবন স্তম্ভ। ইঙ্গপতী তিনি আমাদের আহুতি উপভোগ করেন।

কর্ণিষ্ঠলকার্কক-সংহিতায় (৪-৬) এক সাংঘাতিক কথা পেয়েছি। তার আভাসও অন্ত কোথাও দেখি নি। সে কথা বলে আলোচনা শেষ করি।

বাচা বৈ সহ মনুষ্যা অজায়ত। ঋতে বাচা দেবান্চাহরাস্ত।

তে যন্ মনুষ্যা অবনংস্তদেবান্ধবন্। তে দেবান্চাহরাস্ত

প্রজাপতিমক্রবন্ ইমে বাবেতদভুবন্ ইতি। সাবাচঃ সত্যং

নিরমিরীত তু তুঃ স্বঃ ইতি। যতুরীঃ অনৃতং তন্

মনুষ্যোযু স্তথাং। এতদ্ বৈ বাচোহনৃতং যন্ মনুষ্যা বদন্তি ॥

বাক নিয়ে মানুষ জন্মাল। বাক ছাড়া দেবতারা ও অশ্বরেরা। সে মানুষেরা যখন যা বলত তাই ফলত। সে দেবতারা ও অশ্বরেরা প্রজাপতিকে বললে, এই রকম তো হল। তিনি বাক থেকে সত্য (অংশ তিন ভাগ) নিয়ে নির্মাণ করলেন তুঃ-তুঃ স্বঃ এই। যা চতুর্থাংশ, অসত্য, মানুষের মধ্যে রেখে দিলেন। এই তো বাকের অসত্য যা মানুষেরা বলে ॥

তা যদি হয় তবে মানুষ দেবতার চেয়ে বড়, যেহেতু সে দেবতাকে বাকদান করেছে। তার কত কাল পরে সে পুতুলকে দেবতা বানিয়ে নিজে দীনহীন ভক্ত সেকেছে। যেন পড়ছে খোলাবেচা শ্রীধরকে ঈশ্বরভাবাবিষ্ট চৈতন্তের উক্তি বুদ্ধাবনদাসের কথায়।

আবারে সকল দিয়া তুমি ভিক্ষার্থ ॥

## কি এ যক্ষ

ভলবকার উপনিবনে একটি চরংকার গজ আছে। গজটি বলার রীতি লেখা নয়, সেকালের কথা। সেই হিসাবে অত্যন্ত উপভোগ্য। (অন্তত আমার কাছে তাই মনে হয়েছে।) বধ্যবধ এবং আক্ষরিক অর্থবাদ দিচ্ছি সম্পূর্ণ গজটির। এর থেকে পাঠক আর কিছু না হোক এটুকু বুঝবেন যে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে আমাদের সাহিত্যে এখনকার চলিত ভাষার অল্পরূপ চঙ কেমন ছিল।

ব্রহ্ম দেবতাদের জিতিয়ে গিলেন। সেই ব্রহ্মের বিজয়ে দেবতারা জাঁক করতে লাগলেন। তাঁরা স্থির করলেন আমাদের এ বিজয় আমাদেরই এ বাড়বাড়ন্ত।

তিনি<sup>১</sup> এঁদের মনোভাব জানলেন। তাঁদের জন্ত প্রাহুর্ভূত হলেন। তাঁরা জানলেন না কী এই যক্ষ।

তাঁরা অগ্নিকে বললেন, জাতবেদস<sup>২</sup> ব্যাগারটা জানো তো—কী এ যক্ষ। বললেন<sup>৩</sup> তাকে<sup>৪</sup> উদ্দেশ করে, কে বটে, আমি তো অগ্নি বটি, বললে, আমি তো জাতবেদস<sup>৫</sup> বটি।

তা তোমাতে কী গুণ আছে?

এই সবই আমি পোড়াতে পারি—এই যা কিছু পৃথিবীতে।

তার<sup>৬</sup> দিকে একগাছি ঘাস রাখলেন।

এটা পোড়াও।

সেদিকে<sup>৭</sup> এগিরে গেল সমস্ত জোর দিয়েও তা পোড়াতে পারলে না।

তখন সে ফিরে এল। জানতে পারলুম না কী এ যক্ষ।

তারপর বায়ুকে বললেন,<sup>৮</sup> বায়ু জানো তো—কী এ যক্ষ।

বেশ।

দৌড়ে গেল।

বললেন<sup>৯</sup> তাঁকে<sup>১০</sup> উদ্দেশ করে, কে বটে?

আমি তা বায়ু বটি, বললে, আমি তো মাতৃগিহ্ন<sup>১১</sup> বটি।

তা তোমাতে কী গুণ আছে?

এই সবই আমি ভুলে নিতে পারি—এই যা কিছু পৃথিবীতে।

তার দিকে একগাছি খাল রাখলেন। এটা তুলে নাও।  
সেদিকে এগিয়ে গেল। সমস্ত জোয় দিয়েও তা তুলতে পারলে না।  
তখন সে কিয়ে এল। জানতে পারলুম না—কী এ যক্ষ।  
তারপর ইজ্ঞকে বললেন, যথবন্ জানো গে—কী এ যক্ষ।  
বেশ।

সে দিকে দৌড়ে গেল।

তার<sup>১</sup> কাছ থেকে জিরোধান করলেন। সেই খোলা জায়গাতেই সে  
দেখা পেলে খুব শোভাশালিনী এক নারীর— উমা হৈমবতীর।  
তাকে<sup>২</sup> বললে, কী এ যক্ষ?

সে<sup>৩</sup> বললে, ব্রহ্ম। ব্রহ্মেরই এ বিজয়ে তোমরা জাঁক করছ।

তখন থেকেই জানতে পারলে<sup>৪</sup> ব্রহ্ম বলে।

সেই হেতুই এই দেবতাগুলি অস্ত্র দেবতার উপরে—অর্থাৎ অগ্নি, বায়ু,  
ইজ্ঞ। তারাই এর সবার থেকে কাছে ঘেঁষতে পেরেছিল।

তারাই এঁকে<sup>৫</sup> প্রথম জেনেছিল ব্রহ্ম বলে।

সেই হেতুই আবার ইজ্ঞ সকল দেবতার উপরে। সেই এঁকে<sup>৬</sup> সবার  
চেয়ে কাছে ঘেঁষতে পেরেছিল। সেই এঁকে<sup>৭</sup> সবার আগে জেনেছিল  
ব্রহ্ম বলে।

তার<sup>৮</sup> উদ্দেশ এই যে বিদ্যাং চমকাল—এমনি। এই যে পলক পড়ল  
এমনি।

এখন প্রশ্ন ‘যক্ষ’ (ক্লীবলিঙ্গ) বলতে কী বোঝাত। শব্দটি ঋগ্বেদে আছে,  
পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে আছে, সংস্কৃত সাহিত্যে নেই। উপনিষদের যে  
গল্পটি বলা হল তার মধ্যেই এই শব্দটির অর্থ পরিপূর্ণভাবে মেলে। ‘যক্ষ’  
মানে যেন আলেয়ার আলো, —অলৌকিক এবং ক্লিক আবির্ভাব বা বিস্মিত  
অভিভূত করে, অথবা ভুলিয়ে নিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের কথায় ভালো করে  
বলা যায়—‘সে কেবল পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায় ডাক দিয়ে যায় ইজ্ঞিতে।’

সংস্কৃত সাহিত্যে ‘যক্ষ’ ব্যক্তিবাচক পুংলিঙ্গ শব্দ, জ্ঞীলিঙ্গে ‘যক্ষী’ ‘যক্ষিনী’।  
যক্ষ যানে উপদেবতা বিশেষ<sup>১২</sup>। (কখনো কখনো অপদেবতাও—তখন  
তাঁরা প্রৌণীক হন যক্ষ: ও দানবদের সঙ্গে। যেমন বাংলায় দক্ষিণ দান।।)  
উপদেবতারূপে যক্ষ ও যক্ষনারীর সবচেয়ে ভালো ছবি পাই কালিদাসের  
মেঘদূতে। সেখানে তারা কৈলাসে শিবের প্রজা। তারা ধনী, তারা শক্তিশালী

হুম্মর, হুম্মপ, হুম্মিনীত, কলাবিং। পুরাণকাহিনীতেও যক্ষেরা কৈলাসনিবাসী, ধনাধিকারী এবং শিবাহুচর। এঁদের মুখ্য কুসেব। যক্ষনারীরা কিন্তু যক্ষপুত্রবনের থেকে আলাদা হয়ে পড়েছে। তারা অত্যন্ত রূপসী, হুবেশী, প্রচুর অলঙ্কারধারিণী, কুণ্ডবাসিনী অথবা বৃক্ষতলসঞ্চারিণী এবং পুরুষপ্রসূক-কারিণী। প্রাচীন ভাষ্যে এই পুরুষ-জাতের যক্ষ এবং নারীজাতের যক্ষিণীর নিদর্শন প্রচুর আছে। সেখানে যক্ষ নাদাপেটা, গলায় উত্তরীর, হাতে টাকার থলি—প্রসন্ন মূর্তি। আর যক্ষিণী হুম্মরী সালফুতা হুম্মিতা—উলঙ্গ অথবা স্বল্পনীবিবন্ধপরিহিতা, গাছের উপরে অথবা গাছের—সাধারণত আমগাছের—তলায় অধিষ্ঠিতা। (আমগাছের সঙ্গে যক্ষিণীর সম্পর্ক মনে হয় ‘অম্বা’, ‘অম্বিকা’, ‘অম্বালিকা’—এই তিনটি নাম যা আগে হুলাভিকা বৈষ্ণবীর নাম ছিল, পরে দুর্গার নামান্তর হয়েছে—তার থেকে।)

যক্ষদের নিবাস ছিল কৈলাসে। কিন্তু কৈলাসের সঙ্গে যক্ষিণীদের কোন যোগাযোগের উল্লেখ নেই। কালিদাস যক্ষপত্নীকে একবারও যক্ষিণী বলেন নি একথা লক্ষ্য করবার মতো। যক্ষিণীদের সঙ্গে যে যক্ষদের যোগ ছিল তারা কিন্তু পর্বতবাসী নয় বৃক্ষবাসী।

বৌদ্ধ সাহিত্যে যক্ষ-যক্ষিণীরা হল মারের অহুচর। তারা কামরূপী কামচারী বিত্তবান। তারা নিজেদের মধ্যে ভালোভাবেই থাকে, কিন্তু মানুষের তারা বিপক্ষ, তাকে বিপথগামী করে ধ্বংসপথে নিয়ে যায় তারা। তবে মানুষের কবলে এসে তার প্রেমে পড়ে যক্ষিণী যে মানুষ হয়ে যায় তার গল্পও বৌদ্ধ সাহিত্যে আছে। সিংহল ছিল যক্ষদের দেশ<sup>১৩</sup>। সেখানে দলবল নিয়ে মানুষ বিজয়সিংহ গিঞ্জে বিপদে পড়েছিলেন। যক্ষ রাজকন্টার মন জয় করে নিয়ে বিজয়সিংহ লঙ্কা থেকে যক্ষদের দূরীভূত করে মানুষের রাজত্ব স্থাপন করেছিলেন।

সংস্কৃত সাহিত্যে যক্ষ-পূজার কোন সোজা সূত্র উল্লেখ নাই। অবাস্তবভাবে কিছু কিছু আছে। কালীপূজার রাজ্যে যে দেওয়ালি উৎসব হয় তা একটা কোন একরকম যক্ষপূজার অঙ্গ ছিল বলে মনে করি। পরবর্তীকালে যা দীপাবলী নামে খ্যাত তার উল্লেখ আগে পেয়েছি ‘যক্ষরাজি’ বলে। এইদিন পশ্চিমা সত্তাগরুরা যে ব্যাপকভাবে জুয়া খেলে বলে শোনা যায় তা ধনপতি যক্ষের পূজাবিধিরই মনোহর পরিণাম বলে ধরতে পারি।

এককালে বাংলাদেশে এবং অন্তর্জ পশ্চিম দেবদেবীর প্রতিমা পূজা অজ্ঞাত ছিল না। উত্তর বাংলায় শূগল (অথবা বৃক)-মুখ বিষ্ণুর সেবা পূজার এবং

সে বিষ্ণুর মন্দিরের উল্লেখ ঘটে সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে আছে। ‘কোকা-মুখ’ দেবীর উল্লেখ পরবর্তীকালেও বর্ণিত আছে। উক্তিমাত্র বোড়ামুখ বাতালী অনেক গ্রামে এখনও পূজা পান। এই রকম পণ্ডমুখ দেবতার পূজা বঙ্গ পুজোরই এক পরিণাম বলে মনে হচ্ছে। বক্ষেরা কামরূপ। তারা শিবের অহুচর। শিবের অহুচর অনেকেই পণ্ডমুখ। গণেশ তো বক্ষরাজ বলে স্বীকৃত। তাঁর ক্ষীত উদর প্রাচীন বক্ষমূর্তির মতো, তাঁর হাতের নাদু (বা জবীর) প্রাচীন বক্ষমূর্তির হাতে টাকার ধলিরই রূপান্তর। গণেশ ছিলেন প্রথমে বিয়রাজ, পরে হয়েছেন পূজা পাবার জন্যে বিয়রাজ। অতএব গণেশ পূজাও বক্ষপূজার এক পরিণতি।

তান্ত্রিক মহাবানে বীতংসাকৃতি অনেক দেবদেবীর উপাসনা চলিত ছিল।<sup>১০</sup> তার মধ্যে বক্ষপূজার ইতিহাস বোধ করি অনেকটাই নিলীন আছে। কেবল হেরকের বেলায় স্পষ্ট প্রমাণ কিছু মিলছে। ‘হেরক’ শব্দটি ভৈরব শব্দের সমার্থক। মানে ভীষণদর্শন। অর্বাচীন সংস্কৃতে ‘হেরক’ শব্দ পাই শিবের এক অচুচরের নাম হিসাবে। একদিকে ‘হেরক’ নামটি গণেশের আর হেরকেরও।

চৈতন্যের জন্মকালে দেশের আধ্যাত্মিক আচার বিচার ও আবহাওয়ার প্রসঙ্গে বৃন্দাবনদাস বলেছেন যে, কেউ কেউ মদ মাংসের আয়োজন করে দক্ষকে পূজা করে।

মদ্য মাংস দিয়া কেহ বক্ষপূজা করে।

আমি অত্যান করেছিলাম, এ বক্ষপূজা ধর্মঠাকুরের গাজন হতে পারে। এখন মনে হচ্ছে তা না হওয়াই সম্ভব। ধর্মের গাজনে মদ্যমাংসের আয়োজন থাকে, কিন্তু তা সর্বজন্য এবং সে আয়োজন অপরাপর আয়োজনের তুলনার পরিমাণে বেশি এবং কার্ণে গুরুতর নয়। তা ছাড়া ধর্মের তো কোন মূর্তিই নেই। ঘট, হুড়ি এবং/অথবা পাদ-প্রতীক - এই হল ধর্মের প্রতিনিধি পূজা গ্রহণে। অতএব বৃন্দাবনদাসের উল্লিখিত বক্ষপূজা তৎকাল পর্যন্ত প্রচলিত বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধনা থেকে আগত ভীষণদর্শন মূর্তিপূজা হতে পারে এবং/অথবা বক্ষিণ-রায়ের মতো ক্ষেত্রপাল দেবতার পূজা হতে পারে। বক্ষপূজা যে ক্ষেত্রপালপূজার সঙ্গে মিলিয়ে গেছে তা প্রতিপাদন করছি।

বক্ষীদেব মতো বক্ষরাজ বৃন্দাবনিত হয়েছিল প্রাচীনকালের লোকবিশ্বাসে। অর্বাং কুবিক্কেজের অথবা পণ্ডচারণ ক্ষেত্রের তত্ত্বাবধায়ক উপদেবতারূপে।

‘কেজপাল’ নাম ও আইডিয়াটি ভৃগুবোনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। অরণ্যের কেজপালিনী অরণ্যানী তখনই দেবতাস্বা হয়ে গিয়েছেন। ইনিই আমাদের দুর্গা-দুর্গমে, দুর্গতবের রক্ষয়িত্রী। প্রাচীনতর অরণ্য শব্দটি অপ্রচলিত হয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে অরণ্যানীও নাম পালটান। পরবর্তীকালে ব্যাকরণকর্তাদের জ্ঞানপথে নিয়ে যাবার জন্তই বোধ হয় অরণ্যানী অভিধান অথচ ব্যাকরণ থেকে একবারে নির্বাসিত হয়নি।

পুরানো ভাষ্যে বক্ষিপীদের সঙ্গে আমগাছের বনিষ্ঠ সম্পর্ক আগে উল্লেখ করেছি। এঁরা কি তবে আমবাগানের রক্ষয়িত্রী ‘অম্বপালী’ কেজপালিনী ছিলেন? অসম্ভব নয়।

বাংলাদেশের লোকবিশ্বাসে গোমুখ অথবা গোরূপ বক্ষিপী ও বক্ষিশিঙও পশু-রক্ষক কেজপালরূপে দেখা দিয়েছিলেন যথাক্রমে গো-ভাগবতে পর্বট-বাসিনী (অর্থাৎ পাকুড় গাছে অধিষ্ঠিতা) ভগবতী এবং অনির্দিষ্ট বৃক্ষবাসী ‘গোরামা’ (অর্থাৎ ‘গোরামা এখন ‘গোরা’, ‘গোরাটান’ ইত্যাদি নামে স্থান বিশেষে পরিচিত) রূপে। গো-ভাগবতের ভগবতী আর শিশু-কল্যাণী যষ্টী অভিন্ন। শিশু জন্মের ষষ্ঠদিনে যে যষ্টী পূজা হয় তাতে একদা ভাগাড় থেকে গোমুখ আনা হত দেবীর প্রতীক রূপে। যষ্টী এখন ভাগাড়ের থাকেন না, থাকেন তার কাছাকাছি কোন পাকুড় অথবা অশখ গাছ তাঁর ধান। সেখানে পূজবতী নারীরা পূজা দিতে যান। সে পূজা উৎসবেই নাসান্তর।

ধনভাগ্যবান বন্ধ লোকবিশ্বাসে বিশেষ করে বটবৃক্ষনিবাসী হয়েছিল। এ বিষয়ে একটি পুরানো গল্প আছে। লোকালয়ের প্রান্তে এক দরিদ্র দম্পতী থাকত। তাদের বাড়ীর কাছেই এক বিরাট বটগাছ ছিল। তারা ভক্তি করে সেই বটগাছে পাল-পার্বণে জল দিত। সে গাছে থাকত এক বন্ধ। তিনি তাদের ভক্তিতে খুশি হয়ে প্রচুর ধন দেন। তাতে করে তারা রাজা হয়। বয়স হলে রাজদম্পতী যারা গেল। তাদের ছেলে, অল্পবয়সী বিবাহিত, রাজা হল। অল্পদিন বিবাহ হয়েছে, রাজা রাণীকে ছেড়ে থাকতে পারে না। রাজকার্যে নৈখিল্য এল। সুযোগ বুঝে আশেপাশের রাজারা জোট বেঁধে আক্রমণ করতে এল। রাজা নির্বিকার, যষ্টীরা হা-হুতাশ করছে। খবর এল পাকুড় নগর অবরোধ করলে বলে। খবর বন্ধ এল তখন রাজারানী



বিজ্ঞানাগারে। ব্যাকুল হয়ে রানী বললে, করছ কি? যাও যুদ্ধ কর সে।  
রাজা হেসে এই শ্লোক বলে পাশ পাড়তে বললে,

‘বটবৃকসিঁতা যক্ষা ধনভীহ হরন্তি চ।’

অক্ষানপাতর কল্যাণি যদ্ ভাব্য তদ্ ভবিষ্যতি ॥

—মানে বটগাছে ধার অধিষ্ঠান সেই যক্ষ কখনও দিচ্ছেন কখনো নিচ্ছেন। হে  
কল্যাণি পাড়ো পাশার পাটি। যা হবার তা হবে।

বটগাছ থেকে যক্ষ একথা শুনলেন। তাঁর ভাবনা হল, তাইত এখন নিজের  
মান তো নিজেই রাখতে হয়। তিনি অবিলম্বে বিশাল বাহিনী সৃষ্টি করে  
শত্রুদলকে উৎখাত করে দিলেন।

রাজা রানীকে বললে, দেখলে তো? খুব ঘটী করে যক্ষের পূজা দেওয়ার লে।

অরুণ্যাসী-দুর্গার উল্লেখ করেছি। তাঁর পিছনেও যক্ষিনী কল্পনা আছে।  
সে পরিচয় রয়েছে চতুর্থমঙ্গলের গল্পে। যিনি প্রথমে গোধা, পরে সুন্দরী  
নারীরূপে দেখা দিয়ে ব্যাধনম্পত্যীকে ধনভাণ্ডার দিয়েছিলেন। সে কাজ  
যক্ষিণীর মতো। যিনি খুল্লনাকে পুত্রবর দিয়েছিলেন এবং কালিদাসে  
ধনপতিকে ছলনা করেছিলেন তিনি তো যক্ষিণী। বলতে পারি তিনি যক্ষিণী  
মুখ্যা, বক্ষরাজভার্যা। কেন তা পরে বলছি।

সংস্কৃতের ‘যক্ষ’ শব্দটি প্রাকৃতের মধ্যে দিয়ে বাংলায় এসে হয়েছে ‘যথ’। কিন্তু  
এতক্ষণ যে যক্ষের আলোচনা করে এলুম বাংলার ‘যথ’ ঠিক তেমনটি নয়।  
বাংলার যথ দেবতা নয় দেবযোনিও নয়, উপদেবতাও নয়—পুরোপুরি অপদেবতা  
অর্থাৎ ভূত, মাহুঘের বন্দী প্রোতাস্মা। সে এক নির্দিষ্ট ধনভাণ্ডারের ভাণ্ডারী  
এবং গ্রহরী। তাকে নিযুক্ত করেছে কোন এক মাহুঘ তান্ত্রিক অভিচার করে  
তাকে তলঘরে কোথাগারে বন্দী করে খালসুদ্ধ করিয়ে মৃত্যু ঘটিয়ে।  
স্ববীজনাথের ‘সম্পত্তি-সমর্পণ’ গল্পটি পড়ে দেখলে যথ দেবার কার্যক্রমটুকু বুঝতে  
পারবেন। যে ব্যক্তি যথ দিয়েছে তার উদ্দিষ্ট ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর হস্তে  
সম্পত্তি সমর্পণ না করা পর্যন্ত যথের নিষ্কৃতি নেই। যথের ধন অস্ত্র কেউ নিতে  
বা ভোগ করতে পারে না। যথের সঙ্গে সম্পত্তিও অভিশপ্ত।

ভারতবর্ষের অস্ত্রান্ত আধুনিক আর্থ-ভাবাভেদে ‘যক্ষ’ শব্দের তত্ত্ব রূপ  
মানারকম অপদেবতা বোঝায়। যেমন প্রাচীন গুজরাটে ‘জাথ’, হিন্দীতে  
‘জাক’—দানব, হিন্দীতে ‘জাথনি’ দুর্গার অহুচরী দানবী; মারাঠীতে ‘জকিণ’।  
‘জকিণ’—প্রসবকালে অথবা জন্মে ডুবে মৃতনারীর ভূত; ইত্যাদি।

এরপর তলবকার উপনিষদের গল্পে ফিরে আসি। প্রাচীনতম উপনিষদ-গুলিতে বিশ্বসত্তা নিগূণ নিরঞ্জন ব্রহ্মতত্ত্বরূপে প্রথম উপস্থাপিত হয়েছিল।

অপেক্ষাকৃত অবাচীন এই উপনিষদে গল্পরূপে নিগূণ ব্রহ্মতত্ত্ব সপ্তম বিশ্বসত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তুরূপে প্রথম উপস্থাপিত হল। ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তার ইতিহাসে এ ব্যাপার গুরুত্বপূর্ণ।

ব্রহ্ম-যক্ষের স্বরূপ জানতেন শুধু উমা হৈমবতী। তাঁর নাম ও বর্ণনা থেকে সহজেই উপলব্ধি হয় যে তিনিই শিবগৃহিণী পার্বতী। হুতরাং তিনি ব্রহ্ম-যক্ষিণী। ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তার শিব-শক্তিবাদের এই প্রথম প্রকাশ, হুতরাং গুরুত্বপূর্ণ।

গৌরাগিক ও লৌকিক শিব বহুরূপী—কখনো যোগী, কখনো ব্রহ্মচারী, কখনো ভণ্ডবেশী ভিক্ষুক, কখনো নটরাজ, কখনো ধুস্তর গজিকার ভোর—ক্ষীতদেয়। হুতরাং তিনি যক্ষ—আদি যক্ষ। ভারতীয় দেবতাতত্ত্বের ইতিহাসে এ ব্যাপার গুরুত্বপূর্ণ ॥

১ মূলে আছে ‘তং’। ব্রহ্ম এখানে শব্দ ক্রীতলিঙ্গ। হুতরাং অল্পবাদ হওয়া উচিত ‘সে’ বা ‘তা’। ২ মানে যা কিছু জন্মেছে তা সবই বার অধিকারে। ৩ ব্রহ্ম। ৪ অগ্নি। ৫ ঘাস। ৬ দেবতার। ৭ বায়ু। ৮ ইন্দ্র। ৯ উমা হৈমবতী। ১০ ব্রহ্ম। মূলে আছে ক্রীতলিঙ্গ ‘এতং’। ১১ ব্রহ্মে। ১২ মহাতারতের বনপর্বে এক সলিলবাণী যক্ষের গল্প আছে। সেখানে যক্ষ ব্রহ্ম নয়, তবে ব্রহ্মবিদ বটে। ১৩ এখানে মনে রাখতে হবে রাবণের রাজত্ব যে লঙ্কায় ছিল তা সিংহলই। ‘লঙ্কা’ শব্দটির মানে ছিল হিমালয়ে যক্ষপুত্রী ‘অলকা’ নামের মতো...রাবণও যক্ষ ছিল। সে কুবেরের ভাই। ১৪ হিমালয়ের সঙ্গে যক্ষের সম্পর্ক হৈমবতীর মধ্য দিয়ে তলবকার উপনিষদের গল্পের দিন থেকে। বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবদেবীরা অনেকেই এসেছেন হিমালয়ের পথে। সে কথা এখানে স্মর্তব্য। বলা আবশ্যিক মনে করি যে, ঋগ্বেদে নামটি অসদ্ব্যাস রূপেই পাওয়া যায়।

## দেবীজ্ জনম

দেবতাদের জনকথা ঋগ্বেদে আছে, আবার নেইও। কোন কোন দেবতার--যেমন বিষ্ণুর জনকথা মোটেই নেই। কোন কোন দেবতার জনকথা--যেমন ইন্দ্রের - মোটামুটি তবে ছাড়াছাড়িভাবে পাওয়া যায়। কোন কোন দেবতার জনম সম্বন্ধে এমন কথা আছে যার যানে হয় না। যেমন দক্ষ, দক্ষ অদিতির পুত্র। আবার অদিতির পিতা। অধিকাংশ দেবতার উৎপত্তির কথা অত্যন্ত ধোঁয়াটে।

তার কারণ আছে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর জনগণ যখন যমিষ্ঠ প্রতিবেশী হয়ে বাস করছিল, তখন তাদের মধ্যে দেবতার কিছু গল্পকথা গড়ে উঠেছিল। তার পরে সে জনগণ যখন বিভিন্ন দলে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র উপনিবেশ স্থাপন করে, তখন তারা তাদের পুরোনো গল্প কথার উপর রঙ চড়িয়ে নতুন গল্প কথার সৃষ্টি করতে থাকে। সেই গল্প কথার নায়ক-নায়িকাও বিশিষ্ট দেবতা রূপে সেই সেই দলে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তার পরে বিচ্ছিন্ন উপনিবিষ্ট দলগুলিও উপদলে আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এইভাবে অস্তুত হবার বিচ্ছিন্ন হবার পর ইন্দো-ইউরোপীয়ভাষীর যে উপদল ভারতবর্ষে এসেছিল তাদেরই প্রাচীন গল্প কথা মিশ্রিত স্তব ও গান খিচুড়ি পাকিয়ে আমাদের বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ-সংহিতায় রূপ ধারণ করেছে। সাহিত্যের দিক দিয়ে বিচার করলে ঋগ্বেদ ইন্দো-ইউরোপীয়-গোষ্ঠীর সবচেয়ে পুরোনো কাব্যগাথার বই। এতে এ গোষ্ঠীর প্রাচীনতম মিথের টুকরো অনেক আছে। পূর্ববর্তী কালের অর্থাৎ প্রথমবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যখন তাদের পূর্বপুরুষ ইরানীয়দের পূর্বপুরুষের সঙ্গে একতালে বাস করত - অনেক মিথও সেই সঙ্গে জড়িয়ে আছে। একদা পণ্ডিতদের মনে হয়েছিল এ জট ছাড়ানো বুঝি অসাধ্য। কিন্তু প্রাচীন ভাষার ও প্রত্নবিদ্যার নতুন নতুন লেখ ও বস্তু আবিষ্কৃত হওয়ার কালে এবং ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর আধুনিক জনগণের মধ্যে ধারাবাহিত হয়ে আসা পুরাণ কাহিনী ও গল্পগাথা নিয়ে তোলন আলোচনার কালে আমরা এখন ঋগ্বেদের মধ্যে প্রত্নকথার টুকরোগুলি কিছু কিছু গোছাতে পারছি। আর সব মিলিয়ে আমাদের কোন কোন প্রাচীন দেবতার প্রাচীনতম স্বরূপ ও চরিত্র আভাসে ইলারার জানতে পারছি।

যত দূর বোকা গেছে তাতে বলা যায় যে, আদি দেবতা যার থেকে অস্ত্র দেবতা উৎপন্ন হয়েছিল তিনি ছিলেন ‘দ্যৌ’ অর্থাৎ সমুজ্জ্বল আকাশ। এঁকে দেবপিতা বলে মানত ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর জনগণ। তার প্রমাণ, ঋগ্বেদে দ্যৌঃপিতা=গ্রীকে দেউস পতের=লাটিনে জেউস পতের=ইংরেজী জুপিটার। কথাটির মানে আকাশ পিতা। কিন্তু দ্যৌকে পিতৃভাবনা পরবর্তীকালের। তার আগে ইনি মাতৃভাবেও কল্পিত ও উপাসিত হতেন। মনে হয় তারও আগে দ্যৌ ছিলেন মাতাই। (প্রিমিটিভ মানুষের ভাবনার মাতাই আসল জন্মদাতা, প্রত্যক্ষ। পিতার জনকত্ব অপ্রত্যক্ষ এবং অনির্দিষ্ট ও অনির্দেশ্য।) ঋগ্বেদের কালের ঢের আগেই পিতৃশাসন রূঢ় হয়ে গিয়েছিল। তাই সেখানে পিতারই প্রাধান্য, মাতার নয়। (তবে কোন কোন দলে মাতৃদেব ভাবনাও প্রচলিত ছিল।) ঋগ্বেদে প্রাচীনতর মাতৃভাবনার রেশ বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। তাই ঋগ্বেদে শব্দটি পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ, অর্থাৎ পিতা ও মাতা দুই-ই বোঝায়। এমন কি একবার বলা হয়েছে “দ্যৌর্দেবী”। এখানে ইনি পৃথিবীর স্থান নেন নি। কেননা সেই সঙ্গে পৃথিবীরও উল্লেখ আছে। ‘পুনর্নো’ অহং পৃথিবী দদাতু পুনর্দ্যৌর্দেবী পুনরন্তরিকম্’ (১০-৫২-৭)। দ্যৌ যখন মাতা তখন বৈদিক কবিকল্পনার—তারও আগে প্রাচীনতর মিথ—তিনি “অদিতি” অর্থাৎ সীমাহীন আকাশ। দ্যৌ আর অদিতি গোক-কল্পনার পড়ে হলেন যথাক্রমে বাঁড় ও গাই, দেবতার বাপ ও মা। দ্যৌ ও অদিতির মধ্যে প্রথমে ভেদ ছিল না। দুই-ই এক ছিল, কেবল দৃষ্টির কোণ আলাদা। ঋগ্বেদের একটি ঋকে অদিতিকে বিশ্বদেবতা, বিশ্বভূবন, এমন কি বিশ্বাত্মা বলা হয়েছে।

অদিতিবু দৌর, অদিতিবু অন্তরিকম্

অদিতিবু মাতা স পিতা পুত্রঃ।

বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চ জনা

অদিতি জাতম্ অদিতি জনিতম্।

১৮২-১০।

(অদিতি দ্যৌ, অদিতি অন্তরীক, অদিতি মাতা, সে পিতা, সে পুত্র। বিশ্ব দেবতা অদিতি, পাঁচজন অর্থাৎ বিশ্ব মানব অদিতি। যা জন্মেছে তা অদিতি, যা জন্মাবে তা অদিতি।)

এক হিসেবে দেবতার সবাই—যারা “দেব” বলে উল্লিখিত—দ্যৌ-এর

সন্তান, পুত্র অথবা নাতি-নাতনি (“নপাং” “নন্তী”)। দ্যৌ আর দেব শব্দ দুটি সমগোত্রীয়। (সাধারণ পাঠকের পক্ষে কঠিন হলেও এই প্রসঙ্গে একটু শব্দবিভার কচকচি না করে থাকতে পারছি না। এ লাইন কটি এড়িয়ে গেলে কোন কর্তি হবে না।) ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষার অনেক মৌলিক শব্দধাতু ছিল যার চেহারা স্থির ছিল না। বিভিন্ন পদে বিভিন্ন রূপ দেখা যেত। সুতরাং শব্দধাতুটিকে নির্দেশ করতে গেলে সব রূপগুলিই দেখিয়ে দিতে হয়। কিন্তু তাতে আলোচনার কামেলা বাড়ে অথবা। সেই জন্তে শব্দবিভাবিদেবরা রূপভেদগুলির মধ্যে এমন একটি রূপকে মূল শব্দধাতু বলে নির্দিষ্ট করেন যার থেকে রূপান্তরগুলি সহজে উপলব্ধ হয়। তাই দ্যৌ-দেব শব্দগুচ্ছের মূল শব্দধাতু বলে ধরা হয়েছে, \*deyew—(দেয়েব্)। এই মূল শব্দধাতু থেকে প্রথম e ধ্বনিটি লুপ্ত হবার ফলে পেয়েছি, \*dyaw। এর থেকে সংস্কৃতে এসেছে দ্যৌঃ, দ্যাবা, দ্যাবঃ দ্যাম্ দবি ছা ইত্যাদি পদ ও শব্দ। আর দ্বিতীয় e ধ্বনিটি লোপের ফলে সংস্কৃতে পাচ্ছি, ‘দেব, দিবম, দিব’, দিবস’ ইত্যাদি শব্দ ও পদ। ‘দেবী’ দেব শব্দের জ্রীলিঙ্গ। সুতরাং ঋগ্বেদে ‘দেব, দেবী’ শব্দ দুটিতে প্রাচীন প্রয়োগের হিসেবে দ্যৌ-এর সন্তান ধরলে ভুল হবে না। ‘দেব’ শব্দের আর একটি অর্থও প্রায় গোড়া থেকে এসে গিয়েছিল, —ক্রীড়াশীল, লীলাময়, ছাতিমান। এ অর্থের জন্তেও দ্যৌকে ছাড়বার দরকার নেই। এই অর্থের সঙ্গে যোগ আছে সংস্কৃত ‘দ্বিব্’ ধাতুর। সে ধাতুও এসেছে \*deyew থেকে প্রথম e লোপের ফলে। বস্তুত, ‘দেব’ অভিধাটির শেষ অর্থ নিয়েই ইরানীয় ও ভারতীয় দুটি আৰ্য উপদলের বিবাদ সবচেয়ে ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল বল ভাঙার সময়ে ও তার পরে। ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশে ‘অহুর’ শব্দটির মানে প্রচণ্ড মেধা ও শক্তির অধিকারী, আমাদের অর্থে ঈশ্বর। এটি দু-একটি প্রধান দেবতাদের সম্পর্কেই ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাচীনতম দেবতাদের একজন—বরুণকে বলা হয়েছে ‘অহুয়ঃ পিতা নঃ’ (আমাদের অহুর ‘বাবা’)। (এ বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে ইন্দ্র, অগ্নি, পুশা, সবিতা ও সোম সম্পর্কেও)। ‘সম্রাজ’ (মানে সর্বাধ্যক্ষ) বিশেষণটি বিশেষ করে বরুণ—মিত্রের সহিত অথবা একাকী, ইন্দ্র ও অগ্নি এই তিন দেবতার নামের সঙ্গেই ব্যবহৃত হয়েছে। এই তিন দেবতা হল ঐতিহাসিক, দৃষ্টিতে ঋগ্বেদের তিন প্রধানতম দেবতা। বরুণ প্রাচীন সূর্যের, ইন্দ্র

অর্বাচীন স্তরের, আর অল্প সময়ময়িক স্তরের। বলতে গেলে ঋগ্বেদে অগ্নিই একমাত্র প্রত্যক দেবতা। তিনি তাবৎ দেবতার প্রতিনিধি। সব দেবতার হ্যা অগ্নিই বিলি করেন।

ঋগ্বেদে কয়েকটি দেবতাকে ‘আদিত্য’ (মানে অদিতির সন্তান) ছাপ দেওয়া হয়েছে। এঁরা হলেন প্রথমত ছজন,—মিত্র, বরুণ, অর্বমা, ভগ, দক্ষ ও অংশু পরে (১০-৭২-৭)। আরও একটি নাম পাওয়া যায়—মার্ত্যাত। তা ছাড়া ঋগ্বেদে দুর্ধকেও ‘আদিত্য’ অথবা ‘আদিতের’ বলা হয়েছে। দ্বাদশ আদিত্য—পৌরাণিক ভাবনা, চের পরবর্তীকালের।

মোট কথা হল, ঋগ্বেদের দেবতারা দ্যৌয়ের সন্তান। ছয় পুত্র কন্যা, নয় পৌত্র-পৌত্রী। তবে পুত্র কি পৌত্র, কন্যা কি পৌত্রী সে বিষয়ে ঋগ্বেদের মধ্যে প্রচণ্ড গোলমাল আছে। এমন ধরনের গোলমালের উদাহরণ আগে একটা দিয়েছি। এখন আর কিছু দিই।

প্রথমে ধরা বাক উধাকে। (ঋগ্বেদে উধা এক এবং অনেক। এ সংখ্যা নিয়ে সমস্তার কথা এখানে তুলছি না। এটা একরকম সমস্তাই নয়। কবি ভাবনা)। উধার সম্বন্ধে বারবার বলা হয়েছে, তিনি দ্যৌয়ের কন্যা। একবার বলা হয়েছে উধা দ্যৌয়ের প্রিয়া (১-৭৬-১)। কন্যা উধাকে দ্যৌ পত্নীরূপে খতিগমন করেছিলেন এই মর্মে একটি গল্প বৈদিক গল্পগ্রন্থে পাওয়া যায়। এটা এখন যতটা ঋগ্বেদে শোনাচ্ছে প্রাচীনতম মিথ্যে তা ছিল না। দ্যৌ আর অদিতি প্রথমে এক ছুপিঠ কল্পনার বস্তু ছিল। কল্পনার এক পিঠে দ্যৌ পুরুষ, অপর পিঠের কল্পনার দ্যৌ নারী। আদিম ধারণার হয়তো বা *houmaphrodite* বা ‘আধনর আধনারী’। উধার ব্যাপারে এ নারীপুরুষের ইঙ্গিত যে নেই তা নয়। এই প্রসঙ্গে উধার সঙ্গে অদিতির একীকরণও লক্ষ্যীয়। উধা অদিতির স্বরূপ (‘অদিতির্ অনীকম ১-১১০-১’)।

তারপর ধরি নাসত্য’ অর্থাৎ অস্বী ছজনকে। এ দেবতা দুটির দেখা গ্রীক-পুরাণ কাহিনীতেও পাওয়া যায়। সেখানে এঁরা “দি অল কোইর” দিবস্পূরকর বলে পরিচিত। নামটির মানে দ্যৌয়ের ছেলে। ঋগ্বেদে

১। অদিতি যে এঁদের কারো কারো মা তার স্মৃতি উল্লেখ আছে—একটি নুহে (৮, ৪৭, ১)।

তাদের কখনো বলা হয়েছে দ্যোয়ের পুত্র (“দিব আজাতা” ৪-৪৩-৩), কখনো বলা হয়েছে দ্যোয়ের নাতি (“দ বা নশাতা” ১-১৮৬-১)। কখনো বলা হয়েছে ঈদের একজনের পিতা স্তম্ব, আর একজনের পিতা দ্যো (“জিহ্বাম্ অস্তঃ স্তম্বস্ত ছুরির দিবো অস্তঃ স্তম্ব পুত্র উহে” :-১৮১-৪)। একবার বলা হয়েছে যে অশ্বীদের মা সিদ্ধ (“বা দস্তা সিদ্ধ মাতরা” :-৪৩-২)। আবার বলা হয়েছে যে তাদের মা হলেন উবা (:-১-১)। তাঁরা সিদ্ধর অথবা উবার বয়স পুত্র বলেও উল্লিখিত। ‘বয়ঃ চিদ অত্র বয়স্কর অমৃত (৩-১২-১)। আবার বলা হয়েছে যে তাঁদের জন্ম এক সঙ্গে ঘটেনি (“নানা জাতৌ” (৫-৭৩-৪)।

তার পরে মকদ্দগণ। মকদ্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক রকম উলটো পালটা কথা বলা হয়েছে। যেমন, (১) তাঁরা জন্মেছেন বিহ্বাতের চমক থেকে (“হক্সাং বিহ্বতস পরি অতো মাতা অবন্ত নঃ” ১-২০-১২)। (২) তাঁরা দ্যোয়ের সন্তান এবং অদিতিরও, “দিবস পুত্রাসঃ...আদিত্যাঃ” ১০-৭-২)। (৩) তাঁদের পিতা বৃকরণ রুদ্র আর মাতা গাই পুত্রি (২-৩৪-২)। মকদ্দের বিশেষণ ‘পুশ্বিনমাতরঃ’ (=ঋদের মা বাবাফটকা গাই) অনেকবার দেখা যায় ঋগ্বেদে।

জন্ম সম্বন্ধে ঠারি মধ্যে একটু বেশি বর্ণনা আছে ইন্দ্রের। কিন্তু সেখানেও যে গোলমাল নেই তা নয়। গোলমাল উপেক্ষা করলে মোটামুটি ইন্দ্রজন্মের যে বিবরণ পাওয়া যায় ঋগ্বেদে তা অন্তদেবতার উৎপত্তির সঙ্গে মেলে না। ঋগ্বেদের প্রধান দেবতা ছিলেন ইন্দ্র। তার মানে এই যে ঋগ্বেদের অধিকাংশ সৃষ্টির রচনা বিশেষভাবে ইন্দ্র-উপাসকের। এই বিশিষ্ট ইন্দ্র উপাসকেরা জনতেন যে তাঁদের ইষ্ট দেবতা প্রাচীন নঃ, তবে তিনি অন্ত সব দেবতার চেয়ে বেশি পরাক্রান্ত। ইন্দ্রের জন্ম সম্বন্ধেও তাদের মধ্যে উপাখ্যান প্রচলিত ছিল। তার প্রমাণ একটি ইন্দ্র-সৃষ্টির (১-১১) প্রথম শ্লোকটি।

যো মাত এব প্রথমো মনস্বান্

দেবো দেবান্ কৃতুনা পৰ্ব্বকৃৎ।

(“মনস্বী দেবতা যিনি জন্মলাভ করেই শক্তিতে সমস্ত দেবতাদের পরিভব, অর্থাৎ অতিক্রম করেছিলেন।”)

সৃষ্টি পরিপূর্ণ ইন্দ্র-প্রশান্তি। এতে ইন্দ্রের মহৎকর্মের বিবরণ আছে। অন্ত দেবতাদের অনেক মহৎকর্মও ইন্দ্রের উপর আরোপিত হয়েছে। ইন্দ্রকে সব প্রাচীন দেবতার এমন কি দ্যোয়ের চেয়েও প্রাচীন বলে ইঙ্গিত করা

হয়েছে। হুজুটি ইজের পক্ষে যেন প্রমাণাশা, বারা ইজকে খুব মানে না তাদের মানাবার ক্ষেত্রে রচিত। তাই এই হুজুর প্রত্যেক ক্ষেত্রে খুঁজা হল “স মনাম ইজঃ” (‘ওহে লোক সব, তিনিই হলেন ইজ’)।

অগ্বেবে ইজের জন্ম সম্বন্ধে যে সব বিকল্প কথা ছড়িয়ে আছে তা একজ খরলে এইরকম দাঁড়ায়।

- ১। ইজের মা গাই, সে তার বাছুর, তার বাবা বাঁড় (১০, ১১১, ২)।
- ২। ইজের মা ‘নিষ্টিগ্রি’ (১০, ১০১, ১২)। কথাটির মানে জানা নেই।
- ৩। ইজের মা ‘শবলী’ (অর্থাৎ বলিষ্ঠ : ৮, ৪৫, ৭)।
- ৪। মায়ের পার্শ্বদেশ থেকে ইজ নির্গত হয়েছিলেন (৪, ১৮, ১)।
- ৫। (শরীর থেকে) জোর করে ঝেড়ে ফেলা ইজকে মাতা ঘৃণা মনে করে লুকিয়ে রাখলেন। তখন ইজ জন্ম নিয়েই নিজে নিজে সাজপোশাক পরে দাঁড়িয়ে উঠে অন্তরীক পর্বন্ত ‘ভরিয়ে দিলেন।

(“অবদাম ইব মনামানা গুহাকর ইজঃ মাতা বীর্ধেগান্ন ইম।

অধোদহাং স্বায়মংকং বলান আ রোমসী অশপাজ্জায়মানঃ ॥”)

(৪, ১৮, ৫)।

৬। ইজ বাপকে পা ধরে আছড়ে মেরে ফেলে দিয়ে মাকে বিধবা করেছিলেন। (“কস্ তে মাতরং বিধবাম অচক্রুঃ স্বং প্রাক্শিণাঃ পিতরং পাদগৃহ্য ॥” ৪, ১৮, ১২)।

৭। ইজের পিতা বজ্র নির্মাণকারী ঝট্টা (২, ১৭, ৬)। জন্ম নিয়েই ইজ মায়ের জন্যে কঁদেছিলেন (৩, ৪৮, ১)। তার পর ঝট্টাকে হত্যা করে তার সোম হাঁড়ি হাঁড়ি পান করেছিলেন (৩, ৪৮, ৪)।

অগ্বেবে একবার ইজকে ‘কৌশিক’ বলে সম্বোধন করা হয়েছে (“ইজ কৌশিক” ১, ১০, ১১)। ইজের এই অভিধা সংস্কৃতেও আছে। কৌশিক মানে বা কোশ থেকে নির্গত। শব্দটির এক প্রসিদ্ধ অর্থ হচ্ছে পেঁচা। পেঁচা দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকে, রাত হলে চরতে বেরোয়। তখন যেন অন্ধকার কোশ থেকে নির্গত হয়। ইজের বেলায় ‘কৌশিক’ শব্দের অর্থ ধরেছেন প্রাচীন নবীন সব ব্যাখ্যাকার ও অল্পবাকেরা—“কৌশিক বংশের ইষ্টদেবতা, কৌশিকদের পূজ্য।” প্রস্তুত প্রবন্ধ লেখকের বিবেচনায় ইজের বেলায়ও “কৌশনির্গত” এই অর্থ পরিপূর্ণভাবে খাটে।

অগ্বেবে এই প্রয়োগ যে আমার অস্বপিত অর্থে অসঙ্গত নয় তার



প্রমাণ রয়েছে হরিবংশ ও মার্কণ্ডেয়-পুরাণে। বশোনার কতাকে দেবদীর পূজা ভেবে কংস বধন তাকে শিলাপাটে আছড়ে মারতে গিয়েছিল তখন ককতাসিনী দেবী সেই শিঙদেহকোশ থেকে বেরিয়ে পড়ে পাখি হয়ে স্বর্ণপুরীতে যায় এবং দেবী হয়ে ইন্দ্রের তসিনী হয়ে তাঁর পূজ্য হন। তাঁর নাম হয় 'কৌশিকী'। মার্কণ্ডেয়-পুরাণে দেবতারার বধন হিমালয়ে গঙ্গার ধারে দেবীর আবির্ভাবের জন্তে প্রার্থনা করেছিলেন তখন হৈমবতীর দেহ থেকেও দেবী চণ্ডী বেরিয়ে পড়েন দুর্গা হয়ে। এইভাবে কালীও উৎপন্ন হয়েছিলেন চণ্ডীর দেহ থেকে। (পরে বিস্তৃতভাবে বলছি।)

\* \* \*

ঋগ্বেদে ঋগ্বেদে এক জায়গায় আছে যে তিনি পৃথিবীর বাসিন্দা বলে পৃথিবীতে যাদের জন্ম তাদের বিষয়ে আর সর্বাধ্যক্ষ বলে ("সাম্রাজ্য-জ্ঞান") আকাশে যাদের জন্ম তাদের বিষয়ে যানেন।

স হি করণে কস্ম্যন্ত জন্মনঃ

সাম্রাজ্যোন্মিবাশ্রু চেততি।

৭, ৪৬, ২॥

ঋগ্বেদে আর কোন বড়ো দেবতাকে পৃথিবীবাসী বলা হয়নি।

\* \* \*

ঋগ্বেদে সংকলিত সৃষ্টির মধ্যে অত্যন্ত অর্বাচীন একটি সৃষ্টি (১০, ১০) ইন্দ্র অগ্নি ও বায়ুর উৎপত্তি সম্বন্ধে বেশ নতুন কথা আছে। বৈদিক ভাবনার শেষের যুগে প্রধান দেবতা বলতে এই তিনজনই দাঁড়িয়ে ছিলেন। এঁদের তিনজনের মধ্যে প্রধান ছিলেন ইন্দ্র। (তলবকার-উপনিষদে ইন্দ্র-বক-হৈমবতী সংবাদ এখানে স্মর্তব্য।) এই অর্বাচীন সৃষ্টিতে বজ্রপুরুষের অঙ্গ থেকে বিশ্বসৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। বজ্র পুরুষকে বলি দেওয়া হলে পরে তাঁর মুখ থেকে জন্মেছিলেন ইন্দ্র ও অগ্নি আর তাঁর প্রাণ অর্বাচীন বাস থেকে বেরিয়েছিলেন বায়ু।

মুখাদ্ ইন্দ্রশ্চ অগ্নিশ্চ প্রাণাদ্

বায়ুর অব্যয়ত। ১৩৭।

ঠিক এইভাবে সিদ্ধ পুরুষদের উৎপত্তি বলা হয়েছে চের চের পরবর্তী কালে—বাংলার সপ্তদশ শতাব্দীতে—সিদ্ধযোগেশ্বরের পুরাণ কাহিনীতে আহিষেবের সৃষ্টদেহ থেকে। এই কাহিনী অম্বারো সৃষ্টির প্রথম আবেশ

হয়েছিল কারণার্থে ব্রহ্মাভিষে (ব্রহ্মাণ্ডের) উৎপত্তিতে। সেই ভিন্ন ভেদে বেরলেন আদিত্যের ধর্ম। তিনি তাঁর বাম অঙ্গের থেকে সৃষ্টি করলেন কেতকাকে। (এখানে সৌম্যিক ধর্মের প্রভাব পড়া অসম্ভব নয়।) ধর্মের বীর্ষ পান করে কেতকা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিন দেবতাকে প্রসব করেছিলেন নিজের তিন অঙ্গ থেকে। তার আগেই ধর্মের মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর শবদেহের বিভিন্ন অংশ থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন চারজন আদি সিদ্ধা—মৎসে স্রমাধ, গৌরবনাথ, হাড়িপা (জালছরিনাথ) ও চৌরজিপা (কাছপা)।

\* \* \*

পুরাণে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে বৈদিক সৃষ্টিতত্ত্বের বিশেষ কোনই মিল নেই। পুরাণের মতে ব্রহ্মাণ্ড থেকে বিশ্বের উৎপত্তি। ডিগ্বের জল কারণার্থে ভেসে থাকে। ডিগ্বকুসুম বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি। তিনি প্রজাপতিরূপে প্রত্যক্ষ অথবা কল্পণের দ্বারা পরোক্ষভাবে দেব অঙ্গুর মুনি নর পশু পক্ষী ইত্যাদি সব জীব সৃষ্টি করেছেন। পৌরাণিক সৃষ্টি-তত্ত্ব আমাদের আলোচ্য নয়।

\* \* \*

জোড়াতাড়ি দিয়েই হোক কিংবা ছাঁচ থেকে বার করার মতোই হোক, মূর্তিগড়ার ধরনে দেবতা-নির্মাণ ব্যাপার অর্বাচীন বৈদিক কালে শুরু হয়েছিল বলে আপাতত মনে হচ্ছে। প্রজাপতি তাঁর কল্পার প্রতি কামডাব প্রদর্শনের গল্প বৈদিক গল্প গ্রন্থগুলিতে আছে। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে যেটি সবচেয়ে প্রাচীন সেই ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে (৩, ৩০) গল্পটি যেভাবে আছে তাতে গড়া দেবতার প্রথম উল্লেখ মিলছে। গল্পটি বিশেষ মূল্যবান। তাই মূল অঙ্গসারে বখাবথ অঙ্গুবার দিলুম

প্রজাপতি নিজের ছুহিতাকে পত্নীরূপে কামনা করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন সে ছুহিতা ঠোঁ, আবার কেউ কেউ বলেন উবা। ছুহিতা বখন রোহিতমুগীকরণ ধারণ করেছিলেন তখন প্রজাপতি ঋতু-মৃগ হয়ে কতাকে অভিগমন করেছিলেন। সে কাজ দেবতার দৈবদেহে পেলেন। তাঁরা ভাবলেন প্রজাপতি তো অত্যন্ত গর্হিত কাজ করছেন। তাঁরা ঝুঁকতে লাগলেন এমন একজনকে যিনি প্রজাপতিকে শাস্তি দিতে পারেন। নিজেদের মধ্যে এমন একজনকেও খুঁজে পেলেন না তাঁরা। তখন নিজেদের মধ্যে দ্বারা

আকারে ভীষণ ছিলেন তাঁদের একত্র সমাবেশ করলেন দেবতারা। তাঁরা সমাবেশিত হয়ে এক নতুন দেবতা হল ভূতবান্। তাঁকে দেবতারা বললেন “ওই প্রজাপতি অহুচিত কাজ করেছে। তাকে বিদ্ধ কর।” তিনি বললেন, “বেশ। তাহলে আমাকে বর দিতে হবে তোমাদের।” তাঁরা বললেন “বল কী বর চাও।” তিনি বর চেয়ে নিলেন পশুদের উপর আধিপত্য। সেই থেকে এঁর এক নাম হল—পশুমান। তিনি এগিয়ে গিয়ে প্রজ-পতিকে শরবিদ্ধ করলেন। বিদ্ধ হয়ে প্রজাপতি লাকিয়ে উঠলেন। সেই থেকে তাঁর এক নাম হল যুগ। আর সেই যুগের যে ব্যাধ তিনি সেই ভূতবান্ বা পশুমান। আর সেই যে রোহিত-যুগী সে হল লাল গাই।

এই গল্পটি নিয়ে বেশ কিছু ভাববার আছে। “সমাবেশিত” দেবতাটি যে বৈদিক ঋত্ব (—মানে নিষ্ঠুর দেবতা) ও পৌরাণিক শিব (—মানে, মঙ্গলময় দেবতা) যুক্তরূপে দেখা দিয়েছেন তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। ঋগ্বেদে ঋত্বকে পশুদের পতি বলা হয়েছে হুতরাং “পশুমান” নামটির হিন্দু পাওয়া গেল। মহাভারতে ও পুরাণ কাহিনীতে শিবের ক্রিয়াত বেষের ও ব্যাধবৃত্তির উল্লেখ আছে। অতএব যুগব্যাধেরও সঙ্গতি মিলল। এখন “ভূতমান্” নামটির কথা। পুরাণে ও সংস্কৃত সাহিত্যে ঋত্ব-শিবের এক নাম “ভব”। মানে যিনি আগে ছিলেন না এখন হয়েছেন। (এই অর্থে শতপথ-ব্রাহ্মণে অগ্নির এক নাম “ভব”)। আর একটি নাম “সর্ব”ও এই সূত্রে গাঁথা পড়ে। মানে, যিনি সর্বদেবতার সমাবেশ। শিবের আর একটি নাম “শর্ব”। এ নামটি দেবতার ব্যাধ বৃত্তির ইঙ্গিত বহন করে। শব্দটির মানে শরক্ষেপকারী। ভব, সর্ব ও শর্ব শিবের এই তিনটি নামে ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের গল্পের সমর্থন রয়েছে।

[এইখানে বলে রাখি এই প্রবন্ধে অপর যে কয়টি নির্মিত অথবা শরীর নির্গত দেবতার উল্লেখ করছি তারা সবাই শিবের সম্পর্কিত।]

\*

\*

\*

শিবের পুত্র কার্তিক (ভুদ্ধ নাম কার্তিকের, কৃত্তিকার সন্তান) পুরোপুরি না হলেও অংশত গড়া দেবতা। এঁর প্রাচীন নাম “কন্দ”। ঋত্বের নিকৃষ্ট বীর্ষ থেকে উৎপন্ন বলে। এঁর জন্মকথা কালিদাসের কুমারসম্ভবে ইঙ্গিত ব্যক্ত আছে, পুরাণকাহিনীতে স্পষ্ট করে বলা আছে।

এইসব থেকে অসুখান হয় যে এ দেবতাটি আগলে গঠিত বা নির্মিত। তারকাহরকে দমন করতে না পেরে দেবতার ব্রহ্মার শরণ নিয়েছিলেন। ব্রহ্মা তাঁদের বলেন যে শিবের পুত্র জন্মালে কেবল সেই তারকাহরকে দমন করতে পারবে। শিব ব্রহ্মচারী। সুতরাং আগে তাঁর বিবাহ ঘটানো আবশ্যক। সে বিবাহ ঘটানো হল পার্বতীর সঙ্গে। কিন্তু পার্বতী শিবের ঔরলে পুত্র জন্মাতে পারলেন না। শিববীর নিকৃষ্ট হল প্রথমে অগ্নিকুণ্ডে, তারপর লেখান থেকে জলে। জলধারা তা সহ্য করতে না পেরে উৎক্লিষ্ট করে দিলে তাঁরে শরবনে। লেখানে ছ-বোন কৃত্তিকা তাকে গড়েপিটে মাহুষ করলে। ছ-মায়ের স্তনপান রবার জন্ত তাঁর মুখ হল ছটি। এই হল কাত্তিকের জন্মকথা।

জলের মধ্যে নারীর মাহুষ করা শিশু দেবতার প্রসঙ্গ ঋগ্বেদে আছে, (২. ৩৫)। এঁর কোন বিশিষ্ট নাম পাওয়া যায়নি, উল্লেখ আছে “অপাং নপাং” অর্থাৎ নদীদেব বা জলস্রোতের নাতি (অথবা ছেলে) বলে। এঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে বৃষ নদীদেবের গর্ভাধান করেছিল। (“স ঙ্গং বৃষাজনয়ং তাসু গর্ভম্”)। বহু নারী মিলিত হয়ে একটি গর্ভ ধারণ করা অসম্ভব। এখানে তাই নির্ধারণ বুঝতে হবে। এই অপাং নপাং ‘স্বন্দের’ই প্রাচীনতর অভিধা।

\*

\*

\*

দেহকোষ থেকে নির্গত যশোদানন্দিনী দেবী চণ্ডীর উল্লেখ আগে করেছি। কোশবিধি নির্গত বলেই যে তাঁর নাম কৌশিকী তাও বলেছি। পুরাণে বহুজ্ঞও তাঁর কৌশিকীত্বের প্রমাণ আছে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীর তিনটি মাহাত্ম্যকাহিনী বর্ণিত আছে। তার মধ্যে প্রথমটিতে দেবী অব্যক্ত। তাতে কোন গল্পই নেই। গল্প আছে অপর দুটিতে।

দ্বিতীয় কাহিনী হল মহিষাসুরদমন। এই কাহিনী অনেকটা যেন ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের কাহিনীটির মতো। মহিষাসুরের প্রভাবে জর্জরিত হয়ে উপায়ান্তর না দেখে দেবতার নিজ নিজ দেহ থেকে শক্তি অংশ নিয়ে দেবীকে নির্মাণ করে নিজের নিজের বিশেষ অস্ত্রশস্ত্র তাঁকে সমর্পণ করলেন। তাই বোধ হয় দেবীকে বহুভুজ হতে হল। (মার্কণ্ডেয়-পুরাণে দেবী

দশভূজা। চৌকব্যবহারে শিল্পে পূজার পাণ্ডুরা বার—চতুর্ভূজা, অষ্টভূজা, দশভূজা ও অষ্টাদশভূজা প্রতিমা।)

এখন গল্পটা বলি। মহিষাসুর প্রবল হয়ে দেবতাদের স্বর্গলোক থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। দেবতারা তাই বাহুবলী হয়ে মর্ত্যলোকে বিচরণ করছেন। অগত্যা তাঁরা ব্রহ্মাকে নেতা করে গেলেন বিষ্ণু ও শিবের কাছে। (এখানে মনে করি প্রথমে বিষ্ণুরই উল্লেখ ছিল, শিবের নাম পরে যুক্ত হয়েছে। মার্কণ্ডেয়-পুরাণের তিনটি কাহিনীতেই দেবী বিশেষভাবে বিষ্ণুমায়ার বলেই উল্লিখিত।) দেবতাদের অহুযোগ শুনে বিষ্ণু (এবং শিব) ক্রুদ্ধ হলেন। বিষ্ণু (এবং শিবের ও ব্রহ্মার) মুখ থেকে মহৎ তেজ নির্গত হল। তারপর ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের শরীর থেকেও তেজ নির্গত হয়ে সব তেজ একত্র সমাবিষ্ট হয়ে দীড়াল এক বিরাট নারী।

অতুলং তত্র তৎ তেজঃ সর্বদেবশরীরজম্।

একস্থং তদ্ অভূন্ নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং স্থিবা।

সর্বদেবশরীরাত্মসমুত এই দেবী দেবতাদের অস্ত্রশস্ত্রমণ্ডিত হয়ে মহিষাসুরকে বিনষ্ট করে দেবতাদের স্বর্গরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই সিংহবাহিনী বহুভূজা দেবীই দেব ও নরলোকে প্রথম পূজা পেয়েছিলেন।

তারপর মার্কণ্ডেয়-পুরাণের তৃতীয় কাহিনী। শুভ আর নিশুভ দু'ভাই অসুর প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে দেবতাদের পরাজিত করে স্বর্গ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। দেবতারা অবশেষে দেবী মহিষমর্দিনীকে (দ্বিতীয় কাহিনীতে বর্ণিত) স্মরণ করলেন। তিনি দেবতাদের আগেই বর দিয়েছিলেন যে বিপাকে পড়ে তাঁকে স্মরণ করলে তিনি উদ্ধার করবেন। সেই বর স্মরণ করে দেবতারা হিমালয়ে গিয়ে দেবী বিষ্ণুমায়ার আরাধনা করলেন তাঁর স্তব গেয়ে (“দেবীং বিষ্ণুমায়াম্ প্রভুহুবুঃ”)। গজার ভীয়ে বলে দেবতারা বিষ্ণুমায়ার স্তব করছেন এমন সময়ে পার্বতী সেখানে স্নান করতে এলেন। দেবতাদের দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনারা কোন্ দেবীর স্তব করছেন?” এই কথা বলতে বলতেই তাঁর শরীরকোক থেকে মঙ্গলময়ী দেবী (“শিবা”) নির্গত হয়ে বললেন, “এ স্তব আমাকেই করা হচ্ছে (“স্তোত্রং মমৈতৎ ক্রিয়তে”)। মেয়েটি (“অধিকা”) পার্বতীর দেহকোশ থেকে বিনির্গত হয়েছিলেন বলে তার নাম কৌশিকী বলে প্রচারলাভ করেছিল।

শরীরকোশাহু ৭৭ তস্তাঃ পার্বত্যা নিঃসৃত্যধিকা ।

কৌশিকীতি সমন্তেষু ততো লোকেষু গীয়তে ॥

অধিকা নির্গত হয়ে গেলে পর পার্বতী কালো হয়ে গেলেন। তারপর তাঁর নাম হল কালিকা (কালী)।

তস্তাং বিনিঃসৃত্যতু কৃষ্ণাঙ্কং শাপি পার্বতী ।

কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচলকৃত্যশ্রয়া ।

(এক মূলদেবী পার্বতী থেকে দুই দেবী কালী ও গৌরীর সৃষ্টি হওয়ার এই ব্যাপারে প্রাচীন বৈদিক যিথে রাজি (নস্ত) ও উষায় কাহিনীর অনুসরণ আছে। রাজির অন্ধকার গর্ভ থেকে আবির্ভাবের প্রতিকল্প হচ্ছে এই পার্বতী-কালী থেকে অধিকা-গৌরীর আবির্ভাব।)

তারপর হৃন্দরী অধিকার কথা শুনে বিয়ে করবার জন্যে প্রলুব্ধ হয়ে শুভ তাঁকে আনতে পাঠালে চণ্ড ও মুণ্ড অসুর দুজনকে দূত করে। দেবী প্রত্যাখ্যান করে বললেন যে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে ব্যক্তি তাঁকে পরাক্রমে পরাজিত করতে পারবে তাকেই তিনি বিবাহ করবেন, আর কারো বশে তিনি যাবেন না। চণ্ড-মুণ্ডের দৌত্য নিফল হওয়ায় শুভ তার সেনাপতি ধুম্রলোচনকে পাঠালে অধিকাকে ধরে নিয়ে আসতে। তার সঙ্গে গেল বাট হাজার অসুর সেনা। তাদের দেখে দেবী হিমাচলের উপর থেকেই হেঁকে বলেছিলেন ফিরে যেতে। ধুম্রলোচন তা না শুনে এগিয়ে এসেছিল তাঁকে ধরতে। দেবী হুকার ছেড়ে ধুম্রলোচনকে ভাঙ করে দিলেন। আবার চণ্ড-মুণ্ড এল। তাদের দেখে দেবী ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁর মুখ কালো হয়ে গেল। আর তাঁর অকুটি-কুটিল-ললাট থেকে তখনি বেরিয়ে এলেন বিচিত্র অস্ত্র নিয়ে করালবদন কালী। তাঁর পরিধানে বাঘছাল, তাঁর শরীর কঙ্কালসার ভীষণ বদন, লকলক করছে জিব। চণ্ডমুণ্ডের মাথা কেটে নিয়ে কালী দেবীর কাছে গেলে পর দেবী খুশি হয়ে তাঁর নাম রাখলেন চামুণ্ডা। তারপর সমস্ত সৈন্যবাহিনী নিয়ে শুভ ও নিশ্চয় বুদ্ধ করতে এল। তখন দেবতাদের শরীর থেকে তাঁদের শক্তি নির্গত হয়ে তাঁরা দেবীর বাহিনী হয়ে যুদ্ধে যোগ দিলেন। দেবীর শরীর থেকে নির্গত হল অতিভীষণ চণ্ডিকা। তার কাছে শত শত শৃগাল চীৎকার করতে লাগল।

ততো দেবীশরীরায় তু বিনিক্রান্তাতিভীষণা ।

চণ্ডিকা শক্তিব্য অত্যাশ্রা শিবশতনিদ্রাদিনি ।

(অধিকার ললাট থেকে কালিকার উদ্ভব গ্রীক পুরাণের এথেনীর (Pallas

Athene' উপেক্ষিতই অহরূপ। আধেনীও বেরিয়েছিল কেউনের কপাল থেকে। শৃঙ্গল-পরিবৃত চণ্ডিকার তুলনা চলে ধরিত্রী মাতার (Meter Kithon) বর্ণনায়। তিনিও নেকড়ে পরিবৃত। (হসিওনের হোমেরীর স্তব ত্রুটবা।)

শিবারা (মতান্তরে শিব দূত হয়ে শুভ-নিশ্চয়ের কাছে গিয়ে দেবীর কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বলেছিলেন। (এই হেতু দেবী চণ্ডিকার নামান্তর শিবাদূতী)। সে কথাই অহরু তাই ছুজন কান দিলে না। বুদ্ধ লাগল। অহরু দল হেরে পালাতে শুরু করলে। তখন এগিয়ে এল মহা অহরু রক্তবীজ। তার এক ফোঁটা রক্ত মাটিতে পড়লে তখন রক্তবীজ জন্মায় তারই মতো। তখন চণ্ডিকা চামুণ্ডাকে বললেন, তুমি হাঁ করে থাক। আমি রক্তবীজের মাথা কেটে ফেললেই তুমি তার সব রক্ত গিলে ফেলবে, এক ফোঁটাও মাটিতে পড়তে দেবে না। তাই করা হল। রক্তবীজ নিহত হল। তারপর শুভ নিশ্চয় ছুটাই যুদ্ধে নামল। একে একে ছুটাই-ই দেবীর হাতে মারা পড়ল। তখন সমস্ত উদ্ভূত দেবী যল দেবীর শরীরে নিলীন হলেন। একলা রইলেন অধিকা।

ততঃ সমস্তাসু তা দেবোঃ ব্রহ্মাণী প্রমুখালয়ম্।

তস্যা দেবাসু তনৌ জগ্মুর্, একৈবাসীং তদাধিকা ॥

\*

\*

\*

যে সব পুরাণে গণেশের (গণেশের) সঙ্গ আছে সেখানে তাঁকে নানাভাবে বলা হয়েছে—কোথাও শিবপার্বতী-পুত্র, কোথাও শব-পুত্র, কোথাও বা পার্বতী-পুত্র। শিব-পুরাণে আর কবিকল্প মুকুন্দের চণ্ডী মঙ্গলে গণেশের উৎপত্তি বলা হয়েছে পার্বতীর অঙ্গমল থেকে। গণেশের গজ যুগের কারণ দেখানো হয়েছে শনির দৃষ্টি। শনির দৃষ্টিতে গণেশের মাথা উড়ে গেলে পর উত্তর-শিরের করে শুয়ে থাকা হাতির মাথা কেটে এনে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কোন কোন পুরাণের মতে শিব ক্রুদ্ধ হয়ে গণেশের শিরশ্ছেদ করেছিলেন অথবা শিবের শাপে গণেশের হস্তিমুণ্ড হয়ে গিয়েছিল।

মুকুন্দের বিবরণ সংক্ষেপে দিই। পার্বতীর সখী জয়া ও বিজয়া এক দিন দেবীর অঙ্গ সংস্কার করে প্রচুর ময়লা তুলে ছিল। সেই ময়লা-মাটি দিয়ে দেবী খেলার পুতুল তৈরি করেছিলেন। মাথা গড়বার আগেই ময়লা-মাটি

ফুরিয়ে যায়। শিবের আদেশে নন্দী এক হাতির—উত্তর শিরর করে শোওয়া—মাথা কেটে এনে বলিয়ে দেয়। তখন শিব তাতে জীবন্তান করে পার্বতীকে দিয়ে বলেন, এই নাও তোমার ছেলে।

\* \* \*

তারপর মনসা। শিবের কন্যা। ইনিও—বাংলা পুরাণকথা মতে—কৃত্রিম দেবতা। একদা শিব যখন কালিদহে পদ্মফুল তুলছিলেন তখন পরিবেশের বোগাযোগে—সংস্কৃত পুরাণকাহিনী হলে এখানে কামদেবের শিকারের উল্লেখ হত—তার মনে কামভাব জাগে আর তাঁর বীৰ্য্যখলন হয়। সে বীৰ্য্য রাখেন তিনি পদ্মপত্রে। এক ছোড়া কাক তা লক্ষ্য করেছিল। সেখান থেকে শিব সরে গেলে পর মাদী কাক তা তুলে নেয় কিন্তু গলাধঃকরণ করতে না পেরে তা উগরে ফেলে দেয় পদ্মপলাশে। তারপর পদ্মের স্ফূর্ণাল বেয়ে সেই শিববীৰ্য্য নেমে যায় পাতাল গর্ভে। পরে দেবকাক বাহুকির—মতান্তরে বাহুকির মায়ের মাথার উপরে। তা নিয়ে বাহুকি—মতান্তরে তার মা—একটি পুতুল গড়ে। তার জীবন্যাস হয়। সেই পুতুল হলেন বাহুকির ভগিনী, শিবের কন্যা মনসাকুমারী। তারপরের কাহিনীতে আমাদের কাজ নেই।

মনসার এই উৎপত্তি কাক্তিকের মতোই। ছুইয়েরই উপাদান শিববীৰ্য্য। একজন হল পুরুষ আর একজন হল মেয়ে। ছুদেবতাই মেয়ের হাতে গড়া জলের মধ্যে। এই কল্পনার মধ্যে কি শারীরতত্ত্বের রূপক লুকিয়ে আছে? কে জানে।

[প্রবন্ধের শিরোনাম ঋগ্বেদের একটি বাক্যাংশ। মানে দেবতাদের জাত। ইংরেজীতে বললে Race of Gods অর্থাৎ দেবতারা একটি বিশেষ গোষ্ঠীরূপে বাক্যাংশের প্রথম পদ “দেবাঞ্ছা” সন্ধির ফলে। মূল রূপ “দেবাম্”—দেব শব্দের বর্জ্য বহুবচন, “দেবানাম্”—এর খুব পুরোনো রূপ, ইন্দো-ইউরোপীয় \*deiwom থেকে।]



## ইন্দ্রের উদয়াস্ত

॥ ১ ॥

ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রধান বীজভূমি হল ঋগ্বেদ সাহিত্য। এই গ্রন্থের স্তব ও বন্দিত দেবতাদের মধ্যে সব চেয়ে প্রধান হচ্ছেন ইন্দ্র। যদিও ইনি দেবতাদের সঙ্গে প্রাচীনতম নন তবুও ইনিই সর্বোপরি। অথচ বৈদিক সাহিত্যের পরবর্তী স্তর থেকে দেখছি যে ইন্দ্রের মাহাত্ম্য ক্রমেই ধ্বংস হয়ে আসছে। শেষে, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীন পর্যায়ের অবসানে বার তলানির অবশেষ চিহ্ন এখনও আমাদের সংস্কৃতির বর্তমান পর্যায় থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি, দেখি যে সাধারণ পূজা-অহুষ্ঠানে পূজিত-উপাসিত নানা গ্রেডের দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রের স্থান নেই। তবে কোথাও যে নেই তা বলা যায় না। আছে দু-একটি ঘরাও ও মেরেলি অহুষ্ঠানের ব্রত রূপে। তবে সেখানেও এক হিসাবে ইন্দ্রকে অল্পপস্থিত ধরতে পারি। অর্থাৎ সেখানে ইন্দ্র থাকলেও তাঁর নামটি চাপা পড়ে গেছে। ইন্দ্রের উত্থান থেকে আরম্ভ করে পতন পর্যন্ত আমাদের সংস্কৃতির তিন হাজার বছরের বিরাট পর্দায় এই ব্যাপারটা আমার কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছে।

ঋগ্বেদ একটি সংকলন গ্রন্থ। এতে একাধিক স্তবের একাধিক কালের এবং একাধিক গোষ্ঠীর রচনা একসূত্রে গাঁথা পড়েছে। পণ্ডিতেরা বিচার-বিবেচনা করে ঋগ্বেদে সংকলিত দেবতা-স্তোত্র কবিতাগুলির বিশ্লেষণ করে বধাসম্ভব স্তর, কাল ও গোষ্ঠী ভাগ নির্দেশ করেছেন। এই নির্দেশ অহুসারে ঋগ্বেদের প্রাচীনতম স্তবের স্তোত্র-কবিতাগুলিতে ইন্দ্রকে দেবতাদের মধ্যে সর্বশ্রেণে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন করবার প্রবল চেষ্টা আছে। এই চেষ্টা থেকে স্বভাবতই মনে হয় যেন এক নবাগত দেবতা ইন্দ্রকে দেবতাদের রাজাধিরাজ করে প্রচার করতে চাইছেন কতকগুলি কবি। অন্যান্য সূত্র থেকে আমরা জানি যে ঋগ্বেদের কবিরের পূর্বপুরুষ (অথবা কোন কোন কবি) যখন ইরানে ছিলেন—অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে অথবা তারও আগে—তখন তাঁদের সম্ভ্রমারের—অর্থাৎ ইন্দো-ইরানীয় শুদ্ধের-মধ্যে দেব-উপাসনা নিয়ে দুটি বড় দল গড়ে উঠেছিল। একদল ছিলেন নিষ্ঠাবান অগ্নিষ্টোমী, আর একদল

ছিলেন অল্পবয়স্ক নোমবাজী। নোমবাজী দলই ইজ্জকে নিয়ে মাতাযাতি করেছিলেন এবং সাময়িক ভাবে প্রবল হয়ে তাঁরা ইজ্জকে অঘিটৌমীর দল থেকে কেড়ে আনতে পেরেছিলেন। নোমবাজীরা তাঁদের নবজাত নূতন দেবতার যে বড়াই করেছেন স্বগ্বেদে তার অন্ত নেই।

“এক মাজেই যে মনসী দেব প্রথমেই সব দেবতাদের হারিয়ে দিয়েছিলেন বুচ্ছিবীরে (“ক্রতুনা”), যে ক্রিপ্রবীরের মহিমায় (“নৃমণ্ডা মহা”) ধনিসে (“ওম্মাৎ”) স্বর্গমর্ত্য কেঁপে উঠেছিল,—ওহে লোকজন, তিনি ইজ্জ।” (২-১১-১)

বীর বোঝা নেতা ইজ্জ কত সুবিধা করে দিয়েছেন। “যিনি বিশ্বের সব কিছুকে নাড়া দিয়েছেন যিনি দাপ জাতিকে নীচে গুহার পাঠিয়ে দিয়েছেন, যিনি জিনিয়ে জুরাড়ির মতো শত্রুপক্ষের ধনসম্পত্তি হরণ করে নেন,—ওহে লোকজন, তিনি ইজ্জ।” ( - ২-৪)

অবিশ্বাসীদের প্রতি উক্তি,

“যাঁর সম্বন্ধে নাকি লোকে প্রশ্ন করে, কই সে প্রচণ্ড (দেবতা)? কেউ কেউ আবার এর সম্বন্ধে বলে, “ও নেই।” তিনি কিন্তু শত্রুপক্ষের ধনসম্পত্তি জুরার দানের মতো হরণ করে নেন,—ওহে লোকজন, তিনি ইজ্জ।” (২-১২-৫)

আর দেখ—শত্রু মিত্র দু পক্ষই যুদ্ধ জয়ের জন্যে তাঁকে ডাকে, তাঁর মোহাই দেয়।

“যাঁকে যুদ্ধকালে দুদলই চীৎকার করে হুঁভাবে ডাকে,—বিপক্ষ ও পক্ষ, দুই শত্রু পক্ষই। একই রথে চড়ে তাঁকে ডাকে ভিন্ন উদ্দেশ্যে।—হে লোকজন, তিনি ইজ্জ।” (২-১ -৮)

এখনকার দিনের কোন বাম্পী পলিটিকাল নেতা ইলেকশনে এমন বক্তৃতা দিলেও এই কবিতাটি মন্দ সম্ভিত না।

প্রাচীন পূজা দেবতাদের উপর ইজ্জকে চাপিয়ে দিলে পর নিশ্চয়ই পূজক সমাজে কিছু না কিছু বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া অবশ্যই ঘটেছিল। তার কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত স্বগ্বেদের মধ্যে আছে, পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে তো আছেই।

জোরজার করে ইন্দ্রকে দেবতাদের পাটে ঊঠানো হল। এ ব্যাপার সম্বন্ধে ঘটে ছিল ভারতবর্ষে আসবার অনতিকাল পূর্বে। এদেশে এসে কিছু ইন্দ্রের মাহাত্ম্য একটু একটু করে খর্ব হতে থাকে। এটা আমার অস্বাভাবিক মনে হয়। পূর্বে অস্বাভাবিক প্রচণ্ড প্রমাণ মিলছে পরবর্তী সাহিত্যে। বৈদিক গল্প-গ্রন্থগুলিতে দেখি যে ইন্দ্র আর সব দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ থাকলেও আর তাদের জ্যেষ্ঠ অর্থ্যাৎ মুখ্য নন। তাঁর স্থান নিজেই মুখ্য হিসাবে প্রজাপতি, সর্ব শ্রেষ্ঠ হিসাবে বিষ্ণু। (উপনিষদে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে দেব, মানব ও অসুর এই তিন মুখ্য প্রজাপতির সমস্তান। এই তিন সমস্তানকেই পড়াতেন তিনি নিজে পাঠশালা করে। এঁদের মধ্যে বুদ্ধি বিদ্যায় দেবতারাই ছিলেন সব চেয়ে ভালো। তাঁরা পড়া শেষ করে এক চান্দ্রে পরীক্ষা পাশ করে যান। মানবেরা পাশ করলে দ্বিতীয় চান্দ্রে, অসুরেরা লাঠ চান্দ্রে।)

ইন্দ্র হট্টে স্বক করলেন বিষ্ণুর কাছে। বিষ্ণুও ইন্দ্রের মতো গৃহস্থালির দেবতা, তবে তার বাইরের মাহাত্ম্যও স্বীকৃত ছিল। ঘরের ছেলে যে গার্হপত্য অগ্নি, বিষ্ণু তাঁরই প্রতীক এবং এই সূত্রে যজ্ঞেরও প্রতীক। বাইরে তিনি ত্রিবিক্রম — তিন পা ফেলে তিনি বিশ্বজগৎ মেনে ফেলেছেন। তুরীয় লোকে তাঁর ধাম। লেখানে মধুর উৎস, গোক্ষীরের সরোবর। ইন্দ্র যখন পাটে বসেছেন তখনও বিষ্ণুর সঙ্গে তাঁর কোন বিরোধ তো ছিলোই না, উপরন্তু ঘনিষ্ঠ সহযোগ ছিল। তিনি ছোট ভাইয়ের মতো ইন্দ্রের সব বড় বড় কাজে সহায়তা করেছেন। (এই কারণে “তাঁর উপেন্দ্র” অর্থ্যাৎ ছোট-ইন্দ্র নামটি চালু হয়ে গিয়েছিল পৌরাণিক সাহিত্যে।)

ইন্দ্রের মাহাত্ম্য কমতে স্বক হল অসুরদের সঙ্গে সংঘর্ষে এসে। (অন্তত, ব্রাহ্মণগুলির গল্প থেকে আমরা সেই কথাই বুঝি। অসুররা বড় ভাই, তাঁরা বিজয়চক্র কৰ্মী। দেবতারা যেন বৈমাত্র ভাই,—হাসি খুসি, গানবাজনা নিকরী খেলাধুলা নিয়ে মেতে থাকে। সংসারের কাজে দেবতাদের কাছ থেকে কোন রকম সাহায্য না পেয়ে অসুরেরা বিরক্ত হয়ে দেবতাদের শৈতক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে উদ্ভোগ করলে। এ বিশেষ থেকে বাঁচালে শিবরূপী বিষ্ণুই—বিনি আসলে বজ্র স্বরূপ। দেবতাদের অসুরদের তুলে গিয়ে অসুরেরা তাঁদের শুধু বিষ্ণু মাশে একটুয়ো ভয় ছেড়ে দিতে স্বীকৃত হল। সেখানে দেবতারা বজ্র করবেন। (পরের অধিকৃত ভূমিতে স্বাধীন বজ্র হয় না।)

বিকু মাটিতে ভয়ে পড়েই তার দিকে বেড়ে চললেন। তখন অহরেরা কোণঠেসা হতে হতে পৃথিবীতে ঠাই না পেয়ে রাসাতলে চলে যেতে বাধ্য হয়। ব্রাহ্মণের এই গল্প হল ঋগ্বেদের জীবিকম ব্যাখ্যায় ও পুরাণের বলির পাতাল প্রবেশ গল্পের মাঝামাঝি রূপান্তর। এই গল্প থেকে যজ্ঞ-বিকুর সর্বাতিশারী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বুঝতে পারি।

দেবতারূপে প্রথম শ্রেণীর থেকে দ্বিতীয় ( তৃতীয় ? ) শ্রেণীতে ইন্দের অবনতি স্বীকৃত হয়ে গেছে ব্রহ্মবাদের দ্বারা অগ্রতম কনিষ্ঠ উপনিষৎ তলবকারে। অহরের সঙ্গে বিরোধে জয়ী হয়ে ইন্দ্র মনে করছেন এ জয়লাভ তাঁরই কৃতিত্ব। আসলে এ কৃতিত্ব ব্রহ্মের। এ সত্য ইন্দ্রকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন উমা হৈমবতী। এখানে অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে তিন শ্রেণী হয়ে গেছে। প্রথমে “ব্রহ্ম” ( বক্ষ ), দ্বিতীয়ে ব্রহ্মজ্ঞা উমা হৈমবতী, তৃতীয়ে ইন্দ্র দেবতাদের প্রধান।

॥ ৫ ॥

ঋগ্বেদে অন্ধরের দেবতা ইন্দের সম্বন্ধে মোটামুটি যে ধরনের গল্প প্রচলিত ছিল তার আভাস মিলেছে। এখানে বলে রাখি যে ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে ইন্দ্র একমাত্র দেবতা যার সম্বন্ধে একটা গোটাগুটি ধারণা করা যায়, এবং তার গোড়ার দিকে যতই myth-এর মিশ্রণ থাক—যেমন ইন্দের সঙ্গে জুপিটারের মিল—পরে আর কোন মিথের সঙ্গে গাঁথা পড়েনি। পুরাণে ইন্দ্র সম্বন্ধে যেটুকু নতুন কথা পাওয়া যায় তাতে আগেকার গল্প-স্বতোই টেনে পাকানো হয়েছে।

সুতরাং ইন্দ্র যে মানববীরের কল্পনার্শে সৃষ্টি তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর পিতা হলেন শ্রুতা, যজ্ঞের নির্মাতা।

ভূমিষ্ঠ হয়েই ইন্দ্র পিতাকে অভিজুত করে তাঁর পাত্রভর্তি সব লোম পান করে নিয়েছিলেন ( ৩. ৪৮. ৪ )। নবজাতক ইন্দ্র কয়েই বাপের পা ধরে আছাড় মেরে মাকে বিধবা করেছিলেন ( ৪. ১৮. ১২ )। পুত্রের এই জঘন্য কাণ্ড দেখে মা ভয়ে লুকিয়ে পড়েন। ইন্দ্র তাঁকে খুঁজে বার করেন ( “পরায়তীং যাতরম্ অবচঠ” ) ( ৪. ১২. ৩ )। তারপর লক্ষ্য ও ভয়ে ( ? ) পুত্রকে কিছুদিন লুকিয়ে রেখেছিলেন। ( “অবচম্ ইব যন্তমানা ওহাকং ইন্দ্রং যাতা” ) ( ৪. ১২. ৫ )।

ঋগ্বেদে ইন্দ্রের পত্নীর উল্লেখ অনেকবার আছে। তবে তাঁর নাম পাওয়া যায় দুটি—ইন্দ্রাণী ও শতী। ইন্দ্রাণী নামটি 'ইন্দ্র' নাম থেকে তৈরি। শতী নামটি ইন্দ্রের নামান্তর 'শত' ( অর্থাৎ শক্তিশালী পুরুষ ) থেকে উৎপন্ন। পরবর্তী কালে শতী নামটি ইন্দ্রপত্নীর ব্যক্তিগত নাম বলে গ্রহীত হয়েছে।

ঋগ্বেদের এক স্থানে ( ৪.১৮.৮ ) উল্লিখিত আছে যে ইন্দ্রের মা ( ? ) তাঁকে এক মুহূর্ত জলে কেলি দিয়েছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে কুষবা (রাকসী ? ) গ্রাস করে নিয়েছিল কিন্তু পরমুহূর্তেই ইন্দ্র জল থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। এ ঘটনা নবজাতককে লুকিয়ে রাখবার ব্যাপার হতে পারে, অন্য কাহিনীও হতে পারে।

অথর্ববেদে ( ৭. ৩৮. ২ ) একটি অভিনব কাহিনীর আভাস আছে। কোন এক অসুর নারীর আকর্ষণে ইন্দ্র দেবসভা ছেড়ে দিয়ে এসেছিলেন। ঋগ্বেদের জৈমিনীয় সংহিতায় ( ১. ৪৭. ২ ) এই গল্পই একটু বিস্তৃত ভাবে পাওয়া যায়। ইন্দ্রের অসুর ( বা দানব ) প্রেমিকার নাম বিলিটেজা। এর সঙ্গে মিলিত হবার কারণে ইন্দ্র কখনো মেয়ে কখনো বা পুরুষ রূপ ধরে অসুরদের সঙ্গে কিছু কাল বাস করেছিলেন। ( মনে হয় এই কাহিনীই মহাভারতের চিত্রাঙ্গদা-অর্জুন আখ্যানের বীজ। )

ইন্দ্র যে গোড়ায়, সম্পূর্ণ অথবা আংশিক ভাবে, মেয়েলি তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল সে বিষয়ের একটা বড় প্রমাণ এখন দাখিল করছি। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে বিবাহ-সূক্তের পরেই একটি দীর্ঘ সূক্ত আছে (৮৬)। সেটি পড়লে অবশ্যই মনে হবে যে এটি ইন্দ্র সম্পর্কিত কোন মেয়েলি কাহিনীর ছড়া। কাহিনীতে ইন্দ্রের মহিমা ব্যক্ত করার চেষ্টা আছে। সব স্লোকের শেষেই ভণিতা আছে এই পদটি—“বিধেয়াম্ ইন্দ্র উত্তর”! অর্থাৎ সবার চেয়ে ইন্দ্র উচু। সূক্তটির সম্পূর্ণ অর্থ পরিষ্কার বোঝা যায় না। তবে এতে মেয়েলি কোদলের টুকরো আছে, এবং তার মধ্যে স্থানে স্থানে অশ্লীলতার অভাব নেই। পাত্র তিন জন অর্থাৎ উক্তি আছে তিন জনের—ইন্দ্রের, ইন্দ্রাণীর ও বৃষাকপির। তবে আরও একজনের উপস্থিতি ছিল। তিনি বৃষাকপির পত্নী ( “বৃষাকপারী”, স্লোক ১৩ )। স্পষ্ট করে বলা না থাকলেও মনে হয় বৃষাকপি ইন্দ্রের পুত্র এবং প্রিয়, ইন্দ্রাণীর সপত্নীপুত্র ( এবং প্রেমভিলাষী ? )। বৃষাকপির পত্নীও ঋত্বকের প্রিয়, কেননা তিনি সম্পন্ন গৃহস্থবধূ, পুত্রবতী, ঋত্বকে ভালো করে রেঁধে বাঁড়ের মাংস খেতে দেন। ইন্দ্রাণীর কথার বোঝা যায় যে তিনি বৃষাকপারীকে অপছন্দ করেন না।

অত্যাচারী ঋগ্বেদাচার্য্য ও মেয়েলি। সম্পূর্ণ গল্পটি পেলে ভালো হত।

। ৬ ।

পুরাণের আঁওতার এসে ইজ্জ পাকাপাকি দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠ দেবতা হয়ে পড়েছেন। শুধু তাই নয়, প্রথম জ্যেষ্ঠ দেবতার মধ্যে বিষ্ণু ও শিবের সঙ্গে যে ত্রাকার নাম হয়, সেই ত্রাকার—অর্থাৎ অর্বাচীন বৈদিক ঐতিহ্যের প্রতাপতির—সঙ্গে তুলনা করলে তাঁকে তৃতীয় জ্যেষ্ঠ দেবতা বলতে হয়। তৃতীয় জ্যেষ্ঠ দেবতার মাছুষের মতো, তবে তাঁদের জরা নেই, যুত্থাও নেই। সবদা হুখভোগ তাঁদের একমাত্র কর্ম। তবে তাঁদের অদৃষ্টে হুখভোগও দৈবাৎ ঘটে। কোন কোন অস্থর ত্রাকার অথবা শিবের বর পেয়ে প্রবল হয়ে দেবতাদের স্বর্গরাজ্য থেকে হাটিয়ে দেয়, তখন তাঁদের হুখভোগ করতে হয়। পুরাণ-পাঠকের এমন গল্প অজানা নয়।

পুরাণের কোন কোন গল্পে ইজ্জের সঙ্গে বিষ্ণুর বিরোধ দেখা যায়। এখানে বিরোধ ঠিক বিষ্ণুর সঙ্গে নয়, কৃষ্ণের সঙ্গে। (পৌরাণিক সাহিত্যে বিষ্ণু ও কৃষ্ণ এক হয়ে গিয়েছেন।) বিষ্ণু ইজ্জের চিরকালের সখা। কিন্তু ঋগ্বেদে দেখি যে কৃষ্ণ ইজ্জের বিপক্ষ। ঋগ্বেদে বিষ্ণুর সঙ্গে কৃষ্ণের কোনই সম্পর্ক নেই। কৃষ্ণ এক মহাবীর দলপতি। ইজ্জের সঙ্গে তাঁর বিরোধ হয়েছিল। (বেশ কিছুকাল আগে চতুরঙ্গ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘বিষ্ণু-কৃষ্ণ কথা’ প্রবন্ধে আমি এ বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছিলুম। কোতুহলী পাঠক তা দেখতে পারেন।) বিষ্ণু-কৃষ্ণ এক হয়ে যাবার পর বিষ্ণু ক্রমশ কৃষ্ণ লীন হয়ে যান এবং অবশেষে বিষ্ণু কৃষ্ণের অধস্তন স্বরূপ বলে একটু নীচে নেমে যান। ঋগ্বেদের বিষ্ণুর উর্ধ্বতম ধাম গোলক কৃষ্ণ অধিকার করেন। বিষ্ণুর জন্ত অভিনব অধস্তন বৈকুণ্ঠধাম সৃষ্ট হয়। পুরাণে যখন কৃষ্ণ বিষ্ণুর উপরে উঠে- গেলেন তখন ইজ্জের সঙ্গে তাঁর বিরোধের স্মৃতিও - হয়ত ইজ্জপুত্রার সঙ্গে কৃষ্ণপুত্রার বিরোধ ভেগে উঠল। গোবর্ধন-ধারণে, পারিজাত-হরণে ইজ্জ-কৃষ্ণ বিরোধের পৌরাণিক প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়।

ইজ্জের প্রতিপত্তি যখন প্রবলতম, তখন ঋগ্বেদে দেখেছি তিনি উবার শকট ভেঙে ফেলেছেন, উবার উপর অত্যাচার করেছেন। পুরাণে পৌছে দেখি যে উবার তাত্ত্বিক প্রতিনিধি দেবী পার্বতীর কাছে সকল দেবতার সঙ্গে ইজ্জও এসে সাহায্যভিক্ষা করছেন মহিষাসুরের অত্যাচার থেকে পরিজ্ঞাপ পাবার জন্তে। দেবীর অহুগ্রহে পরিজ্ঞাপ পেলেনও। এ কাহিনী আছে মার্কণ্ডেয় পুরাণে।

হরিবংশ ও বিষ্ণু-পুরাণে আছে আর এক কাহিনী। দেবী উবা জন্ম নিয়েছেন দেবকীর আকুড় ঘরে কংস কারাগারে কৃষ্ণের ভগিনীরূপে। কংস দৈববাণীতে ভেদেছিল যে তার ভগিনী দেবকীর অষ্টম গর্ভে যে সন্তান জন্মাবে তার হাতে কংসের মৃত্যু ঘটবে। দেবীকে দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান মনে করে কংস শিশুকে শিলাপটে আছড়ে মারতে যায়। শিশুর আত্মা দেহ থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়ে চিল হয়ে আকাশে উড়ে পালায়। বিষ্ণু তাঁকে বলে দেন যে অর্গে গেলে ইন্দ্র তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে পূজা করবেন। ইন্দ্র তাই করেছিলেন। এই থেকে ইন্দ্রের অর্গরাজ্যে দেবীপূজার আরম্ভ।

। ৭ ।

পুরাণ কাহিনীতে ইন্দ্র যে শুধু দেবতাপ্রণীতে নীচে নেমে গিয়েছেন তা নয়, কখনো কখনো অসুরের মতো দুহৃতকারীও হয়েছেন।

জৈমিনীর ব্রাহ্মণে একটি গল্প আছে। গল্পটি ইন্দ্রের মাহাত্ম্যমুচক নিশ্চয়ই। একদা দীর্ঘজিহ্বী নামে এক অসুর রমণী ( বা রাক্ষসী ) খুব যজ্ঞবিদ্য ঘটচ্ছিল। দেবতাদের যজ্ঞভাগ সব সে খেয়ে নিত। তাকে কিছুতেই জয় করা যাচ্ছিল না। দীর্ঘজিহ্বীর বিশেষত্ব ছিল এই যে তার অঙ্গে অঙ্গে গাঁটে গাঁটে ছিল বোনি। সুতরাং তাকে কোন পুরুষই কাবু করতে পারত না। অবশেষে ইন্দ্র নিজের অঙ্গে গাঁটে গাঁটে মুক সৃষ্টি করে দীর্ঘজিহ্বীকে কাবু করেছিলেন।

এই গল্পটি রূপান্তর লাভ করেছে পুরাণে রামায়ণে গোতম-অহল্যা-ইন্দ্র-রামের ‘আখ্যানে’। ইন্দ্র এখানে কামুক, দুহৃতকারী অসুরতুল্য। তিনি গুরুপত্নী অহল্যাকে হরণ করেছিলেন বলে গুরুর শাপে তাঁর অঙ্গে অঙ্গে গাঁটে গাঁটে বোনি চিহ্ন উৎপন্ন হয়। ( পরে এই চিহ্ন চক্ষুচিহ্নে পরিণত হয়ে ইন্দ্রের বিশিষ্ট লক্ষণে দাঁড়ায়। ) বৈদিক গল্পের ইন্দ্রে স্থান নিয়েছেন রাম। তিনি যেভাবে অহল্যাকে—বেদের গল্পের দীর্ঘজিহ্বীর প্রতিনিধি—তাতে অস্ত্র একটি মিথ্যের ছায়া পড়েছে।

একদা ইন্দ্র যে অসুরদের দলেও ছিলেন তার আভাস আমরা অথর্ববেদে ও কোন কোন ব্রাহ্মণ গ্রন্থে পেয়েছি এবং সে উল্লেখ আগে করেছি। এখন অবৈদিক পরবর্তী সাহিত্য থেকে সে বিষয়ে ছোটো-একটা খুচরো প্রমাণ দিই—ছটি শব্দে। একটি সাধারণ শব্দ—‘ইন্দ্রবান’ আর একটি ব্যক্তিনাম—

‘ইনা মেট্যা’ ইজ্জাল শব্দটি ঋগ্বেদে নেই, আছে অথর্ববেদে, একবার, মানে ‘ইজের পাশ (অস্ত্র)’। সংস্কৃত সাহিত্যে শব্দটির মানে দাঁড়িয়েছে— “বিভ্রম, magic”। এই মানেই এখন পর্যন্ত চলে এসেছে। এখানে ‘জাল’ শব্দটি ‘মায়ী’ শব্দের সমার্থক, তবে ঋগ্বেদে ব্যবহৃত অর্থে—(যেমন, “বরণন্ত মায়ী”) নয়, সংস্কৃতে ব্যবহৃত অর্থে (যেমন ‘আহরী মায়ী’)। ইজ্জাল শব্দের এই অর্থ-বিকারের মধ্যে ইজের অধোগমনের যেমন প্রমাণ থাকতে পারে, সেই রকম “ইজ্জির জাল” শব্দের কিছু অর্থপ্রভাব থাকতে পারে।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে এক মায়াবী অর্থাৎ ঐজ্জালিক চোরের উল্লেখ আছে। তার নাম “ইনা মেট্যা” অর্থাৎ ইজ্জ ভূঁইয়া। সে রাজ্যে গৃহস্থের বাড়ীতে চুরি করতে যাবার আগে মন্ত্র পড়ে ও ভুক-তাক করে গৃহস্থকে ঘুম পাড়িয়ে দিত তারপর নিবিয়ে নিশ্চিন্তে চুরি করত। এই নামটিতে অস্ত্রভাবাপন্ন ইজের কিঞ্চিৎ প্রমাণ (clue) রয়ে গেছে বলে মনে করি।

॥ ৮ ॥

একের নম্বর দেবতার স্বরূপে না থেকে মহানীরূপে, দেবরাজরূপে ইজের কিঞ্চিৎ সমাদর এদেশে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার আগে পর্যন্ত টিকে ছিল। সে হল স্বাধীন রাজার রাজ্যাভিষেক অহুষ্ঠানে। তারই জের চলে এসেছিল সেদিন পর্যন্ত দেশের কোন কোন প্রত্যন্ত অঞ্চলে সামন্ত-ভূঁইয়াদের মধ্যে “ইজ্জধ্বজ (শক্রধ্বজ) উত্থান” পরবে। এরই স্মৃতি বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলে বাঁশবাড়িরূপে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে।

॥ ৯ ॥

অন্দরমহলে মেয়েলি অহুষ্ঠানের দেবতারূপে ইজের আসন সমানভাবে— অর্থাৎ স্থান-কাল বিবেচনা করে যথাসম্ভব—বজায় আছে। ঋগ্বেদের সূক্তে যে দেবতার যেমন অহুষ্ঠান অপালার প্রসঙ্গে দেখেছি ঠিক তেমনি অহুষ্ঠানের ইঙ্গিত দিয়েছেন পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে (খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী) একটি সূক্তের উদাহরণে। এক খুবড়ো আইবুড়ো মেয়ে ইজকে আরাধনা করে খুশি



করেছিল। ইন্দ্র তাকে একটি মাত্র বর নিতে রাজি হলে চালাক মেয়েটি একটি মাত্র বর চেয়ে তিনটি বরের কাঙ্ক্ষা আদায় করেছিল। মেয়েটি ইন্দ্রের কাছে এই বরটি চেয়েছিল—“আমার ছেলেরা যেন কীলার খালায় দুধভাত খায়।” একে লে গরীবের মেয়ে, তার উপর, তার বিয়েই হয়নি। একটি মাত্র বর চেয়ে লে ইন্দ্রকে ঠকিয়ে তিনটি বর আদায় করেছিল,—স্বামী লাভ, সম্ভান লাভ এবং লংলারে স্বাক্ষর লাভ। তখনকার দিনে বড়লোক না হলে কেউ কীলার বাগান ব্যবহার করতে পারত না।

অশালা ও বৃদ্ধ কুমারীর মতো এখনও প্রাচীনপন্থী ঘরের বাড়ালী অবিবাহিত মেয়েরা ইন্দ্র ব্রত করে পতিপুত্র লাভের লোভাগা চায়। ব্রতটির নাম একটু একটু বদলে গেছে, হয়েছে “ইতু”। এই নামটি নিয়ে পণ্ডিতেরা একটু গোলে পড়েছেন। “ইন্দ্র” নামের সঙ্গে পুরোপুরি মিল না পেয়ে তাঁরা এটিকে “ঋতু”-র (অর্থাৎ ফসলের কালের অথবা fertility cult-এর) বিকৃত রূপ বললেন। কিন্তু শব্দবিজ্ঞায় ঋতু শব্দের অর্থতৎসম রূপ ধরলে “ইতু”-কে নিতান্ত আধুনিক শব্দ বলে নিতে হয়। তাহলে ঐদের যুক্তি টেকে না।

শব্দবিজ্ঞার সাধাযা নিলে “ইতু” শব্দটির এমন একটি ব্যুৎপত্তি ধরা যায় যা ইন্দ্রপূজা নির্দেশ করে। ইন্দ্র উপাসনার বিশিষ্ট ঋগ্বেদীয় যুক্তগুলির একটি নাম ছিল ‘ইন্দ্রন্তত’ (অর্থাৎ ইন্দ্রন্তব)। অনুমান করি যে এই শব্দটির প্রাকৃতিক আনুমানিক “ইন্দ্রতু” হয়ে শেষে বাংলায় ‘ইতু’ রূপ পেয়েছে।

## তত্ত্বের আচ্ছ কথ্য

আমাদের দেশে ধর্মের ব্যাপারে ‘তত্ত্ব’ শব্দটির অর্থে একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। সেই তাৎপর্যের ইতিহাস লব্ধে আমার মনে যে ধারণা হয়েছে তাই এই প্রবন্ধটিতে পাঠক-সাধারণের কাছে নিবেদন করছি। বিশেষ তাৎপর্যটিতে পৌছবার আগে শব্দটির মৌলিক অর্থ অনুসরণ করা আবশ্যিক। ‘তন্’ ধাতুতে ‘ত্ৰ’ প্রত্যয় করে, পদটি নিম্ন হইয়াছে, ‘তত্ত্ব, বস্ত, বস্ত, পবিজ্ঞ, অবিজ্ঞ’ ইত্যাদি শব্দের মতো। এই ‘ত্ৰ’ প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি প্রায় সবই বাস্তব “উপায়” (অর্থাৎ instrument) অর্থে রূপ হইয়াছে। ‘মন্ত্র’ও তাই। যাতে করে মনে করা যায়, অরণ করা যায়,—আউড়ে যাবার উপায়। এইরকম মৌলিক অর্থে তাঁত বস্ত্র বোঝাতে ‘তত্ত্ব’ শব্দের ব্যবহার স্বগ্বেদ থেকে পাণিনি হয়ে চলে এসেছিল সংস্কৃত ভাষায়। এই মৌলিক অর্থ থেকে সহজেই এসে গিয়েছিল একটু নতুন অর্থ “তাঁতের মতো টানা-পোড়েন করে বোনা বা গাঁথা।” আমাদের দেশে প্রস্তুত সংস্কৃত ভাষার সবচেয়ে পুরোনো গল্পের বইটির নাম ‘পঞ্চতত্ত্ব-আখ্যান’, সংক্ষেপে ‘পঞ্চতত্ত্ব’। এই নাম হবার কারণ বইটির মধ্যে প্রায়ই একটি গল্পের মধ্যে আর একটি গল্প তার মধ্যে আর একটি গল্প—এইভাবে টানা-পোড়েনে গাঁথে দেওয়া হয়েছে, যাকে ইংরেজিতে বলে boxing of tales, যার সবচেয়ে ভাল উদাহরণ মিলছে আরব্য-উপস্থানে।

সঙ্গে সঙ্গে শব্দটির আরও একটি গৌণ অর্থ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল,—কাঠামো (frame-work), কল, কৌশল technique, (technical matter), যন্ত্রের কাজ (mechanical matter), দেহবস্ত্রের কাজ (physical exertion) ইত্যাদি এই অর্থে শব্দটির ব্যবহার মিলছে বৈদিক ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ও পরবর্তী-কালের জ্যোতিষশাস্ত্রের পুস্তকে। ‘প্রজাতত্ত্ব, সাধারণতত্ত্ব’ ইত্যাদি এখনকার সুশ্রীচিত শব্দে ‘তত্ত্ব’ কথাটির ব্যবহার—“বিধান, ব্যবস্থা” ইত্যাদি অর্থ এই পথেই এসেছে।

ধর্মক্ষেত্রে ‘তত্ত্ব’ উড়ে এসে জুড়ে বসেনি। ‘তত্ত্ব’ এসেছিল ‘বোগ’-এর সহযোগে। ‘বোগ’ মানে জুড়ে দেওয়া। ‘বোগী’ মানে যিনি দেবতার সেবকরূপে যুক্ত। এখানে প্রাচীনতর শব্দ হল ‘ভক্তি’ ও ‘ভক্ত’। এ দুটি শব্দ এসেছে ‘ভজ’ ধাতু থেকে, মানে অংশ পাওয়া, ভাসীদার হওয়া।

দেবতা যেন feudal lord বা রাজা বা জমিদার, তিনি ভগবান,—সকল সৌভাগ্যের ভাণ্ডারী। ভক্ত যেন তার জোতদার প্রজা। তাঁর ভাণ্ডারের অংশভাক্ তারা। দেবতা (ভগবান) ও উপাসকের (ভক্তের) মধ্যে এই যে অংশীদারি ভাব তারই নাম ভক্তি, ইংরেজিতে sharing বা rationing। এই মূল অর্থ থেকে সহজেই এখনকার প্রচলিত অর্থ উদ্গত হয়েছে। ভক্ত শব্দের মূলে যেমন feudalistic ধারণা ছিল, যোগ শব্দের মূলেও তেমন imperialistic (অর্থাৎ প্রভুত্বত্যা) সম্বন্ধের গন্ধ ছিল। শ্রুত-স্মৃতির সম্পর্ক—service—অর্থে ‘যোগ’ কথাটির ব্যবহার বহু প্রাচীন, ‘যোগী’ শব্দের ব্যবহার তত প্রাচীন নয়। দেবতার একনিষ্ঠ উপাসক হিসাবে ‘যোগী’ শব্দের ব্যবহার, আমার ধারণা ভারতবর্ষের বাইরের প্রভাব থেকে এসেছে। সে কথা স্পষ্ট করে বলবার আগে ‘যোগ’ এর সম্বন্ধে আরও কিছু বলা আবশ্যিক।

বিশেষ অধ্যায়পথ বুঝাতে ‘যোগ’ কথাটি উৎপন্ন হয়েছিল সংসারত্যাগী উদাসীন নিরীশ্বর তপস্বীদের মধ্যে। ঋগ্বেদে এমন তপস্বী বা সাধক সমাজের উল্লেখ আছে। তারা মানুষের সামাজিক ব্যবহার অহুসরণ করতেন না। দশম মণ্ডলের একটি ঋকে (১৩৬) এঁদের সম্বন্ধে যা উল্লিখিত আছে তা ইতিহাসের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাই সে কথিকাটি এখানে অহুবাদ-সম্মত উদ্ধৃত করছি।

কেদী অয়িং কেদী বিবং

কেদী বিভতি রোদসী।

কেদী বিবং স্ববৃশে

কেদীদং জ্যোতির উচাতে ॥ ১ ॥

‘দীর্ঘকেশধারী (তিনি) ভরণ করেন অয়িকে, তিনি (ভরণ করেন) বিব, তিনি ভরণ করেন উর্দালোক হুটি। দীর্ঘকেশধারী তিনি (শক্তি দেন) বিশ্বকে আলো দেখাতে। দীর্ঘকেশধারীকেই বলা হয় এই জ্যোতিঃ ॥’

মুনয়ো বাতরশনা পিশ গা বসতে মলা।

বাতস্যাঙ্ক ঞ্জিঃ ষান্ত

ষদ্ দেবাসো অবিক্ত ॥ ২ ॥

‘মুনীরা যাদের কটিবন্ধ (অর্থাৎ বসন) বায়ু, যারা পেরুয়া ধুলো গারে মাখেন তাঁরা স্বর্গের পিছু পিছু খাওয়া করেন যখন দেবতারা পড়েন মুশকিলে ॥’

উন্নতিতা যৌনেয়েন বাতা

আ তস্থিমা বরম্ ।

শরীরেদ্ অন্বাকং যুয়ং মৰ্তাসো

অতি পশ্চৎ । ৩ ।

‘মুনিব্রতের দ্বারা উত্তেজিত হয়ে আমরা ঝড়ের উপর চড়ি। এখন আমাদের দেহ, মানব তোমরা দেখে নাও ।’

অন্তবিক্ষেপ পততি বিখা

রূপাণ্য চাকশং ।

মুনির্দেবদেবস্যা সৌকৃত্যায়

সখা হিতঃ । ৪ ।

‘আকাশে ওড়েন, সকল রূপ দেখাতে পারেন। প্রত্যেক দেবতার সংকাজের জন্তে মুনি লেগে আছেন সখা রূপে ।’

বাতস্যাস্থে বায়োঃ সখা

অথো দেবেষিতো মুনিঃ ।

উর্ভো সমুজ্জাব আ ক্বেতি

বশ্, চ পূর্ব উতাপরঃ । ৫ ।

ঝড়ের ঘোড়া, বায়ুর সখা মুনি, (তাকে) দেবতারা (সর্বদা) চান। তিনি দুটি সমুজ্জেই বাস করেন, যে সমুজ্জ পূর্বের আর যে (সমুজ্জ) পশ্চিমের ।’

অপসরসাং গন্ধর্বানাং

য গনাং চরণে চরণ্, ।

কেশী কেতল্য বিধান্

সখা স্বাদুর্ মদিন্ তমঃ । ৬ ।

‘অপ্সরাদের, গন্ধর্বদের, বনপতঙ্গ চরাটে বিচরণ করে কেশী জানবার বা কিছু তা জেনে নিলে, কেশী (হয়েছেন) অভ্যস্ত আনন্দময় মধুর সখা ।’

বাহুর অশ্বা উপামহং

পিনটি শ্বা কুন্নয়মা ।

কেশী বিবল্য পাজেণ

বদ্ কৃত্রেণা পিবং সহ । ৭ ।

‘এঁকে (বিব) বহন করে এনে দিয়েছিল বাহু, বেঁটে দিয়েছিল কুন্নমা (তখন), বখন কেশী কৃত্রের সঙ্গে এক পাজে বিব পান করেছিলেন ।’

কবিতাটির তাৎপর্য অনেক। কোন এক অধ্যায় সাধক সম্প্রদায়ের বিবরণ এতে আছে। ‘যোগ বা যোগী’ নামটি এর মধ্যে পাওয়া না গেলেও এতে যোগী সম্প্রদায়ের পুঁথিভিহান লক্ষ্যে কিছু অহমানের সূত্র পাওয়া যায়। সম্প্রদায়টির নাম করা হয়নি। এঁদের বলা হয়েছে ‘মুনি’। এঁদের কর্তা বা গুরু গোসাইকে নাম করা হয়েছে ‘কেশী’ বলে। ‘মুনি’ শব্দটির মানে আমরা মোটামুটি জানি। এঁরা ছিলেন সংসারত্যাগী বনবাসী, বাগবত। ‘কেশী’ শব্দটির মানে দীর্ঘ কেশধারী। মুনিরা গবাই চুল রাখতেন যোগী, সিদ্ধাদের মতো অথবা মাথা মুড়োতেন জৈন ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মতো সে বিষয়ে কিছু বলবার উপায় নাই। সেকালের প্রথাগত ব্যবহারে রাজার বা কর্তার ব্যক্তিগত ভৃত্য-পরিচারক নেড়ামাথা হত। এও সেইরকম ছিল কিনা কে জানে। তা যদি হয় তবে বুঝব চুল রাখতেন শুধু গুরু, চেলারা মাথা মুড়োতেন। তাই গুরুই “কেশী” বলে উল্লিখিত হয়েছেন।

ঋগ্বেদের কবিতাটিতে জানতে পারি (২ কথ) যে মুনিরা দিগম্বর থাকতেন, গায়ে গেরুয়া (অথবা রাঙা) ধুলো মাখতেন। এঁরা পান করতেন ভাঙের মতো কোন উগ্র বিষজাতীয় (narcotic) পানীয়। এ পানীয় রক্তের সঙ্গে কেশী এক সঙ্গে একপাত্রে চুমুক দিয়ে পান করতেন। কেশী রক্তের সমকক্ষ ছিলেন।

কেশীর মাহাত্ম্য দেবতাদের মহিমাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। দেবতার। মুন্ডিলে পড়লে তাঁদের সাহায্য করতে ছুটতেন কেশী, তাঁদের শ্রিয় হুহুং (৪. ৫. ৬)। এঁদের শক্তির কাছে কোন বাধাই ছিল না। বলতে পারা যায় যে, সিদ্ধদের সব লক্ষণ কেশীর (এবং মুনিদের) ছিল।

কবিতাটি থেকে বোঝা যায় যে এই সম্প্রদায়ে গুরু গোসাই শ্রেষ্ঠ দেবতাদেরও উপরে উঠে গেছেন। প্রথম স্লোকেই তা বলা হয়েছে। এঁদের শ্রেষ্ঠত্ব জান বলে (৬ গ)।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্লোক থেকে অহমান করা যায় যে এঁরা বাগবত ছিলেন এবং সর্বত্র এঁদের অবাধ গতি ছিল।

পঞ্চম-ষোড়শ শতাব্দী থেকে বাংলা ও কোন কোন নব্যভারতীয় আর্থ ডাবার যে শিব মন্ত্রজ্ঞানাথ, গৌরকনাথ মালভারি ইত্যাদি যোগীসিদ্ধ গুরুদের ছবি পাচ্ছি লোকগীতে ও যোগী-সম্প্রদায়ের গানে, তার কীণ কিছু নিশ্চিত পূর্বাভাস পড়েছে ঋগ্বেদের দশম বওলে লবলিত এই কবিতাটিতে। কবিতাটি

কগ্নবাদের প্রাচীনতম কবিতাগুলির সমবয়সী নয় কিছুতেই। তবে এটির রচনাকাল ১০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের পরে নয়।

প্রাচীন বৈদিক ধর্মে ছিল দেব উপাসনা। দেবতাকে আহ্বান করে তাঁর উদ্দেশে অগ্নিতে উত্তম খাদ্য ও পের আহুতি দিয়ে তাঁকে ভুট করা। দেবতাদের তৃষ্ণিতে উপাসকের জীবনে বাহ্যিক লাভ হত, দুঃখ বিপদ এড়ানো যেত। এ যেন রাজার সঙ্গে দীন প্রজার সম্পর্ক। দেবতাদের প্রতিভূ—একমাত্র অগ্নি। এ ছিল অগ্নিহোত্র (fire cult)।

এই উপাসনার পরের ধাপ হল উপাসকের অন্তরে দেবতার শক্তি আবির্ভাবের কল্পনা। এ-কল্পনা এল সোমযোগের (Soma Cult এর) অল্পবয়সে। অগ্নি-হোত্রীরা দেবতাদের উদ্দেশে যা আহুতি দিতেন তা নিজেরাও খেতেন। সোম-যাজীরা সেই সঙ্গে সোমরস আহুতি দিতেন এবং নিজেরাও প্রচুর পান করতেন। (অগ্নিহোত্রের তুলনায় সোমযোগ অনেক দিন ধরে চলত।) এঁদের মুখ দিয়েই বেরিয়ে ছিল প্রথম অল্পভূতি মানবের দেবত্ব লাভের পথে।

অপাম সোমম্ অমৃতম্ অমৃতম্

অগ্নয় জ্যোতির্ অবিদ্যাম দেবান।

কিং নুনম্ অম্বান্ কৃণবদ্ অরাতিঃ

কিম্ উ ধৃতিম্ অমৃতম্ মর্ত্যস্য ॥ ৮. ৪৭. ৩ ॥

‘(আমরা) সোমপান করেছি, অমর হয়েছি।

জ্যোতিতে পৌছেছি, দেবতাদের খুঁজে পেয়েছি।

ওগো অমর, এখন শত্রুতা আমাদের কী করতে পারে ?

কী (করতে পারে) মাতৃষের বিদ্বেষ ?’

বৈদিক গল্প গ্রন্থাবলীর একাধিক ব্রাহ্মণে একটি অশেষ মূল্যবান উক্তি আছে,—

আত্মসংস্কৃতির বৈ শিল্পানি।

‘নিজেরই সংস্কৃতির প্রতিফলন শিল্পসমূহে।’

এই অর্থে কোন জনসমষ্টির অধ্যাত্ম চিন্তা ও সাধনাকে শিল্প বলতে পারি।

তা যদি হয় তবে বলব আমাদের ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম শিল্পে বোপ-বোগী বোগিনী এই ধ্যান ও ধারণার বীজ এসেছিল হুদুর বাইরে থেকে। এশিয়া মাইনরে (এবং মেলোপোটেমিয়ার) খুব প্রাচীন উপাস্যা দেবী ছিলেন। সে দেবীর উপাসনার ব্যাপার ছিল অত্যন্ত গোপনীয় রহস্য, আর সে রহস্যের

কৃত্তিক ছিল দেবীর বাজক-বাজিকারের হাতে। এঁদের কার্যক্রমের যে ইমিড-উদ্দেশ্য পাওয়া গেছে তাঁর থেকেই আমি উপরে উক্ত অসুমান করেছি। (এখানে বলে রাখা ভালো যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দেবীর রূপ কিছু ভিন্ন ভিন্ন ছিল এবং উপাসনান্তেও কিছু কিছু ইতরবিশেষ ছিল। আমি তা জড়িয়ে নিয়ে একটা মোট ত্যাগপথ খাড়া করে নিয়েছি। এছাড়া উপায় নেই। খৃষ্টপূর্ব সহস্রাব্দীর গোড়ার দিকে উত্তর পশ্চিম এশিয়া মাইনরে ক্রিজিররা বাস করত। (হোমারের ইলিয়দে এই ক্রিজিরদের সঙ্গে সমবেত গ্রীক জাতিদের সংঘর্ষই বর্ণিত হয়েছে, ট্রয়-যুদ্ধ রূপে।) ক্রিজিরদের ভাষা পৃথক ছিল কিন্তু তাঁদের নিজস্ব কোন বর্ণমালা ছিল না। তাঁরা গ্রীক অক্ষরই ব্যবহার করতেন। আমাদের সংস্কৃত যে গোষ্ঠীর ভাষা গ্রীক ভাষার মতো, ক্রিজির ভাষাও সেই গোষ্ঠীরই অন্তর্গত। এশিয়া মাইনরের এই চিরকালাগত মাতা দেবীকে ক্রিজিররা নিজদের উপাসা করে নিয়েছিলেন। এঁকে তাঁরা নিজদের ভাষায় বলতেন ‘গুদান মা,’ অর্থাৎ “পৃথিবী-মাতা”। (তুলনীয় ঋগ্বেদের এই বহু পুনরুক্ত ছত্র, —“তন্ম দ্যৌশ ধত্তাং পৃথিবী চদেবী”।) ইনি বিশ্বমাতা, দেবমাতা তো বটেই। ভারতবর্ষে আসবার আগে আমাদের আর্ষভাষী পূর্বপুরুষ এই দেবীর সম্বন্ধে ওয়াকবহাল হয়েছিলেন। হয়ত কোন কোন দল দেবীর ভক্তও হয়েছিলেন। বৈদিক ধর্মে এ দেবীর উপাসনার কোন স্পর্শ দেখা যায় না। তবে বৈদিক সাহিত্যে ক্রিজির দেবীর কিঞ্চিৎ আভাস পড়েছে বলে মনে হয়। ঋগ্বেদে এক দেবী আছেন যিনি দেব-সমাজে বেশ উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। কিন্তু তাঁর মূর্তি খুব স্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত হয় নি। ইনি দেবমাতা। মূর্তিতে গোমাতা। নাম অদ্বিতি। অথগুন বা ‘অসীম’ এই অর্থ ধরে নামটিকে পৃথিবীর নামান্তর মনে করা হয়। কিন্তু ঋগ্বেদে স্বতন্ত্র পৃথিবী মাতার উল্লেখ আছে, সে উল্লেখ অদ্বিতির চেয়ে অনেক বেশি। (পৌরাণিক ঐতিহ্যে অদ্বিতি কাশ্যপের তর্ক্য এবং দেবতাদের মাতা।) আমার মনে হয় এই অদ্বিতির সঙ্গে এশিয়া মাইনরের মহাদেবী—যিনি দেবমাতা—তাঁর মিল আছে। মহাদেবীর কোন নির্দিষ্ট ভর্তার উল্লেখ নেই। অদ্বিতিরও নেই। ‘অদ্বিতি’ নামটির একটি মানে ‘নির্বাচন’। যিনি কোন পুরুষের সহিত পত্নী রূপে বাঁধা নন তিনি অদ্বিতি। এ নাম দুটি দেবতার পক্ষেই খাটে। মহাদেবীর ছরকম প্রকাশ ছিল—হুর্গম ওহাম্মিরের অভ্যন্তরে—অদৃশ্য, আর হুর্গম ওহাম্মিরের বায়বশে

—কৃত। (ভক্তকে দূরে থাকতে হত।) অদিতির বেলায়ও এমনি ইঙ্গিত মেলে। তিনি থাকেন তাঁর শালার (“পত্নী”) অভ্যন্তরে, কখনো কখনো তাঁর মুখ দেখা যায় গুহাঘারে। ঋগ্বেদে কবিরের কাছে অদিতি তাঁর এই অপ্রকাশ-রূপ ছুটিতে এক বা এক জোড়া নৃতন (?) দেবীতে পরিণত হয়েছিলেন। ইনি (বা তাঁর একজ) হলেন ‘অহর’ বা দিবারাত্রি। দিবারাত্রি অহর-এর দুই প্রকাশ—অন্ধকার ও আলোকময়, রাত্রি ও দিবা। রাত্রি হল কালো দিন (“অহঃ কৃকম্”), আর দিবা হল সাদা দিন (“অহর অজুনং”)। বৈদিক কবি রাতকে ধরেছেন পুরোপুরি আর দিনের বয়লে ধরেছেন দিবাযুগ উষাকে। ঋগ্বেদের কবি গুহাঘার থেকে নির্গম্যমান উষাকেই বলেছেন অদিতির বয়ন (“অদিতির অনীকম্”)। একই দেবীর কালো-খলো রূপ দুটি পরবর্তী কালে ভারতবর্ষে দুটি পৃথক দেবদত্তার পরিণত হয়েছেন—কালী ও গৌরী। কালী ক্রুর, নিষ্ঠুর। গৌরী শান্ত, মধুর। ঋগ্বেদে কিন্তু রাত্রি মোটেই নিষ্ঠুর নন, তিনি রজনীর—শান্তির বিজ্ঞানময় স্নানকার দেবতা, ধরিণী। ঋগ্বেদের উষা ধীরে ধীরে পরিণত হয়েছেন দশভূজা দূর্গায়। সেই সঙ্গে মিলে গিয়েছিল তুষার শৃঙ্গ পর্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—আসলে এশিয়া মাইনরের মহাদেবীর এক রূপ—উষা হৈমবতা। ঋগ্বেদে জমাট জলের এই দেবীর কোন উল্লেখ নেই, তবে প্রবহমান জলের দেবীর উল্লেখ আছে, ‘গৌরী’ বলে। ইনি বাগ্‌দেবীও বটেন, কাকশিল্পীও বটেন (১. ১৬৪. ৪১)। অনেক পরবর্তীকালে পূর্ব ভারতে ইনি মনসা দেবী বলে পূজা পেয়েছেন। দেবী ভারতবর্ষে যেমন মনসা হয়েছিল, ইউরোপে তেমনি হয়েছিলেন Venus। নাম দুটির মূল একই।

অবাস্তব কথা ছেড়ে বক্তব্যে ফিরে আসা দাক। আমাদের ধর্ম সাধনায় ও মর্শনচিন্তায় ‘যোগ’ শব্দটির বিশেষ যে তাৎপৰ্য আছে তার সূত্র নির্দেশ করেছি। এই সূত্র ধরে এগোলে আমরা পৌছই কালিদাসের আমলে খৃষ্টীয় প্রথম সহস্রাব্দীর গোড়ার দিকে। রঘু-বংশীয় ব্যক্তিদের মাহাত্ম্য বর্ণনায় কালিদাস বলেছেন যে, তাঁরা জীবন অন্তেষ্টযোগ অবলম্বন করে কার্যোৎসর্গ করেন, যোগেনাস্তে তত্ত্বচ্যজাম্।

এখানে ‘যোগ’ মানে কী? প্রাণায়াম কৃত্তক করে? না ভ্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে? আমার মনে হয় শেষের অর্থই ঠিক। কেননা অভিজ্ঞান শব্দভাণ্ডারের ভিত্তিতে কালিদাস নিজের অন্তিমকালের জন্তে যে প্রার্থনা করেছেন তা সংসার-



বন্ধন টুটে বাবার জগেই। যমাপি চ ভবং অপমৃত্যু নীললোহিতং। ভবকল্পনই মানবাত্মাকে ব্রহ্ম থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে।

কালিদাসের উক্তিতে যোগের দার্শনিক দিকের পরিচয় রয়েছে। প্র্যাকটিক্যাল দিকের আভাস পাই অনেক পরবর্তীকালে লেখা পবনবিজয় স্বরোদয়-এর মতো হটযোগপ্রদীপিকা জাতীয় নিবন্ধে। আসলে, যোগ ধারা করতেন সেই যোগীদের ধর্ম ছিল নিরীশ্বর। তাঁদের ধারণায় প্রাণবায়ু স্থির ও চিত্ত অচঞ্চল রাখতে সমর্থ হলেই মাহাত্ম্য কাল জয় করে অজয়-অমর হতে পারে তখন যোগী হন সিদ্ধ অর্থাৎ ঈশ্বর। এঁদের উপাশ্য কোন পরমেশ্বর ছিল কি না সে সম্বন্ধে কোন অনুমান করা যায় না। মনে হয় বৌদ্ধদের নির্বাণের মতো জৈনদের অহঙ্কপ্রাপ্তির মতো এই যোগীদের সাধনার চরম উদ্দেশ্য ছিল সিদ্ধি অর্থাৎ সিদ্ধ-প্রাপ্তি। যোগী-সম্প্রদায় বোধ করি বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের চেয়েও প্রাচীন। আগে ঋগ্বেদের একটি কবিতায় মূনি-সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের কথা আলোচনা করেছি—সিদ্ধ-সম্প্রদায় তাঁদের চেয়েও পুরোনো মনে হয়। ঋগ্বেদের পুরুষ মুক্তে “নাথ্য” দেবতার উল্লেখ আছে। (১০. ২০. ১৬)। এই ‘নাথ্য’—দেবতাই কি সিদ্ধ?

যোগীদের প্রাকটিক্যাল সাধনা ছিল ত্রিমুখী,—প্রাণায়ামে আর ব্রহ্মচর্যে। তত্ত্বের অর্থাৎ যাকে আমরা তত্ত্ব-সাধন বলি তার ভিত্তিও এই দুটি। নিরঞ্জননাথ-পন্থী যোগীরা এই সাধনা করতেন অজয়-অমর হবার জন্তে। তাঁদের বিশেষ প্রযত্ন ছিল ব্রহ্মচর্য পালনে অর্থাৎ বর্ধ-রক্ষায়। তাই তাঁদের সাধনার নারীর সঙ্গ চলত না। সিদ্ধ হলে পরে অবশ্য নারী সঙ্গ নিষিদ্ধ ছিল না। কালিদাস মেঘদূতে হিমালয়বাসী যে সিদ্ধদের উল্লেখ করেছেন তাঁরা সহচরীসমেত থাকতেন।

নিরঞ্জননাথপন্থী যোগসাধনা ভারতবর্ষের নিজস্ব চিন্তালব্ধ বলে মনে হয়। আমাদের প্রাচীন ধর্মমত জৈন ও বৌদ্ধ চিন্তার সঙ্গে—বিশেষ করে জৈন চিন্তার সঙ্গে নাথপন্থী যোগীমতের বেশ মিল আছে। তবে পরে আরও একটা যোগী-মত বাইরে থেকে এসে আমাদের প্রাচীন যোগ ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। এই যুক্ত যোগীমতের মূল ছিলেন শিব। আমাদের শাস্ত্রে—পুরাণে শিব পরমেশ্বর, অথচ যোগী। কিন্তু তিনি কোন আরাে বড় দেবতার একনিষ্ঠ নাথক বা যোগী? এ প্রশ্নের কোন উত্তর মেলে না আমাদের মিথলজিতে। এর উত্তর খুঁজতে গেলে বোড়তে হবে হু সহস্রাব্দীরও বেশি কাল পেরিয়ে

অর্নাতোনিয়ার, পশ্চিম এশিয়া মাইনরে মেনোপেটেমিয়ার। সেখানকার মহা মাহুবেবী ও তাঁর সহচর-সচিব (—প্রধান কর্তৃক, বোম্বিন্—) এখানকার মহাদেবী ও শিবের সঙ্গে মিলে গিয়ে যে কৃত্রিম খলজির সৃষ্টিপাত করেছিল তাঁর সবচেয়ে পুরোনো বিবরণ কিংবা পাই কালিদাসের কুমারলম্ববে। পরে কোন কোন পুরাণে এই কাহিনীর নানা রকম তাঁত বোনা হয়েছে। সে কথা কিছু কিছু অল্প বলছি।

গৌরী-পার্বতীর সঙ্গে বোম্বিন্ শিবের বোম্বাণে হবার পরে আমরা বাক্য তত্ত্বসাধনা বলি তার গোড়াপত্তন হয়েছিল। এই সাধনার লক্ষ্য পূর্বতন বোম্বসাধনার সম্পূর্ণ বিপরীত। এতে অমরত্বের চিন্তা তেমন নেই, আছে অমরত্বের চেষ্টা। সে হল সকল ইচ্ছার বা কিছু ভোগ তা পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করা, কিন্তু তার কলে মাহুবেব দেহে মনে যে প্রতিক্রিয়া ও বিকার উৎপন্ন হয় তা এড়ানো। সে জগৎ চাই দেবতার শক্তি। দেবতা হয়ে গিয়ে দেবতাকে ভোগ করা হল এই সাধনার উদ্দেশ্য। পূর্বতন বোম্ব-সাধনার উদ্দেশ্য ছিল ব্রহ্ম হওয়া, পরবর্তী কালের অর্থাৎ নির্বাণের মতো অবস্থা পাওয়া। তাত্ত্বিক প্রয়োগ-সাধনার উদ্দেশ্য হয়েছিল নিজ দেহে দেবতার শক্তি লক্ষ্য করা, দেবীর মতো দেব হওয়া; আমাদের দেশের নিজস্ব (?) ঐতিহ্যে—কেন উপনিষদের উমা হৈমবতী ও ইন্দ্রের সংলাপে—শিবই বড়, ব্রহ্ম; দেবী—তাঁর অম্বচরী, ব্যাখ্যাতা। পরবর্তীকালে তাত্ত্বিক-সাধনার ঐতিহ্যে শেষ পর্যন্ত—কালীমূর্তিতে—দেবীই বড়, শিব তাঁর পদতলে শব। এ ধারণা বাইরে থেকে এসেছে পরবর্তীকালে।

কিন্তু তত্ত্বশাস্ত্রের গ্রন্থে শিবের প্রাচীন মহিমা খর্ব হয় নি। এ গ্রন্থ—আগমই হোক, আর পটলই হোক—(আগম মানে বা শিবের মুখ থেকে এসেছে, আর পটল মানে শিবের অথবা তৎস্থানীয় ভৈরবের নির্দেশিত প্রক্রিয়া-উপদেশ সংহিতা) শিব-উৎসাগত। (‘আগম’ বোঝায় তত্ত্বশাস্ত্র। শব্দটি ‘নিগম’ শব্দের বিপরীতে) পরিবর্তিত। ‘নিগম’ মানে বেনসংহিতা। বা ব্রহ্মার অথবা ঋষিদের মুখ থেকে অপৌরুষেয়ভাবে নির্গত হয়েছিল। ‘আগম’ মানে বা এসেছে কোন পুরুষ-বিশেষের মুখ থেকে। নিগম অপৌরুষেয়, আগম পৌরুষেয়।)

বোম্বিন্ শিব কোন দেবতার উপাসক-সাধক ছিলেন তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় গৌরীনাথের কাহিনীতে। শিব, মজ্জুর, গৌরী—এঁরা ছিলেন মহাদেবীর আজ্ঞামুখী সেবক। এই সেবকদের মধ্যে শিব ছিলেন প্রধান। তিনি মহাদেবীর অম্বগ্রহ সর্ব প্রথম লাভ করে তাঁর সহচর হতে পেরেছিলেন।

মহাদেবীর ইচ্ছা ছিল অপর সেবক হুজুও শিবের পথ অহসরণ করেন। মচ্ছন্দর ও গোরখ দেবীর প্রভাব প্রত্যাখ্যান করেন। তাই তাঁরা দেবীর আশ্রয় পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

[নাথপন্থীদের কাহিনীতে শিব ছাড়া প্রধানত চার সিদ্ধার নাম পাওয়া যায়। মচ্ছন্দর (মচ্ছন্দ্র), গোরখ, জালদারি ও শিঙ (কাহ)। আসলে এঁরা হুজুই, চারজন নন। মচ্ছন্দ্র = জালদারি; গোরক মানে পলাল = শিঙ (সেই স্বত্রে ককলীলা থেকে এসেছে ককনাম)। গল্পটির মধ্যে অগ্রাচীন মিথ ও বৌদ্ধ-মতের রূপক স্পষ্টভাবে মিশিয়ে আছে।]

## পাদটীকা

১। এই লোকটি এক হুনির উক্তি।

— — —

## লকাহুদ-হুদে চণ্ডী কমলে-কামিনী ?

মাইকেলের কবিতার ছত্রের প্রথম শব্দটি বদলে দিয়ে এই প্রবন্ধের নাম করলুম। কেন যে করলুম তা প্রবন্ধটি পড়তে পড়তে বোকা বাবে। প্রবন্ধ চিহ্নেরও তাৎপর্য উপলব্ধ হবে।

চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি উপাখ্যানের ক্লাইমাক্স ভাগরণ অংশে মুহূন্দ দেবী চণ্ডীকে নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছেন। ধনপতি বাণিজ্য করতে সিংহলে চলেছেন। বাড়ি থেকে বেয়োবার মুখেই তিনি দেবীকে অপমান করেছিলেন তাঁর পূজার ঘট পায়ে ঠেলে ফেলে। দেবীও পথে ঝড়বৃষ্টি করিয়ে বান ডাকিয়ে তাঁর বাণিজ্যতরী ডুবিয়ে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করেছিলেন। তবুও ধনপতি সে সব ক্ষতি গ্রাহ্য না করে সিংহলের দিকে চলেছিলেন। সেতুবন্ধ পিছনে রেখে ধনপতির নৌকা লঙ্কার পরিসরে পৌঁছল সংকীর্ণ জলপথ (চাঁড়খাল) সীতাকুলি দিয়ে। লঙ্কার মন্ডালে ধক্ষরাজ্যের দেশে চন্দ্রচূড় পর্বত পেরিয়ে পৌঁছল অকুল সাগরে। তার মধ্যে কালিদহ। কালিদহে দেবী অপূর্ব দৃষ্ট দেখিয়ে ধনপতিকে ছলনা করলেন। সমুদ্রের বক্ষে পদ্মবন। তাতে বসে আছে এক ষোড়শী স্তম্ভবী এক হাতে একটা হাতি ধরে। নারী সে হাতিকে একবার গিলে ফেলে পরক্ষণেই উগরে ফেলছেন। ধনপতিকে দেখে মোহিনী নারী তাঁর উপর কটাক্ষবাণ নিক্ষেপ করলেন। ধনপতি মোহমগ্ন হলেন। ধনপতি তাঁর মাঝিমাঝাদেব বললেন, তোমরা দেখলে তো? তারা বললে, আমরা কিছুই দেখলাম না, শুধু চারদিকে জল খই খই করছে। তখন ধনপতি নিজের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করলেন। ইতিমধ্যে দৃষ্টটি অদৃষ্ট হয়েছে। তারপর যথাসময়ে ধনপতির নৌকা সিংহলের রত্নমালা শহরের ঘাটে এসে লাগল। ধনপতি সিংহলে পৌঁছলেন। রাজার সঙ্গে তাঁর জিনিসপত্র বদলের কাজ ভালোভাবেই হল। কথায় কথায় তিনি রাজাকে কমলে-কামিনী-কুঞ্জর কুঞ্জের কথা বলে ফেললেন। রাজা সে দৃষ্ট দেখতে চাইলে ধনপতি দেখাতে পারলেন না। উৎকট রকমের মিথ্যাবাদী বলে রাজা ধনপতি সপ্তদশ মাস সব বাজেন্দ্রাশ্রয় করলেন। সপ্তদশের বারো বছরের কারাবাস হল। এই বারো বছরের মধ্যে ধনপতির ছেলে শ্রীপতি বড়ো হয়েছে আর সেও নৌকা নাজিয়ে সিংহলের দিকে রওনা হয়েছে বাবার খোঁজে ব্যবসা উপলব্ধ্য করে। যথাসম্ভব

নিবিঁয়ে সে পৌঁছল লঙ্কার ময়ালে। বাণের মতো সেও কমলে-কামিনী-কুঞ্জর  
বৃত্তের কাঁধে পড়ল। রাজাকে দেখাব বলে সে দেখাতে পারল না বাণেরই  
মতো। ছেলেমানুষ মিথ্যাবাদীর উপর রাজা ক্রোশে গেলেন। তার মাল সব  
বাকেরাশ্ত্র তো হলই, তার প্রাণদত্তের আদেশ হল। দেবী অভয়া চণ্ডী তার  
বৃদ্ধা পিতামহী স্নেহে এসে রাজার কাছে তার প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন। ব্যর্থ  
হয়ে নিজের পিশাচ সৈন্ত জড়ো করে রাজাকে পরাস্ত করলেন। শ্রীপতি পিতাকে  
কারাগার থেকে উদ্ধার করলে। তার হাতে রাজা কস্তা সমর্পণ করলেন।  
পিতা ও পত্নী সমভিব্যাহারে শ্রীপতি দেশে মায়ের কাছে ফিরে এল।

মুকুন্দ কমলে-কামিনী-কুঞ্জর দেবতাকে অভয়া চণ্ডীর সঙ্গে এক করে দেখে-  
ছেন, কেননা তিনি সেইরকমই গল্পে পেয়েছিলেন। কিন্তু এ ধারণা যে ভুল তা  
তার লেখা থেকেই বোঝা যায়। ধনপতির বেলার কমলে-কামিনী-কুঞ্জর দেবতার  
আচরণের তবু কিছু ব্যাখ্যা করা যায়। সওদাগরকে ভোলাবার উদ্দেশ্য তাকে  
অপনয়ন করা হতে পারে। কিন্তু শ্রীপতিকে ভোলাবার উদ্দেশ্য কী? তা যে-দেবী  
অপনয়ন করলেন সে দেবী তো তাকে উদ্ধার করলেন না। কমলে-কামিনী-  
কুঞ্জর দেবতার সঙ্গে বৃদ্ধা অভয়া চণ্ডীর কোন দিকেই তো কোন মিল নেই।  
কমলে-কামিনী-কুঞ্জর হলেন মোহিনী দেবতা শ্রীমতী। শ্রীর প্রতীক পদ্ম তাঁর  
আলয়। কাদ পাতা ওঁর পুরুষের জন্তেই। এ দেবতার চরিত্র যে চণ্ডীর থেকে  
সম্পূর্ণ আলাদা তা মুকুন্দের বর্ণনা থেকে ধরতে পারা যায়। ধনপতি (এবং পরে  
শ্রীপতি) যে দৃষ্ট দেখেছিলেন তার বর্ণনা করছেন নাবিকদের কাছে,—

তনরে কাণ্ডার ভাই বিপরীত দেখি  
কহিব রাজার আগে সড়ে হইয়ো সাক্ষী।  
প্রমাণিক যোজন গভীর বহে জল  
ইথে উপজিল ভাই কেমনে কমল।  
পবন ত্রিনিশা অতি বেগে বহে নীর  
ইহাতে অবলা জন কেমনে হয় স্থির !...  
নিবাস পল্লিনী ভাষি ধরিয়া কুঞ্জর  
হরি হরি নলিনী কেমনে সহে ভর !...  
পুরুষ দেখিয়া রামা নাহি করে লাজ  
বায় করে ধরিয়া গিলয়ে গজরাজ।...

অগাধ সলিলে ভাসে বিচিত্র কানন  
 পঙ্কজ গায় অলি নাচে শিকগণ ।...  
 তার মাঝে বিকশিত কমল কানন  
 কামিনী কমলে বসি সংহারে বারণ ।  
 উপারিয়া মত্ত করী ধরে বাম করে  
 ঈষৎ হাসিয়া পুন চৌদিক নেহালে ।  
 কণে কণে হাসে বামা নাচে তুল তুলি  
 পঙ্কজ গায় রাগ-রাগিণী মেলি ।  
 রবাব মারজ ভ্রমক করয়ে বাজন  
 অজ্ঞভয়ে নৃত্য করে বিভাধরীগণ ।...  
 বুঝিতে না পারি এই কস্তার চরিত  
 হেন বুঝি মোরে কিবা বিধি বিড়ম্বিত ।  
 পত্রে তুলি নিল সাধু করিয়া লিখন ।  
 কহিব রাজার আগে সব বিবরণ ॥

পুষ্টি কান্তি ও সৌন্দর্যের দেবতা রূপে শ্রী ও সীতা ( ভূমিতে লাক্ষ্মণের দাগ )  
 ঋগ্বেদের কালেই বন্ধিত হতে শুরু হয়েছিল এবং তা অচিরে দেবশরীর লাভ  
 করেছিল । সীতা রাম-কথার পরে জুড়ে গিয়েছিল । সেই নৃত্তে লাক্ষ্মণের সঙ্গেও  
 যোগাযোগ । মুকুন্দের বর্ণনার যে লক্ষ্মণ ময়ালে সংকীর্ণ স্রোতপথ সীতাকুলির  
 উল্লেখ আছে মনে হয় তা শ্রী-দেবতারই সম্পর্কিত । রামায়ণ কাহিনীতে সমুদ্র  
 বন্ধন করা হয়েছিল, কোন খালের উল্লেখের কোন সম্ভাবনাই নেই সেখানে ।

বাই হোক মুকুন্দ বর্ণিত কমলে-কামিনী-কুঞ্জর দেবতার সঙ্গে লক্ষ্মণ অধি-  
 ঠাজী অথবা রক্ষস্রাজী দেবীর কোন সম্পর্ক আছে কিনা দেখা যাক । পুরানো  
 পালি সাহিত্যে পাই যে সিংহল দেশ আগে বঙ্গ রাজ্যের অধিকারে ছিল ।  
 (রাবণও বঙ্গ ছিলেন ।) বঙ্গ রাজ্যের দুহিতা কুঞ্জর সঙ্গে সিংহলে নবগত  
 বিজয় সিংহ ও তাঁর অহুচরদের ভোলাতে চেষ্টা করেছিল । মহাবংশের এই  
 কাহিনীতে সিংহল লক্ষ্মণ মোহিনী বক্ষীর গল্পশৃঙ্খলের টুকরো পাওয়া যায় ।  
 কিন্তু তা এই পর্যন্তই ।

অসম্ভবো পদ্মানীনা সালঙ্কতা নারীমূর্তি, তার মাথার হাতি জল ঢালছে,  
 এমন ছবি বৌদ্ধ স্থাপত্যে পাওয়া যাচ্ছে প্রায় দু হাজার বছর আগে থেকে ।  
 সঁচৌর তুপের একটি তোরণের শীর্ষে এই মূর্তি খোদাই আছে । এই ধরনের

বৃহত্তম মূর্তি রয়েছে ইলোরার কৈলাস মন্দিরে। এই দেবী পরে গজলক্ষ্মী নামে পূজা পেয়েছেন। গজলক্ষ্মী মূর্তি কমলে-কামিনী-কুঞ্জের মূর্তির শোভন সংস্করণ, তবে কমলে-কামিনী-কুঞ্জের মূর্তি অশোভন সংস্করণ নয়। কেন তা পরে বোঝা যাবে।

লক্ষার প্রহরী (বা অধিষ্ঠাত্রী) রূপে দেবী বা দানবী (যক্ষিনী রাক্ষসী) প্রায় সব রায়-কথায় কোন না কোনভাবে উল্লিখিত আছে। অভিনবের রায়চরিতে (খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী) ইনি দেবী চণ্ডীর সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছেন। আশ্চর্যের বিষয় দেবীর কীতি প্রসঙ্গে অভিনব দেবীর গজদলন ব্যাপারের ইঙ্গিত করেছেন।

অভিনব বলেছেন যে, হুম্মানকে সমুদ্র সন্ধান করতে বাধা দিয়েছিলেন দেবমাতা সরমা (বা সুরমা)।<sup>১</sup> অগত্যা হুম্মান তাঁকে স্তবস্তুতি করে প্রসন্ন করেছিলেন। তবে দেবীর ছুটি শত্রুদমন কাহিনীর উল্লেখ আছে—গজাসুরের গ্রাস আর মহিষাসুরের বিনাশ—

অগ্রসে গজতম্বু দম্বুদম্বু

গাঢ়নভবপুষা বপুষা তে।

অব্‌কোশমমুদ্রণা মহিষঃ প্রাক

চুক্ষুবে স চরণে চরণেন ॥

—‘গজদেহধারী নৈতাপুত্র গোটাগুটি গাঢ় নত দেহ তোমার গরাস হয়েছিল। আগেই মহিষ (-অসুর) যুদ্ধে তোমার পদ্মকেশর কোমল চরণে চূর্ণ হয়েছিল।’

তুলিয়ে দেখলে অভিনবের বর্ণনা কামিনী-কুঞ্জের খাটে না। দেবীর যে বর্ণনা এখানে—গাঢ়নভবপু—তা খাটে যদি দেবীকে সর্প কূর্ম অথবা কুজীর কল্পনা করি। গজকচ্ছপ অথবা গজকুজীরের বদ্য অনেক পৌরাণিক আখ্যানে উল্লিখিত আছে। এখানে তেমনি একটি ব্যাপার হওয়া সম্ভব, যেখানে দেবীর শত্রু গজাকৃতি আর দেবী কুজীরাকৃতি অথবা সর্পাকৃতি। লক্ষার রকরিজীর পক্ষে এ ব্যাপার খুবই সম্ভব।

আরও একটা কথা। মুকুন্দর দেবতা হাতি নিয়ে খেলা করছেন, তাকে দমন করছেন না। প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পে হাতিকে দেখেছি দেবীকে অভিষেক করতে। দশম-একাদশ শতাব্দীতে বাংলায় স্থাপত্য শিল্পে দেখছি জল-ও সর্পদেবী সন্মীর সঙ্গে প্রায় অতিরিক্ত এবং গজাকৃতি। মনসামন্ডলে দেবীর বাহন

(“রথ”) হল খামাই (অর্থাৎ চেমনা সাপ)। (হাতি ও সাপ দুই-ই “নাগ” হুতরাং সমান) খামাই মনসার সহায়ও বটে। এখানে অর্থাৎ মুকুন্দর কাহিনীতে নাগ যে ক্রীড়াবস্ত্র হবে তাতে আর বৈচিত্র্য কী? হয়ত এখানে হাতি আহলে নাগই ছিল। হাতি গেলা ও উগরে ফেলার চেয়ে সাপ গেলা ও উগরে ফেলা অনেক সহজ ও সরল প্রক্রিয়া। এখান অরণ করতে পারি কোন কোন রূপকথার নারিকারাজকন্ডার মূখ দিয়ে সাপ বেহোনের কথা। এমন রাজকন্ডা সাধারণত জলাশয়বাসিনী হতেন। অবশ্য হাতি গেলা ব্যাপারকে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। এ ব্যাপার অভ্যস্ত অবিখ্যাত, তাই মুকুন্দ গল্পটির যে রূপ পেয়েছিলেন তাতে সাপের পরিবর্তে হাতি ছিল। (একটা কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তির মূখে এ ব্যাপারের একটু নতুন রকম ব্যাখ্যা শুনেছিলুম। তাঁদের মতে এখানে হাতি গেলা মানে হাতিকে দিয়ে “গিলা” অর্থাৎ অতিবিক্ত হওয়া। হিন্দী খাতুর সাহায্যে ব্যাখ্যাটিকে খাড়া করা যায় বটে তবে গ্রহণ করা যায় না। বাংলার খাতুটি আছে ‘গেলা’ রূপে। গেলার বস্তু নরম। তরলতা-তরলতাপ্রাপ্ত, আত্মতাপ্রাপ্তও বলা যেতে পারে। কিন্তু স্নান বা অভিব্যেক পর্বন্ত টেনে আনা চলে না)।

## দুই

সমুদ্রের উপরে পদ্মদ্বীপ। এর সম্বন্ধে একটু বিবেচনা করা যাক। আমাদের দেশে বোগী-বোগিনীদের ট্র্যাডিশনে তাঁদের মূলনীতি “নাগর মধ্য লোহার গড়” উল্লিখিত আছে। (সেকততেদুয়ার উদ্ধৃত বোগিনীদের গান ব্রটো)। এমন লোহার গড়ের ভাস্কর উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে জলদেবী সরস্বতীর সম্পর্কে।

সরস্বতী ধরণম্ আয়নী পুঃ ॥ (১-২৫-১)

— ‘সরস্বতী (যেন) লোহ দুর্গের সমাশ্রয়।’

ইতিভাটির অর্থ দুমিক দিয়ে বোঝা যায়। এক, সরস্বতী বাস করেন লোহার গড়ে। দুই, সরস্বতী পৃষ্ঠির ও সমৃদ্ধির দেবতা, ভক্তের অভয় দুর্গ।

কমল-কামিনী-কুব্জর দেবতার লোহার গড় ছিল বলে উল্লেখ নেই। থাকলেও ঋগ্বেদে পদ্মকুলের উল্লেখ নেই। তা ছিল পদ্মবনের অভ্যন্তরে।



বৈদিক পরবর্তীকালে পশ্চিম উল্লেখ প্রচুর আছে। পশ্চিম কালটের আমদানী হয়েছিল বাইরে থেকে। সেই কালটের প্রভাব এদেশের সংস্কৃতিতে নোকা থেকেই পেড়ে বলেছিল।

আপাতত কমলে-কামিনী-কুঞ্জের খাওয়া করতে পশ্চিম লন্ডানে এগোবার প্রয়োজন নেই।

তারতীয় আৰ্যভাষীদের এক দূর জাতি-গোষ্ঠীর ইতিহাসে এক দেবীর বর্ণনা মিলেছে যিনি অনেকটাই মুকুন্দর বর্ণিত কমলে-কামিনী-কুঞ্জর দেবতার অনুরূপ। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে রোমান লেখক তাকিতুস্ (Tacitus) জার্মান জাতিগোষ্ঠীগুলির ইতিহাস লিখেছিলেন। জার্মানদের লম্বা একেবারেই প্রথম ও বিস্তৃত খবর কিছু পাই। বইটির নাম সংক্ষেপে গের্মানিয়া (Germania)। বইটি লেখবার সময়ে তাকিতুস পশ্চিম জার্মানিতে বাস করছিলেন। বইটিতে লেখক জার্মানদের ব্যেকটি গোষ্ঠীর উপাসিত এক দেবীর যে বর্ণনা দিয়েছেন তার সঙ্গে মুকুন্দ-বর্ণিত দেবীর বেশ মিল আছে। তাকিতুসের বর্ণনার মর্ম দিচ্ছি।

‘রেনডিডিগি (Rendidingi) বা রেনডিডিগনি (Rendidigni), আবিসোনস (Avionds), আবিলি (Angili), বারিনি (Varini), এউদোসেস (Eudoses), সুবিনিস (Suavinis) আর নুইতোনেস (Nuitones)— এই দলগুলি যে সব অঞ্চলে বাস করে তা অজলময় ও নদীপ্লাবিত। গোষ্ঠী হিসেবে এ দলগুলির প্রত্যেকটি লম্বা বলবার বিশেষ কিছু নেই। শুধু এইমাত্র যে এরা সবাই পৃথিবী-মাতা নেথুসের (Nerthus) উপাসক। এদের ধারণার দেবী মাতৃবৈর অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। ইনি মাতৃবৈর শহরে শোভাযাত্রা করে লক্ষ্য করেন। এঁর মূল অধিষ্ঠান সমুদ্রের মধ্যে এক দ্বীপে। সেখানে আছে মনোরম কুঞ্জবন। তার মধ্যে আছে গুঁর দিবা রথ বিচিত্র বলনে আবৃত। দেবীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পূজক (বা পুরোহিত) আছেন একটিমাত্র। তিনিই সে পবিত্র রথ স্পর্শ করতে পারেন। পূজক দেবীকে দেখতে পান না, শুধু অঙ্গভবে বুঝতে পারেন দেবীর উপস্থিতি। দেবীর রথ টানে গোকতে। রথের শিঁটু শিঁটু পূজক চলেন পরম ভক্তিতে নত হয়ে। তারপরে কয়েকদিন ধরে সবাই মিলে আনন্দ উৎসব করে। সর্বত্র কাকের ছুটি। দেবীর পছন্দমত বসত খুশি লোকের অভ্যর্থনা ও পূজা তিনি গ্রহণ করেন। লোকে তখন বুদ্ধ করে না, অস্ত্রশস্ত্র ধারণও করে না। প্রত্যেক বৃদ্ধাঙ্গ সরিয়ে রাখা হয়। তখনই সর্বত্র শান্তি

ও স্বস্তি বিদায় করে বতকল পৰ্বত সেই পূজক দেবীকে তাঁর কুঞ্জে  
কিরিয়ে নিয়ে না বান। ইতিমধ্যে দেবী মাহুকের সঙ্গে থেকে তাদের  
পূজা পেয়ে তৃপ্তিলাভ করেছেন। তারপর, যদি আপনারা বিশ্বাস করতে  
রাখি হন, সেই রথ, রথের আবরণ বস্ত্র ও দেবী স্বয়ং একটি নির্জন হ্রদে  
খোঁত ও স্নাত হন। এ কাজে হাত লাগার ক্রীতদাসেরা। তারপর তখন  
তারা এই হ্রদের জলে ডুবে মরে। এইমত এই ব্যাপারে এমন ধর্মশীলতার  
সঙ্গে অজ্ঞান ও অকৃত মোহ জড়িয়ে আছে যে দেবীর সম্বন্ধে কোন রকম  
স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব নয়,—যে দেবীকে নয়নগোচর করলেই মাহুকের  
জীবনান্ত হয়।

তাকিতুসের বর্ণিত নেথু'স দেবীর সঙ্গে মুকুন্দ-বর্ণিত কামলে-কামিনী  
দেবীর খানিকটা মিল সহজেই নজরে পড়ে। দুই দেবীরই বাস সমুদ্রগর্ভে  
নির্জন দ্বীপে কুঞ্জেবনের মধ্যে। দুজনেই নৃত্যগীত কৌতুক ভালোবাসেন।  
নেথু'স শহরে এসে মাহুকের মধ্যে তা উপভোগ করেন আর কামলে-কামিনী  
নিজের পদ্মবনে নিকুঞ্জেই। তফাৎ রয়েছে, পদ্মবনে ও হাতিতে। তাকিতুসের  
কুঞ্জেবন আর মুকুন্দের পদ্মবন প্রায়ই একই ব্যাপার। তাকিতুসের রথ হয়ত  
মুকুন্দের গল্পের বীজে দেবীর ক্রীড়নক ছিল না, বাহন ছিল। এই দিক দিয়ে  
এখানেও একরকম মিল পাওয়া গেল। আগে আমি বলেছি হয়ত হাতি  
আগলে ছিল সাপ-অর্ধে নাগ। এখন বোধ হচ্ছে, হাতির ব্যাখ্যায় নাগ-সাপ  
ধরবার আবশ্যকতা নেই। দেবী হলেন স্রোতময়ী জলদেবতা। তাঁর পক্ষে  
হাতিকে নাকানি-চোবানি খাওয়ানো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। পৌরাণিক  
আরুণীও ঐরাবতকে এইরকম দুর্গতি দিয়েছিলেন। জলদেবীর বাহন মকর  
সাপ-হাতি নাগেরই মতো।

আর একটি মিল রয়েছে—দেবীদর্শনের ফলে। নেথু'সের পূজক তাঁর  
দিকে তাকাতে না, তাকাতো ক্রীতদাসেরা বারা উৎসবরাতে খোঁড়া-পাখলার  
কাজ করত। তাদের প্রাণান্ত হত। মুকুন্দের কাহিনীতে ধনপতি-শ্রীপতির  
অবস্থা নেথু'সের ক্রীতদাসদের মতোই। দেবীকে তারা চাক্ষুষ করেছিল,  
তাই তারা প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারে না।

মুকুন্দ দেবীর নাম মেননি, চণ্ডীর রূপান্তর বলেই চালিয়েছেন। অর্ধ-  
নগের দেবীর নাম নেথু'স। বৈদিক সংস্কৃতে ক্রীলিখ নামটি হয় নৃক্স। মূল

অর্থাৎ প্রক্স-ইন্ডোইউরোপীয় ভাষায়ও তাই হবে। অর্থাৎ, ‘বীরনারী’, ‘নৃত্যকারিণী’। বাংলার জাদবিক মহাভারতের মধ্যে দেবী বাতালীর পরিচালিকার নাম নিত্য। (যেমন, “নিত্যার আদেশে বাতালী চলিল সহজ জানাবার তরে”)। মনসামঙ্গল কাব্যের উপাখ্যানে মনসার নখী ও পরিচালিকার নাম নেতো। বনে হয় এই নাম দুটি—নিত্য ও নেতো—জাৰ্মানদের দেবী নেথুলের নামের সঙ্গে অভিন্ন। বৈদিক ‘নৃত্’ শব্দ সংস্কৃতে নেই। তাই তার স্থানে তখনকার চলিত কথার ছিল নৃত্য (তুলনীয় নৃত্যকালী)। এই প্রসঙ্গে পরবর্তীকালের দেবী সরস্বতীর কৃমিকাও স্মরণীয়। ইনি নৃত্য-গীতবাদের অধিদেবতা। তবে ‘নিত্য’ নামটির প্রসঙ্গে এটাও বলতে হয় যে দেবী চণ্ডী বা ধরিজীর পক্ষে নামটির সহজতর ব্যাখ্যা অর্থাৎ চিরজন—এই অর্থ, সমানভাবে উপযোগী।

### ভিন্ন

এখন প্রশ্ন জাগে তাকিভুলের ও মুকুম্বর দেবীবর্ণনার মধ্যে যে মিল তা কি আকস্মিক ঘটন-জোটনা, না কোন এক প্রাচীন মূল থেকে আগত। মিল যে পরিমাণে গভীর তাতে তা যে আগাগোড়া আকস্মিক তা বলা চলে না। এক মূল থেকে যদি এসে থাকে তা তাহলে সে মূল সম্পত্তি ছিল না। জৰ্মান আর ভারতীয় এই দুটি শাখায় শুধু এ দেবতার দর্শন মিলছে আর কোন শাখায় নয়। ভারতীয় শাখায় যদি ঋগ্বেদে মিলত তবে অল্পমান করা যেতেন যেতে পারত। কিন্তু ঋগ্বেদের অন্তত হাজার বছর পরে কমলে-কামিনী-কুম্বর দেবতার দেখা মিলছে স্থাপত্য শিল্পে - সাহিত্যে নয়। সাহিত্যে পাই আরও হাজার খানেক বছর পরে। সুতরাং বলতেই হয় যে ভারতবর্ষের ঐতিহ্যে এ দেবী বহিরাগত। জৰ্মানদের বেলায়ও অল্পরূপ কল্পনা করা যায়।

ঋগ্বেদে পদ্মের নাম নেই, অর্বাচীন বৈদিক সাহিত্যেও নেই—শুধু একবার পদ্মের রঙ (?) বোঝাতে “পদ্মঃ” শব্দ। পদ্ম ভারতবর্ষের ফুল লক্ষ্যে নেই, তবে ভারতবর্ষের একচেটে নয়। মধ্যপ্রাচ্যে, মিশরে ও ইউরোপের দক্ষিণ প্রান্তে পদ্ম খুবই পরিচিত ফুল ছিল। মিশরে পদ্মফুল রীতিমত কাল্ট বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। এনিরিরায় পদ্মফুলের আধ্যাত্মিক মূল্য স্বীকৃত হয়েছিল। দেবীর যে স্বভাব—হাসিখুসি স্মৃতি করা ও মাছবকে

শলা-সম্পদ দান করা এবং বংশবৃদ্ধি করা তাও মধ্যপ্রাচ্যে ও এশিয়ামাইনরে অনেক আতির মতো অনেকরূপে অনেক নামে প্রচলিত ছিল। (এঁরা কেউ কেউ আমাদের দেশে এসেছেন, অন্যজও গিয়েছেন। তার প্রমাণ আছে।) কমলে-কামিনী দেবীও মনে হয়, এশিরিয়া-এশিয়া মাইনর থেকে কিনিদীর বণিক ও রোমান নাবিকদের মারকৎ এদেশে আনীত হয়েছিলেন। রোমানদের এমন কারবারের একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। রোম সাম্রাজ্যের শেষের দিকে রোম-নগরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা প্রচলিত হয়েছিল। লক্ষ্মী-সরস্বতীর মতো ইনিও সাংসারিক ও সামাজিক কল্যাণের দেবতা। এঁর নাম হয়েছিল ‘রোমা,’ অর্থাৎ রোমের দেবী। আমাদের দেশেও এই দেবীরও এই নামের প্রচার কিছু হয়েছিল বলে মনে হয়। ১৯শী ‘রমা’ নামটি ‘রোমা’ থেকে আগত মনে করা ছাড়া অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। নামটির ‘লক্ষ্মী’ অর্থের ব্যবহার মিলছে অধীচীন সংস্কৃতে—ভর্গহরি-শঙ্করাচার্যের কবিতায় ও ভাগবত পুরাণে।

একদা বিদেশাগত দুটি কাহিনীকে যুক্ত করে চণ্ডীমঙ্গলে গেঁথেছেন। কাহিনীর মূলভাণ্ডার নির্দেশ করেছেন “ভৃগুবংশ” বলে। জানি না এই নামে—“হরিবংশ”—এর মতো কোন গল্পকাহিনীর সন্ধান ছিল কিনা। তবে ভৃগু নামটি থেকে সন্দেহ হয় এসব গল্প যে আগলে ক্রীষ্ণের ছিল সে স্বত্তি কীণ হলেও তখনো একেবারে লুপ্ত হয়নি। মনে হয় বিষ্ণুর কীৰ্ত্তি যেমন হরিবংশে গাঁথা হয়েছিল দেবীর কীৰ্ত্তি তেমনি ভৃগুবংশে। এখানে বলে দিই যে এ নাম দুটিতে বংশ শব্দের অর্থ সন্তানপরম্পরা নয়,—বংশীধ্বনি অর্থাৎ কীৰ্ত্তি-গাথা। কালিদাসও এই অর্থে ‘রঘুবংশ’ নাম দিয়েছিলেন। (আমার এই উক্তিতে যিনি তর্ক তুলবেন তাঁকে বলি যে, কালিদাসের কাব্যের বংশকর্তা রঘু নয়, দিলীপ।)

## পাদটীকা

১। সরস্বা দেবত্বী। মহাভাষে সিংহলের বন্ধরাজ কস্তা কুন্তীর রূপ ধরে বিজয় সিংহকে জোলাতে এসেছিল। নামটি আগলে হওয়া সম্ভব। হরস্বা=পাতালগঙ্গা। বিদ্যাপতির ‘ব্যাভীভক্তি তরঙ্গিনীতে’ হরস্বা জলদেবী ও সর্পদেবী বনসার আচীন নাম।

## মহাদেবী নিত্য

চণ্ডীদাসের ভণিতায় একটি সহজ সাধনা ব্যটিত পদের আরম্ভ হয়েছে এই বলে,—“নিত্যার আদেশে বাঙালী চলিল সহজ আনাবার ভবে।”

কে এই নিত্যা ধীর আদেশে মহাদেবী বাঙালী—বোড়শী চণ্ডী—চণ্ডীদাসকে সহজ সাধনার দীক্ষা দিতে গিয়েছিলেন ?

এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই অনেকের মনে জেগেছিল এবং তাঁরা কেউ কেউ মনে মনে প্রশ্নের উত্তরও পেয়েছিলেন কিন্তু কিছুই বলেননি অর্থাৎ লেখেননি এ বিষয়ে। অজ্ঞান করি তাঁরা বাঙালী দেবীকে মনসার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে নিত্যাকে মনসার সহচরী-অভিভাবক নেতা বলে ঠিক করেছিলেন।

কিন্তু তা ঠিক নয়। বাঙালী আর মনসা হু দেবী ঊৎপত্তিতে হয়ত অভিন্ন ছিলেন কিন্তু অনতিবিলম্বে তাঁরা বিভিন্ন দেবীতে পরিণত হয়েছিলেন। এবং তাঁরা আর কোন দেবীর শাসনাধীনে ছিলেন না।

তবে মনসা-কাহিনীর নেতা ( নেতা ) আসলে যে নিত্যা দেবী হতে পারেন তার ইঙ্গিত কাহিনীর মধ্যেই রয়েছে। কাহিনীতে নেতা মর্ষাদার মনসার চেয়ে খাটো বটে কিন্তু কমতার সে প্রধান। মনসার চালচলন নেতার উপদেশ অনুসারে। কাহিনীতে নেতার যে চরিত্র তা মূল দেবীর আদল থেকে অনেকটাই জট হয়েছে। তার কারণ বলছি।

মনসা-কাহিনী বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল বৌদ্ধী সম্প্রদায়ের মধ্যে। এঁদের ঐতিহ্যে মনসা-কাহিনী রামায়ণ মহাভারতের চেয়েও পুরোনো। এঁদের মতে মনসার কাহিনী সত্যযুগের ঘটনা, যেমন রামায়ণ জেতা যুগের এবং মহাভারত ষাণ্ময় যুগের। বৌদ্ধী সম্প্রদায়ের মতে চাঁদ শম্ভাগরের উপাখ্যান সত্যযুগের মহাকাব্য। (মদীর Vipradasa's Manasamangal, Asiatic Society, Calcutta, Introduction ৩৫৬)। কাহিনীটির বীজ খুব পুরোনো বলে মনে হয়। বৃত্ত পতির দেহ নিয়ে বমপুরীতে ( বর্গপুরীতে ) বাজা ভারতীয় সাহিত্যের ট্র্যাডিশনের পক্ষে অভিন্ন এবং বিদেশিগদ্য বলে মনে হয়।

সে যাই হোক, বৌদ্ধীদের ঐতিহ্যে মনসার বিশেষ কোন স্থান নেই, যেটুকু আছে তা অ-পছন্দের। সেটা স্বাভাবিক। তবে নেতা এঁদের ঐতিহ্যে হঠাৎবাগের পরম গুরু মতো। স্পষ্ট উল্লেখ করা না হলেও তিনি মহাদেবী।

জল নিয়ে তাঁর কারবার। (তুলনা করুন কনু-বোনের উক্তি—“গৌরীর নিম্নাঙ্গ ললিলানি তকতীঃ” ১.১৬৪.৪১।) বোঙ্গীর নিত্যকে তুলে গিরেছিলেন কিন্তু নামটিকে ছাড়েননি। তাঁরা তাঁদের হঠাৎপের কঠিনতম প্রক্রিয়া বজ্রধ্বনি দিয়ে অল্প ধোঁত করাকে বলতেন “নেতিধোঁতি”, অর্থাৎ নিত্যের সংস্কার কর্তব্য। নামটির শিহনের ছবি হারিয়ে যাওয়ার তাঁরা যে নতুন অর্থ জুড়ে গিরেছিলেন তার কলে নেতি-ধোঁতির মানে হল—নেতের (অর্থাৎ সন্ন কাপড়ের) ধারা ধোওয়া। ওঁরা নাকি বিশ বাইশ হাত লম্বা বজ্রধ্বনি অস্ত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে দেহবস্ত্রকে পরিষ্কার করেন।

বোঙ্গীদের মধ্যে চলিত ছড়াতেও নেতার যে খণ্ডিত আছে তাতে নিত্যের ইঙ্গিত কিছু কিছু পাওয়া যায়। মনলাকে নেতাই বাধ্য করেছিল বেহুলার উপর প্রসন্ন হতে। নেতার রক্তকিনী হওয়া অনেকটা “নেত”-কাপড়ের নৃত্ব ধরেই। (নেত ‘সন্ন কাপড়’ সংস্কৃত ‘নেত্র’ ‘ছাকনি’ থেকে।)

মনসামঙ্গল কাহিনীতে “নেতা” নামটির অন্তরকম ব্যুৎপত্তি কল্পনা করে তার অন্তরকম উৎপত্তি বলা হয়েছে। গৃহিণী চণ্ডীর কোপ থেকে মনলাকে বাঁচাবার জন্তে শিব তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় সিন্ধুয়া পর্বতে একলা ফেলে রেখে আসবার সময় মনে খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। তাঁর চোখ দিয়ে একফোঁটা জল পড়েছিল। সেই নেত্রজলবিন্দু থেকে একটি মেয়ে উৎপন্ন হয়। শিব তাঁকে সিন্ধুয়া পর্বতে পাঠিয়ে দেন মনসার অভিভাবক করে। ইনিই হলেন নেতা। এখানে শব্দটির মধ্যে ‘নেত্র’ শব্দের দুটি অর্থই নিহিত আছে,—(১) চোখ, (২) নায়কত্ব। নেতা মনসার পরে জন্মালেও তাঁকে মনসার উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

নেতা-মনসার সঙ্গে চণ্ডীদাসের পদের নিত্য-বাঙালীর অন্তর্গত বোগ আছে। সে কথা পরে ভেঙে বলছি।

## তুই

পরবর্তীকালে লৌকিক ঐতিহ্যে যে নেতা-নিত্যকে পাওয়া গেল তার খোঁজ ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যেও মেলে, তবে নিত্যকে কীভাবে। নিত্য নামটি—সম্বোধনে “নিত্যে”—আছে মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডী-সপ্তশতীতে। (আছে সেই নৃত্তে কবিকর্ণণের অন্তরামঙ্গলে। অন্তত এদিকে ওদিকে থাকতে পারে, তবে তা নজরে পড়ার মতো নয়।) নামটি পুরোনো, এবং বাইরের ঐতিহ্য থেকে

আগত বলে যেন হয়। মার্কণ্ডের পুরাণে দে-দেবীর মহিমা বর্ণিত হয়েছে তিনি দুর্গা-পার্বতী, নিত্য্য নন। ( কেন নন তা পরে বলছি। ) দেবীনাথাবলির মধ্যে গীথা হয়ে ওখানে চলে এসেছে।

### ভিন্ন

‘নিত্য্য’ নামটির অর্থ বিচার করলে আমরা দেবীর স্থপ্রাচীনত্বের হৃদয় পাই। শব্দটি জ্বীলিত। পুংলিঙ্গ ‘নিত্য্য’ মানে অখণ্ড, অবিচ্ছিন্ন, নিরন্তর। মানের দিক দিয়ে ঋগ্বেদের ‘অদ্বিতি’ নামটির বনিষ্ঠ মিল আছে, এমন কি প্রতিশব্দ বলা চলে। অদ্বিতি একদিকে অবিচ্ছিন্নপ্রসার পৃথিবী, অপরদিকে অবস্থনা নারী। অদ্বিতি দেবতাদের - ঋগ্বেদে অনেক দেবতার, পুরাণে সকল দেবতার — মা। কিন্তু তাঁর কোন বিশেষ পুরুষ সঙ্গীর উল্লেখ নেই। উল্লিখিত আছে অনির্বচনীয় বা অনির্দিষ্ট “ভোঃ” ( গ্রীকে জেউস্, লাতিনে জুপিটার )। আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ে পৃথিবীকে উর্বরা করে। তেমনি অদ্বিতি উর্বরা হয়েছিলেন ভৌ-এর বীর্ষ-ক্ষেপে।

এই আলোচনার অগ্রসর হবার আগে নিত্য্য ( নিত্য্য ) শব্দের অর্থবিচার আবশ্যক। শব্দটি যেমন সংস্কৃতে তেমনি আরও কোন কোন ইন্দো-ইউরোপীয় প্রাচীন ভাষার প্রচলিত ছিল।

### চার

এসিয়া মাইনর অঞ্চলে অনেক অনেককাল আগে থেকে মাতৃদেবতার পূজা শুরু হয়েছিল। পাস্চাত্য পণ্ডিতেরা এ ব্যাপারের ব্যাখ্যা করেছেন, Fertility Cult অর্থাৎ জীবন-পূজা। দেবতার প্রতীক ছিল নারী-লিঙ্গ। ( এ প্রতীক ছদ্মবেশে এখনকার দিনেও আমাদের দেশে চলিত রয়েছে তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতিতে দেবীমূর্ত্তে )। আসলে এ প্রতীক পৃথিবীর। ঋগ্বেদে “পৃথিবী চ দেবী”, হোমরের স্তবে Meter XOhon—মাতা কমা, পৃথিবী, ক্রীড়ার ভাষায় Gdan Ma কমা—পৃথিবী—মা’ )।

সম্ভবত কিছু পরবর্তীকালে, যখন সভ্যতার উৎপত্তিতে পিতার দান বোঝা গেছে, তখন নারী-পুরুষ প্রতীক পূজা চলিত হয়েছিল এসিয়া মাইনরের

কোন কোন অঞ্চলে। এনিয়া মাইনরে ও পূর্ব ইউরোপের সন্নিহিত অঞ্চলে কোথাও কোথাও উত্তরলিঙ্গবৃত্ত আক্রান্তিতের মূর্তি ও পূজার উল্লেখ মিলেছে। আমাদের দেশে বৃত্তলিঙ্গ প্রতীকের পূজা দেখতে পাই গৌরীপট্টবৃত্ত শিবলিঙ্গে। যেসব প্রাচীন শিবলিঙ্গ সেগুলি ধাম বা ধামের মত, সেগুলি বর্ধাৰ্ধ শিবলিঙ্গ। এগুলি কৃত্রিম আছে, স্বাভাবিকও আছে। বৃত্তলিঙ্গগুলি সবই কৃত্রিম, এবং আধুনিক। মনে হয় এই বৃত্তলিঙ্গ প্রতীকের নির্মাণের ইচ্ছিত এসেছিল দেবীমতের থেকে। দেবীমত বৃত্তলিঙ্গ।

পাকোসের নিকটবর্তী আমাথুস (Amathus) শহরে যে উত্তরলিঙ্গধারিণী আক্রান্তিতের মূর্তি পূজা প্রচলিত ছিল খ্রীষ্টপূর্বাব্দ সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে তার অল্পরূপ মূর্তি আমাদের দেশেও চলিত হল খ্রীষ্টাব্দ অষ্টম শতাব্দীর পর থেকে। শিব-পার্বতীর অৰ্ধনারীশ্বর মূর্তি সাহিত্যে উল্লিখিত থাকলেও বাস্তবে পাওয়া গেল বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবতা হেৰুক-নৈরাস্মার যুগল মূর্তিতে। এর অল্পরূপে ব্রাহ্মণ্য মতেও অৰ্ধনারীশ্বর মূর্তি গড়া হল। কিন্তু সে মূর্তি যুগল নয়, পাশাপাশি আধাআধি বসানো, অথবা শিবের কোলে পার্বতী। সেন রাজাদের আমলে অৰ্ধনারীশ্বর হর-পার্বতীর নজিরে অৰ্ধনারীশ্বর লক্ষ্মীজন্যর্দন মূর্তিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাংলাদেশে।

এনিয়া মাইনরে ও মেলোপটেমিয়ায় হুদূর প্রাচীনকালে মহাদেবীকে (Great Mother Goddess) বিভিন্ন নামে পাওয়া গেছে। প্যালেস্টাইনে যে সব ছোটখাট মূর্তি ও খোদাইকরা ছবি পাওয়া গেছে তার কোনো কোনটিতে দেবীর হাতে পদ্মফুল আছে। ঐতিহাসিকেরা এ ব্যাপারে মিসরের প্রভাব অনুমান করেন। সিরিয়ার মহাদেবীর নাম ছিল আস্টার্টে (Astarte) বা আশ্টোরেরেথ (Ashtoreth)। তেরুসালেমে সলোমন এই দেবার বড়ো মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। এই দেবীই প্যালেস্টাইনে পূজিত হতেন। সেখান থেকে এ দেবীর পূজা সাইপ্রাসে প্রচলিত হয়। সেখান থেকে ইজিption সমুদ্রের কোন কোন দ্বীপে, এবং সেখান থেকে গ্রীসে পৌঁছয়। পরে রোমেও যায়। রোমে দেবী পরে রোম শহরের অমিদেবী বলে পূজিত হন। তখন তাঁর নাম হয় রোমা (Roma)। এই নামটিই এদেশে এসে 'রমা' রূপধারণ করে লক্ষ্মীদেবীর প্রতিশব্দ হয়েছে বলে মনে করি।

সুয়েজের কাছে মহাদেবীর নাম ছিল ইনান্না (Inanna)। এই দেবীর



পূজা আতানদের মধ্যেও প্রচলিত হয় এবং ইশ্তার (Ishtar) নামে প্রসিদ্ধ হয়। নামে শুধে ইশ্তার-আস্টারটেরের মধ্যে তফাৎ নেই। ইশ্তার নামটি পাওয়া যাচ্ছে ২০০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ থেকে। নামটির অর্থ অহুমান করা হয় “বোঁ-দেবী।” হুমেরিয়ার রাজা গুডেয়া (Gudea) ও আসিরিয়ার রাজা হাম্মুরাবী (Hammurabi) দেবীকে “যুদ্ধদেবী” (Lady of battles) বলেছেন। এ অঞ্চলে—বাবিলেরান-আসিরিয়ার—দেবীমূর্তি সিংহাকৃষ্ণ অস্ত্র-হস্ত দেখা যায়। ইশ্তার কামবালনার দেবীও। তিনি পুরুষের প্রেম খোঁজেন; যে পুরুষকে তিনি অহুগ্রহ করেন তাকে তিনি বাড়ান। ইশ্তার গণিকাদেরও ইষ্ট। তাঁর পুজিকা-সেবিকাদের মধ্যে যে গণিকাও ছিল সে কথা গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের উক্তি থেকে জানা যায়। (এখানে তুলনা করতে পারি,—দুর্গা প্রতিমা গড়ায় বেড়াবাড়ির মাটি নেবার ব্যাপার।) হুমের আতানদের দেবী ইশ্তার পরে গ্রীক দেবী আফ্রোদিতের (ও রোমান দেবী ভেনাস্-এর) সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিলেন।

হুমেরীয়-আতানীয় মহাকাব্যের (খণ্ডিত রূপে প্রাপ্ত) কাহিনীতে ইশ্তারের এক ভগিনী ছিলেন। পাতালের রানী, নাম এরেশ্কিগাল (Ereshkigal)। তাঁর অধিকার মৃতদের উপর। এঁর যিনি পতি, দেব নিনাজু (Ninazu), তাঁকে আবার পুজও বলা হয়েছে। (বিষহরি মনসার নকাশে জরৎকার ও আতীক। জরৎকারই কি আতীক?)

এরেশ্কিগালের সঙ্গে ভগিনী ইনালা-ইশ্তারের খুব ঝগড়া ছিল। (তুলনা করুন, চণ্ডী ও মনসা।) এরেশ্কিগালের পুত্র নামতার (Namtar) হলেন মৃত্যু ভৈরব। দেবীর প্রচুর ক্রমতা। তিনি সব ইন্দ্রজাল-তুচ্ছতাকের দেবী। তাঁর অহুগ্রহ হলে দেহ থেকে অপদেবতার অধিকার দূর হয়ে যায়, রোগী হুহু হয়। এঁর পূজা পশ্চিমে মিশর পর্যন্ত ছড়িয়েছিল।

ইন্ডো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির মধ্যে মহাদেবীকে প্রথম পাওয়া যায় উত্তর এলিয়া মাইনরে ফ্রীজীয়দের (Phrygian) মধ্যে। ফ্রীজীয় ভাষা গ্রীক অক্ষরে লেখা হত। গ্রীক ভাষার সঙ্গে কিছু লামাও আছে। তবে এটি সংস্কৃত, আবেস্তীয়, প্রাচীন পারসীক, বালটিক স্লাভিক প্রভৃতির মত ‘শতম্’-গুলোর অন্তর্গত। তাই অনেক বিষয়ে সংস্কৃতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ধরা পড়ে। মহাদেবী উল্লিখিত হয়েছেন Gdan Ma অর্থাৎ কমা (=পৃথিবী) রাজ্য বলে। ওঁর সঙ্গে আতানদের অরণ্যানী-সিংহবাহিনী-দুর্গা-পার্বতীর বেশ

মিল আছে। এঁর বোঙ্গী (অর্থাৎ পরিচারক) পূজকদের বলত কুর্বন্তেস (Kurbentes) অর্থাৎ ছেলেরা।

## গাঁচ

কি ভারতবর্ষে কি এশিয়া মাইনর-মেশপোটিমিয়ার মহাদেবীর স্বরূপ বিধা প্রকটিত। একরূপে তিনি উদার পৃথিবী, ধরিজী, কমা, মাতা—জীবনষ্টি করেন, জীব ধারণ করেন, জীব সংহার করেন। অপর দিকে তিনি জলে ক্রীড়াময়ী, স্থলে লীলাময়ী হুললিতা মোহিনী দেবী। অর্থাৎ একদিকে তিনি “নিঠোব সা জগন্মূর্তিঃ”, অন্যদিকে তিনি “স্থধা-অক্ষরা নিত্য।” একরূপে তিনি জনস্থানবাসিনী নিত্য, অপরদিকে তিনি দুর্গমস্থানবাসিনী অরণ্যানী পার্বতী, দুর্গা। বিশেষে নিত্যরূপে পাই স্থমের-আকাদে ইশ্‌তারকে, দুর্গারূপে পাই ক্রীজিয়ার গ্‌দান-মাকে, গ্রীসে আক্রোদিভে-এথিনাকে, রোমে ভেনাসকে। আমাদের দেশে এই দু রূপের একীভবন ঘটেছিল।

এদেশে দেবীর প্রাচীন বৈধ রূপ অন্যভাবে চলে এসেছিল। এখানে কিছুদিন পরে এক হয়ে যায় এবং তার পরে নতুন করে বিধাবিভক্ত হয়। এই বিধাভাগ ঘটেছিল অনেকটা বোগী সম্প্রদায়ের দ্বারা বলে অনুমান করি। বুঝিয়ে বলছি।

ঋগ্‌বেদে দুটি বিশিষ্ট ও খুব প্রাচীন নারী দেবতার উল্লেখ আছে,— অদিতি (পৃথিবী) ও উষা (নক্তৃ)। আসলে এই দেবীদ্বয় একই। অদিতির মুখ হল উষা আর দেহ হল নক্তৃ (অর্থাৎ রাজি)। তরুণী যুবতী লাস্ত্রময়ী উষা ঋগ্‌বেদের প্রধান দেবতাদের মধ্যে একটি। যদিও বৈদিক যজ্ঞকাণ্ডে উষার স্থান নেই, তবুও এঁর প্রাধান্য স্বীকার করতে হবে যেহেতু এঁর নামে অনেকগুলি নৃত্ত অর্থাৎ স্তব ঋগ্‌বেদে গাথা রয়েছে। তবে এটাও ঠিক আত্মতানিক কর্মকাণ্ডে উষা অল্পস্থিত থাকলেও যে দেবী লৌকিক কর্মকাণ্ডে অপূজিত ছিলেন না সে অনুমানের পক্ষে যথেষ্ট কারণ আছে। তা আমি অন্যত্র প্রদর্শন করেছি। আমি আরও দেখিয়েছি যে দেবী উষাই কালক্রমে দশবাহ দুর্গার মূর্তি পেয়েছিলেন। নক্তৃ অর্থাৎ রাজি যে দুর্গার কালিয়ারূপ তা দেখিয়েছি।

ঋগ্‌বেদের দু একটি নৃত্তে এক দেবীকে বলা হয়েছে ‘গৌরী’। ইনি

জল নিয়ে কাজ করেন, খেলা করেন, সৃষ্টি করেন। আগে এর উল্লেখ করেছি। একটি শূক্রে (১.১৬৪) বেশ প্রাহেলিকাম্বর ও অভ্যন্তর ছবোখা, প্রায়-আধুনিক কালের বোঙ্গীনের আঁকা তরঙ্গার মতো। এই শূক্রে যিনি গৌরী অভিহিত তিনি গৌরগাভী, আকরিক ও প্রতীক ছ-অর্থেই। হুতরাং তাঁকে ধরতে পারি অধিভি (পৃথিবী)-র আর এক স্বরূপ ঘাতে তিনি জল নিয়ে খেলা বা কাজ করেন। এই জলময়ী অধিভিই বাকুদেবী। ইনিই অক্ষর জুড়ে জুড়ে ছন্দ সৃষ্টি করেছেন।

গৌরীমিথার সলিলানি তকতীর্

একপদী বিপদী না চতুশ্রী।

অষ্টাপদী নবপদী বহুব্রী

সহস্রাক্ষরা পরমে বোমন্ ॥ ৪১ ॥

—‘জল কেটে কেটে গৌরী নির্মাণ করলেন, একপদী বিপদী চতুশ্রী অষ্টাপদী নবপদী—পরমবোম্বে সহস্রাক্ষরা হতে ইচ্ছা করে।’

দেবীর নারীরূপ বহু এবং অনিদিষ্ট হলেও তিনি পুরুষ বলেও পরিচিত। (অর্থাৎ আগলে অর্থনারীররও)

জিন্নঃ সতীতা উ মে পুংস আহঃ

পত্তন্ অক্ষয়ান্ ন বি চেতদ্ অহঃ।

কবির্ধঃ পুত্রঃ স ঈম্ আ চিকিত

য স্তা বিজামাৎ স পিতৃব্ পিতাসৎ ॥ ১৬ ॥

—‘তাঁরা নারী হলেও শোনা যায় পুরুষ বলে। যার চোখ আছে সে দেখেছে, যে দেখেনি সে অন্ধ। যে পুত্র তত্ত্বজ্ঞানী সেই জেনেছে। তাদের যে চিনেছে সে হয়েছে বাবার বাবা।’

মহাদেবীর তিনটি প্রধান রূপ, স্বরূপও বলা যায়। এই কারণে মার্কণ্ডেয়-পুরাণে দেবীকে “ত্র্যম্বিকা”, অর্থাৎ নারীজ্ঞী বলা হয়েছে—বৈদিক ব্রাহ্মণ গ্রন্থে নারীজ্ঞীর নাম পাওরা যায় অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকা। অর্থাৎ মা, ছোট মা, আরও ছোট মা)। আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য অল্পসংখ্যে মহাদেবী-জ্ঞীকে বলতে পারি,—(১) অধিভি-কম্মা পৃথিবী-নিভা, (২) অরণ্যানি-হৈমবতী (পার্বতী) হুগী, এবং ৩। গৌরী (সঙ্গবৎ)-প্রসন্ন মনসা-বাসুদেবী।

ত্রিবেদীর সমস্ত মূর্তি রোমে পুজিত হত। এ মূর্তির তিনমুখ, দুই হাত, দুই হাতে বোধবারি কাটারি, প্রজ্জলিত মশাল। হুড়ুলও দুটি লাগে প্রহরী।

তিনটি মাথার একটি মুহূর্ত। (The Great Mother by Erich Newmann, translated by Ralf Mouheim, New York 1955, পৃ: ১৩২।)

অর্বাচীন পুরাণে ও তাত্ত্বিক নিবন্ধে দেবীর এক বিশিষ্ট নাম পাওয়া যায় ‘জিপুরস্বন্দরী’, সংক্ষেপে ‘জিপুরা,’ সংযোগে ‘জিপুরা-ঈশ্বরী’। এ নামটির সঙ্গে দেবীর জরীষরূপের কোন সম্পর্ক মেলে না। এ নামটি বিশেষের আয়নারী। গ্রীকদেবী আক্রোমিতে (আমাদের গৌরী-প্রসন্ন মনসা-বাউলী) অর্ধনারীষর রূপেও পূজিত হতেন। এলিয়া মাইনরের বাইরে তিনটি স্থানে দেবীর পূজা খুব জাঁকজমকে হত। ঐষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীর দিকে সাইপ্রাসের পাকোস (Paphos) শহরে, পাকোসের নিকটবর্তী আমান্থুস্ (Amanthus) শহরে (—এখানে পূজিত হত দেবীর উভয়লিঙ্গ মূর্তি), এবং গ্রীসের করিন্থে (Corinth) শহর—এই তিন হল মহাদেবীর প্রধান পীঠস্থান। দেবী কুমারী, কিন্তু তাঁর উপাসিকাদের মধ্যে কুমারীও ছিল গণিকাও ছিল। এ গণিকারা (religious prostitutes) সমাজে মান্য ছিলেন। (আমাদের বোগী-ঐতিহ্যে এরাই বোগিনী।)।

পাকোস-আমান্থুস্-করিন্থের দেবীর থেকেই জিপুরস্বন্দরী নামের উৎপত্তি বলে অনুমান করি।

### ভঙ্গ

আমাদের ঐতিহ্যে মহাদেবীর তিন প্রধান স্বরূপ। প্রথমত তিনি আদি দেবী—অদ্বিতি, কমা (পৃথিবী), নিত্য—“আধারভূতা জগতম্ স্বম্ একা”, মহামাতা। তিনি সর্বত্র আছেন, সর্বদা আছেন। দ্বিতীয়ত তিনি দুর্গমস্থানে অধিষ্ঠিত দেবী—অরণ্যানি, হৈমবতী (পার্বতী), দুর্গা। তিনি দুর্গ থেকে দুর্গতনের রক্ষা করেন, তিনি নিত্যার মত উপগম্য নন। আসলে তিনি নিষ্ঠুর দেবতাও। ইনি কারও মাতা নন। নিত্যার যেমন পতি ছিল না (আদিতে উভয়লিঙ্গ বলে), এঁর তেমন নয়, এঁর পতি আসলে—শিব। তৃতীয়ত তিনি লাগ্যমরী ঘোড়নী—প্রসন্ন মনসা-বাউলী। ইনি কুমারী, এবং মাহুকের প্রেমে লোভ আছে। ইনিই কলকবের গৌরী। তাঁর একটি বিশিষ্ট প্রমাণ হল মনসামন্ডলে ও লোকব্যবহারে এর নামান্তর কলকগৌরী (আসলে “কল্যাণ”—অর্থাৎ জ্বরহত গৌরী)।

তিন মহাদেবীর স্বরূপ বৈদিক অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকাৰ বখার্ব অৰ্ঘবহ। অম্বা=কমা ( the great mother goddess, the Earth )। অম্বিকা তে হুৰ্গার নামান্তর। মানে তরুণী নারী। অম্বালিকা ( < অম্বা+বালিকা ? )—আরো তরুণী, শিশু কুমারী।

বৈদিক ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ( তৈত্তিরীয়-সংহিতা, শতপথ ব্রাহ্মণ ) অম্বিকা কল্পপত্নী। তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে ( ১৬. ১২. ৪. ) অম্বিকাকে রুদ্রের ভগিনীও বলা হয়েছে ( “শরদ্ বা অম্বিকা বলা” )। এখানে শরৎ=শারদা, হৈমবতী, পার্বতী।

### সাত

গ্রন্থ ইতিহাসের নিত্যাদেবীর ঐতিহ্য বহন করে এনেছে যোগী সন্তানদ্বয়। এঁরা বরাবরই বাবাবর। আমাদের ঐতিহ্যে বখন থেকে ধরা পড়লেন তখন থেকেই এঁরা শিবের সঙ্গী অথবা অঙ্গুচর। ঋগ্বেদের একটি সূক্তে ( ১০. ১৩৬ ) এঁদের বলা হয়েছে “কেশিন্”, অর্থাৎ দীর্ঘকেশধারী। ঋগ্বেদের যে সূক্তে গৌরীর কথা বলা আছে সেই সূক্তে এঁর দীর্ঘ কেশধারী তিন উপাসকের উল্লেখ আছে। এঁরা ক্ষমতাশালী যোগী,—যেন তিন দেবতা অগ্নি, সূর্য, বায়ু।

ত্রয়ঃ কেশিন ঋতুয়া বি চক্ষতে

সংবৎসরে বপতে এক এবাম্।

বিশ্বম্ একে। অভিচাষ্টে শচীতিব্

প্রাজিব্ একস্ত দদুশে ন রূপম্ ॥ ৪৪ ॥

—‘তিনজন কেশীকে ঠিকমত চেনা যায়। একজন বছরে একবার কৌরী করেন। একজন জগৎকে উদ্ভাসিত করেন তেজের দ্বারা। ( আর ) মনের বেগ ( অহুত্বত হয়, তার ) রূপ দেখা যায় না ॥’

এইবার কিঞ্চিৎ কল্পনার সাহায্য নিচ্ছি। রুদ্র-শিব ছিলেন একদা নিত্যার প্রধান যোগী ( অর্থাৎ ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত পরিচালক )। যেন ইশতারের প্রধান পুরোহিত। এই কল্পনার সূত্র পাওয়া যায় মন্ত্রেপ্রনাথ-গোক্ষর্নাথের কাহিনী থেকে। এই কাহিনীর গোড়ার গৌরী যেন নিত্যার সাত ভাধারিণী। তাঁর জনকতক সেবক “যোগী”। এঁদের প্রধান হল শিব। এঁকে দেবী পতিরূপে গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু অপর দু’তিন জনকেও প্রেম

বিতরণ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন না। দেবীর প্রভাবে দোনাঘনা করার মৎস্তেন্দ্রনাথ নির্বাসিত হন। গোকর্নাথ দেবীকে উপেক্ষা করে দল ছেড়ে চলে যান। পরে ইনি মৎস্তেন্দ্রনাথকেও উদ্ধার করেন। এই দুজন হলেন নারী-সদ-পরাংমুখ বোগী সম্প্রদায়ের মূল। বলতে পারি এঁরা মহাদেবী নিত্যার আসলে বিরোধী দেবক। তাই এঁদের ঐতিহ্যেই নিত্য-বাউলী-মনসা-কাহিনী বা allegory বাই বলুন তা পাচ্ছি। তাত্ত্বিক আর বোগী দুটি মতই উৎপন্ন হয়েছে প্রাক-ঐতিহাসের কমা-নিত্য উপাসনা থেকে। হালকা কথায় বলা যায় যে দলবান্ধিই কমা-নিত্যার উপাসনার ভিন্ন মতের কারণ। কমা-নিত্যার উপাসিকা-উপাসক দুই-ই ছিল। উপাসিকা “বোগিনী”—রা প্রধান হয়ে এবং বাকে ভক্তভাবায় বলে fertility cult তাকে অর্থাৎ জীব-জীবনের একটি মুখ্য আনন্দকে বড়ো করলেন এবং মাতৃ ও মাতৃকাতন্ত্রের পথে চললেন। উপাসক “বোগী”—রা কণিক ইন্দ্রিয়ানন্দকে তুচ্ছ করে—তাই ঘৃণা করে, ত্যাগ করে—উদ্বৈরতা: হয়ে অথও জীবনের সাধনার নিরত হলেন। প্রথম সম্প্রদায় চাইলেন ইন্দ্রিয়ানন্দকে দীর্ঘস্থায়ী করতে, দ্বিতীয় সম্প্রদায় খুঁজলেন অজর-অমর হবার পন্থা। বোগিনী সম্প্রদায়ের উপাস্তা—আগল কথায় ঠিক উপাস্তা নন, সাধন গুরু, সাধন-উপাসিকা হলেন মহাদেবী নিত্য। তাঁর প্রধান সহচরী, অর্থাৎ দেবীর স্বরূপে প্রধান উপাসিকা হলেন মনসা-বাউলী। বোগী সম্প্রদায়ের উপাস্তা বলে কেউ বা কিছু নেই। আছেন গুরু, যিনি সাধনের পথে সিঁড়ির পথ বাতলে দেন,—আদি বোগী (অর্থাৎ নিত্যার মুখ্য উপাসক) রক্ত-শিব ও তাঁর সহকারী সহ-“বোগীরা”—মৎস্তেন্দ্র (মৌন)-জালদারি, গোকর্-কৃষ্ণ ইত্যাদি।

যে অস্পষ্ট সাধক সম্প্রদায়কে আমরা এখন “বাউল” অথবা “সহজিয়া” নামে চিহ্নিত করেছি তাঁরা আমাদের বাংলাদেশের বিশিষ্ট বোগী-সম্প্রদায়। এঁরা শিব-গোরক্ষ ইত্যাদি সিদ্ধাদের ছেঁটে ফেলেছেন বটে কিন্তু নিত্য-বাউলীর (মনসা) ঐতিহ্য একেবারে বাতিল করে দেননি। তার প্রমাণ রয়েছে “সহজিয়া” পদাবলীতে ইত্যন্ত আকীর্ণ। তবে এঁরা গ্রহণ করেছেন বৌদ্ধ-তাত্ত্বিকতার সূত্রে আগন্ত ভক্তিরূপের সঙ্গে আদিরূপের ঘোড়ন এবং সর্বোপরি চৈতন্তের বিনয় ও কারুণ্যমর্ষ। ঠিক মতো বলতে গেলে বাউল-সহজিয়ারা হলেন বোগী-তাত্ত্বিক-বৈকব। এঁদের তাত্ত্বিকতাটুকু অর্থাৎ দেহ-সাধনা তা

লিভাইয়ের জন্তে নয়, অভিজাতের জন্তেও নয়। এঁদের তাত্ত্বিকতাই বা অত্যন্ত  
হুমুসোপন, তা এঁদের দেহচর্চারই অন্তর্গত বলে আমি অনুমান করি। যোগী-  
তাত্ত্বিক ভাবের আমদানি চৈতন্যমতেও হয়েছিল প্রায়-গোড়ার দিক থেকে।  
চৈতন্য-পরবর্তী পরকীয়া মতে এই ব্যাপারেরই প্রতিকলন, তবে মিথের  
প্যাটার্ন বদল করে।

### আট

প্রথম মনসা ও বাউলীকে আমি একই দেবস্বরূপ বলছি। কিন্তু তার  
প্রমাণ কী?

‘মনসা’ দেবী-নাম হিসাবে খুব প্রাচীন না হলেও শব্দ বা নামটি  
পুরোনো বটে। ‘মনসা’ নামটি লিখ করার জন্তে পাণিনিকে একটি সূত্র  
করতে হয়েছে (৬.৩.৪)। (এ বিষয়ে বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলের ভূমিকা,  
পৃষ্ঠা—xxxii দ্রষ্টব্য)। মনসা নামটি লাতিন Venus নামটির সমার্থক ও  
প্রতিরূপ। একই প্রত্যয় যোগে এটি এসেছে মন্-ধাতু থেকে (অর্থ—  
জোর কামনা করা), অপরটি বন্-ধাতু থেকে (অর্থ—প্রেম কামনা করা,  
বাগনা করা)। দেবীস্বরের ঐক্য বিষয়ে আগে লিখেছি (আনন্দবাজার  
পত্রিকা, ১৩৮৬, পূজা সংখ্যা ‘লঙ্কাহুদ-স্বদে চণ্ডী কমলে-কামিনী’ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।  
মনসার সঙ্গে মহাদেবী নিত্যার যোগ বিষয়ে একটি নতুন প্রমাণ মনে  
এসেছে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় প্রাপ্ত মহাদেবীর সবচেয়ে পুরোনো  
নাম হল \* Khthon (‘পৃথিবী’), \* Khthon Mater (‘পৃথিবী মাতা’)।  
মহাদেবীর এই নামটি পাই মার্কণ্ডেয়-পুরাণে এবং পরে অন্যত্র “কমা”  
রূপে। (‘কমা করা’ অর্থে কন্ম-ধাতুর ব্যবহার প্রাচীন নয়। ধাতুটি  
আললে কিরা ছিল না, ছিল শব্দ। সংস্কৃতে কিরার অর্থ এসেছে শব্দ-  
অর্থ থেকে। পৃথিবীর মত সহনশীল কে?)। অনাধুনিক বাংলা ভাষায়  
মনসার নামান্তর রূপে “কমা” শব্দটি পাই কয়েকজন মনসামঙ্গল-কবি-গায়কদের  
নামান্তর বা উপাধি—‘কেমানন্দ’-থেকে। “কেমানন্দ” নাম হিসাবে  
অত্যন্ত অর্থহীন। বাংলার অর্থতৎসম উচ্চারণে “কমা” হয় “ক্যামা”  
(‘কেমা’)। হুতরাং আললে নামটি ‘কমানন্দ’। এই নামটির সঙ্গে তুলনা  
করতে পারি ‘নিত্যানন্দ’, ‘হুর্গানন্দ’, ‘কালিকানন্দ’, ‘ভবানন্দ’, ‘নয়ানন্দ’,  
‘দেবানন্দ’, ‘কুকানন্দ’, ‘স্বামানন্দ’, ‘গোবিন্দানন্দ’ ইত্যাদি পুরোনো ব্যক্তিনাম

বার প্রথম-অংশ দেবতার নাম। দ্বিতীয় অংশের অর্থ,—প্রশংসা-অনিবারী, আনন্দবর্ষক (পূজ)। বাস্থলী (বাস্তলী) নামটি ‘মনসা’র মতো এতদিন আগে পাওয়া না গেলেও অর্বাচীন বলে মনে হয় না। কোন এক দেবীর নাম বলে মিলছে মধ্য-বাংলা সাহিত্যে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী থেকে। আগে দেবীর পরিচয় বিচার করি তবে নামের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি বিচার করব।

নামটি ত্রিকাকীর্ণনে পাওয়া যায়, তবে “বাসলী” রূপে। নামটিকে প্রাচীন প্রতিপন্ন করবার জন্তে একদা পণ্ডিতেরা কষ্ট-কল্পনা করে ‘বজ্রেশ্বরী’ থেকে উৎপন্ন বলে দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শব্দবিচার তরফ থেকে এ ব্যুৎপত্তি সমর্থন করা যায় না। পক্ষে যুক্তি ছিল একটি মাত্র,—“বাসলী শিরে বক্সী পাইল চণ্ডীদাস,” এখানে ছন্দে এক অক্ষর কম পড়ছে, সুতরাং বাস্থলী=বাসলী। এ যুক্তি অসমীচীন। “বা”, “লী”—এই দুটি অক্ষরের যে কোনটিকে দীর্ঘ উচ্চারণ করলে সমস্তা সহজে মিটে যায়, নূতন একটি অক্ষরের কল্পনা করতে হয় না। সবচেয়ে সহজ ব্যাখ্যা হল “বাসোলী” উচ্চারণ-কল্পনা। তাহলে বাস্থলী (বাস্তলী)-র সঙ্গে অভিন্নতা চট করে ধরা পড়ে।

বাস্থলী সম্বন্ধে আমি আগে যেসব আলোচনা করেছি তাতে নামটিকে চাণ্ডী-চর্চিকার নামান্তর মনে করা হয়েছে। কিন্তু তা ঠিক হয়নি। বাস্থলী ব্রহ্মমূর্তি অথবা হিংসামূখী দেবী নন। ইনি নবমুখতী (ষোড়শী) হুম্মরী কুমারী দেবী। বৌদ্ধমহাবানভজে ইনিই চূন্দা বলে পূজিত হয়েছেন বলে মনে করি বাস্থলী হলেন প্রভু-মনসা, মহাদেবী নিত্যার পোস্ত-শিষ্ট অম্বুচরী-কস্তার মতো। নামটির ব্যাখ্যা দু-তিনভাবে করা যায়। এক, প্রাকৃত ও অর্বাচীন ‘বাস্থ’ শব্দ থেকে, মানে বালিকা, নবমুখতী। দুই, সংস্কৃত ‘বাস্থরা (বাস্তরা)’ থেকে, মানে রাজ্ঞী, বিশ্রামদায়িনী দেবী। তিন, বৈদিক ‘বাস্থা’ (বাস্থা)’, সংস্কৃত ‘বালিতা’ (বালিতা) থেকে, মানে “কথানিয়া পাই।” বাস্থলী নিত্য-দুর্গার সংযোগকারিনী দেবী, হৈমবতী-দুর্গার বালিকা-রূপ বলা যায়। এ দেবী ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত দুর্গা-চণ্ডী থেকে স্বতন্ত্র ছিলেন। বুদ্ধাবনদাস ও মুহুম্ব চক্রবর্তী দু’জনেই চণ্ডী ও বাস্থলীকে পৃথক দেবতা রূপে উল্লেখ করেছেন। বুদ্ধাবনদাস লিখেছেন, “বাসলীকে পূজয়ে কেহ নানা উপচারে”: “মঙ্গল-চণ্ডীর গীত”: “দুর্গোৎসব কালে বাস্ত



বাহুবীর ভয়ে।” সুকুমার চক্রবর্তী কবিকঙ্কণ দেবী বাহুলীর ‘সাগা’-রও (Saga) উল্লেখ করেছেন।

বর্ধমানে ধূলদত্ত তারে মানে বোল লত্ত

মহাকুল বাস্তোর প্রধান

বাহুলীর পূজা যদি দ্বাদশ বৎসর বন্দী

বিশালাকী কৈল অপমান।

—কে এই ধূল দত্ত যে সাত বোল অর্থাৎ একশবারো ঘর বেনের প্রধান, যে বাহুলীর পূজা প্রত্যাখ্যান করে বারো বছর কারাবাসের অপমান পেয়েছিল দেবীর হাতে? এ কাহিনী হারিয়ে গেছে। থাকলে ভাল হত। হয়ত এই গল্পের সাহায্যে এনিয়া মাইনরের নিত্য ও তাঁর অল্পচরী দেবীদের সম্পর্কের কিছু নূতন পাওয়া যেত।

বাহুলীর একটা নামান্তর ছিল ‘ইচ্ছাই’ (ইচ্ছা-আকাজ্জা, অর্থাৎ ইচ্ছামাতা)। এ নাম মিলেছে সেকালের নারীনামে এবং ‘ইচ্ছাই-ঘোষ’ নামে (= নিত্যানন্দ)। তাত্ত্বিক বৌদ্ধশাস্ত্রে ইনি “ইচ্ছা মহন্তরায়ী”, অর্থাৎ ইচ্ছা-ঠাকুরাণী।

তবে কবিকঙ্কণ এই সঙ্গে একটি মূল্যবান খবর দিয়েছেন। এ খবর থেকে বুঝতে পারছি যে পরবর্তীকালে বাহুলী হারিয়ে যাননি, নাম বদল করে ‘বিশালাকী’ হয়েছেন। বর্ধমান জেলায় অনেক গ্রামে ‘বিশালাকী’ প্রাচীন গ্রামদেবতা। এঁর মূর্তি নেই। হয় পাথরের টুকরো (উল্কা খণ্ড সম্ভবতঃ), নয় “বারি” (অর্থাৎ জলপূর্ণ ঘট)। ‘বিশালাকী’ মানে বার চোখে বিধ। অর্থাৎ দৃষ্টিযোগে চিত্ত হরণ করতে পারেন, প্রাণহরণও করতে পারেন। এই নামের মধ্যে দিয়ে মনসার সঙ্গে বাহুলীর পার্বক্যও জানা যাচ্ছে। মনসা সর্পবিষের ভাগ্যরী, নিজে বিষধারিণী নন, তবে বিষহারিণী বটেন। বিষবিকার দেবী বলে এর সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাচীনতম নাম হল ‘বিষহরি’।

চণ্ডী ও বাসলী যে পৃথক দেবতা তা বাহুলীর সেবক বড়ু-চণ্ডীদাসের লাক্যভেদেও পাই। সে কথা বলতে ফুলে গেছি। বড়ু চণ্ডীদাসের বাসলী যে দেবী চণ্ডী নন তা তাঁর উক্তি থেকেও ধরা যায়। হারাণকে পাণ্ডার অস্ত্র বড়াই রাখাকে উপদেশ দিয়েছিল চণ্ডীর পূজা মানসিক করতে (“চণ্ডীরে পূজা মানিখী”)। চণ্ডী হলেন হারা দেওয়ার দেবতা।

প্রকৃত-মনসা বলতে আমি বাহুলীকেই বুঝছি। এর সঙ্গেই Venus-এর অন্তরঙ্গ মিল। অর্বাচীন মনসার উৎপত্তি হয়েছে অজ্ঞা। তবে টানো বেনের কাছিনীতে প্রকৃত-মনসার মিথ মিশিয়ে আছে। কবিকল্প মনসার কাছিনীও জানতেন। তিনি উল্লেখ করেছেন চাম্পাইনগরবাসী বণিকদের প্রধান টানোর, “বার গৃহে ছয় বধু নিবসয়ে রাঁড়।”

### জন্ম

এইবার গোড়ার কথায় কিরে বাই। চণ্ডীদাসের একটি বাগান্নিক পদ শুক হয়েছে এই বলে,

‘নিত্যার আদেশে বাহুলী চলিল

সহজ জানাবার তরে ;

ভ্রমিতে ভ্রমিতে নারুর গ্রামেতে

প্রবেশ বাইয়া করে ।’

কবিতাটির ভাষা খুব প্রাচীন নয়, গাঁথুনিও অর্বাচীন। তবে বিষয় খুব প্রাচীন। মহাদেবী নিত্যার সেবিকা—সহচরী-কস্তা বাহুলী নিত্য-চণ্ডীর সেবককে সহজানন্দ হৃথের পরিচয় দিতে আদিষ্ট হয়েছেন মহাদেবী কর্তৃক। নিত্যার সঙ্গে ধোয়া পাখলার সম্পর্ক তা আগেই বলেছি বোগীদের প্রসঙ্গে। বাহুলী তাই উল্লিখিত হন “রজক-মিন্নারী” অর্থাৎ “রজককস্তা” হুতরাং “রজকিনী” রূপে। নিত্যার সেবক-সেবিকাদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক অজ্ঞান করতে পারি ব্যাবিলনের ইশতার সম্বন্ধে হেরোডোটাস (Herodotus) উক্তি অজ্ঞসারে। আর নারুর? এ নামটিও প্রাচীন এই ঐতিহ্য থেকে পরিকল্পিত মনে করতে পারি। সহজসাধনা আসলে নিরঙ্কুশ দৈহিক আনন্দের সাধনা। এ সাধনার পীঠস্থান হল নিত্যার নগর—নিত্যানন্দপুর>নন্দপুর। নন্দপুর শব্দ বা নামটিই শব্দবিকার সমস্ত সিঁড়ি পেরিয়ে এখনকার “নারুর” হয়েছে।

‘নিত্য’ নামটি হারিয়ে গেছে বটে কিন্তু রেশ রয়ে গেছে ‘নিতাই’ (<নিত্য-আর্থিকা, অর্থাৎ নিত্য ঠাকুরাণী) ও ‘নিত্যানন্দ’ এই নাম দুটিতে।

## দুর্গাপূজার বোধন কেন

যারা দুর্গাপূজা কখনো আগাগোড়া দেখেছেন তাঁরা জানেন যে সপ্তমী অষ্টমী ও নবমী ব্যাপী পূজা কাণ্ডের আগে একদিন অথবা অনেক দিন ধরে দেবীকে উদ্‌বোধনের অস্থান “বোধন” পূজা করতে বসতে হয়। এ পূজার আরোজন বংসামাত্র কিন্তু এ দুর্গা পূজার অপরিহার্য উপক্রমণিকা।

বারোয়ারি দুর্গাপূজার বোধন হয় শুধু বটীর দিনে। কোন কোন ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীগত কালধারাবাহিত পূজা অস্থানেও এক দিনের বোধন হয়। কিন্তু যেখানে দুর্গাপূজা বহুকাল ধরে বংশানুক্রমে ঘটে আসছে সেখানে বোধন হয় ছ দিন কিংবা তেরো দিন ধরে। বোধনের শাস্ত্রীয় নাম হল “কল্লারভ”। ‘কল্ল’ মানে বৈদিক প্রথাগত ধর্মঘটিত ক্রিয়াকাণ্ড ও উৎসব। (দুর্গাপূজা আসলে উৎসব।)। যেখানে তেরো দিন ধরে বোধন হয় সেখানে বলে “নবম্যানি কল্লারভ”। অর্থাৎ কুরুপক্ষের নবমী থেকে কাজ শুরু হয়েছিল শুক্লপক্ষের বটীর দিন পর্যন্ত। যেখানে বোধন হয় ছ দিন ধরে সেখানে বলে “প্রতিপদানি কল্লারভ”। অর্থাৎ মহালয়া অমাবস্তার পরদিন প্রতিপদ থেকে বটীর দিন পর্যন্ত। শুধু বটীর দিনে হলে বলে “বট্যানি কল্লারভ”। যারা পাঁচি ওলটান তাঁরা নিশ্চয়ই “বট্যানি কল্লারভ”, “প্রতিপদানি কল্লারভ” ও “নবম্যানি কল্লারভ” কথা তিনটি অবশ্যই জানেন। তবে তার তাৎপর্য হয়ত সকলে জানেন না। তাই এত কথা বলতে হল।

দুর্গাপূজা বছরে দুটি হয়। একটি শরৎকালে—আশ্বিন-কার্তিক মাসে, অপরটি বসন্তকালে—কান্টন-চৈত্র মাসে। বোধন অস্থান তা একদিনের হোক বা তেরো দিনেরই হোক—শরৎকালের পূজাতেই হয়, বসন্তকালের পূজাতে নয়। বসন্তকালের পূজার বটীর দিন সন্ধ্যার দেবীর অধিবাস হয়। সে প্রধানত ঘেরেলি কাণ্ড। তা শরৎকালের পূজাতেও হয়। এ অস্থানকে অনেকস্থানে “বেলবরণ” বলা হয়। পাজিতে “বিষকুম্বুলে দেব্যাঃ বোধনম্”।

বসন্তকালের পূজার বোধন নেই। শরৎকালের পূজার অতিঅবশ্য আছে। এ অলঙ্কারি ব্যাধ্যা পূজার ব্যবস্থাকারেরাই দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, যেহেতু শরৎকাল দেবতাদের রাজি (—আমাদের বছর দেবতাদের অহোঁরাত্র, যাব থেকে আবার পর্যন্ত ছ মাস দেবতাদের দিন-মান, জীবন

থেকে পৌষ পর্বন্ত হু যান দেবতার নিশাকাল—) সেইহেতু তাঁরা ঘুমিয়ে থাকেন। হু যানের ঘুম। হঠাৎ হাঁক ডাক করে তাঁদের ঘুম ভাঙালে ক্রুদ্ধ হতে পারেন। তাই ধীরে ধীরে দীর্ঘকাল ধরে পূজা প্রার্থনা করে দেবীকে আন্তে আন্তে আগাতে হবে। ঠিক যেমন করে সেকালের রাজাদের ঘুম ভাঙানো হত নরম স্বরে নানাই বাজিয়ে।

মাহুকের বছর দেবতার সারাদিন—এ কল্পনার আভাস যাত্রাও বেদে নেই। পূরণ ঘটয়িতারা এই কল্পনার উদ্ভাবক। এই কল্পনা অতুলারে তাঁরা বোধনের ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের কল্পনা থেকে বোধনের উদ্ভব হয় নি। এটা বড়ো তাৎপর্য-পূর্ণ ব্যাপার, দুর্গাদেবীর পূজা ইতিহাসের পক্ষে।

আসলে বৈদিক বাগবজ্ঞের দিনেও এমনি একটু বোধনের ব্যাপার ছিল এক দেবীর উপাসনার। সে দেবী হলেন উবা, বেদে উল্লিখিত দেবীদের মধ্যে সব চেয়ে স্তূতা, বদিও বজ্রকাণ্ডে তাঁর কোন স্থান ছিল না। অর্থাৎ তাঁর নামে হোমের কোন ব্যবস্থাই নেই বেদে। তবে বজ্রের বিধান সেকালে এবং সেকালের আগে থেকে খুবই ছিল। তাঁর প্রমাণ ঋগ্বেদের স্তূতগুলি। এ বজ্রগুলি থেকে বলা যায় যে উবাকে লোকে ধ্যান করত, উপাসনা করত সেই উদ্দেশ্যে যে উদ্দেশ্যে পরে দুর্গার পূজা করা হত। অর্থাৎ সেই দাও দাও। ধন দাও, যান দাও, পুত্র দাও, আয়ু দাও, “রূপং দেহি অয়ং দেহি বশো দেহি ষিষো অহি”। পুরুষেরা যেমন ময়েরাও তেমন উবার দোহাই দিত। তবে বৈদিক উপাসকেরা উবাকে আগাত না, উবার উদয়ের জন্য প্রার্থনা করত। উবাই অগত্বে আগাতেন। উবা উদিত হয়ে যেন জড়বৎ হুহু অগত্বে আগিয়ে যেন। অর্থাৎ বোধন ছিল দেবতার নয়—দেবতার দ্বারা অগত্বে প্রবোধন। বৈদিক কবির ব্যাকুল প্রার্থনা ছিল উবার উদয়ের জন্য।

নহ বামেন ন উবো বি উচ্ছা হুহিতবু দিবঃ ॥ ১. ৪৮. ১ ॥

—‘হে উবা, দ্যোয়ের কস্তা, শোভা সস্তার নিয়ে তুমি আরাধের কাছে প্রকাশিত হও ( অর্থাৎ সকাল থেকে । )’

উবার বোধন করবে কী? উবা তো সকলের আগে জেগে ওঠেন।

পূর্বা বিশ্বনাদ্ ভুবনাদ্ অবোধি ॥ ১. ১২০. ১ ॥

—‘বিশ্ব সংসারের আগে ( উবা ) জেগেছেন।’

উবার উপাসনা ধীরে ধীরে নানা বাক পেরিয়ে দুর্গাপূজার পরিণত

হয়েছিল। তবে উবার সঙ্গে দুর্গার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ পুরাণকারদের বেশ গোচর অথবা অল্পমানসম্মত ছিল না। তাঁরা প্রাচীন “বোধন” উপাশনাটি পেয়েছিলেন কিন্তু তার মর্মটি পান নি। সেই কারণে বোধন কাণ্ডের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে দেবতার দিন রাত্রি করনীর আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

শারদীয় পূজার বোধন আছে অথচ বাসন্তী পূজার বোধন নেই। এ কেমন করে হল? কেন হল?

উত্তর কঠিন নয়। দেবতা দুটি এক নয়, পৃথক। শারদী দুর্গা এসেছেন বেশ থেকে, উবার (ও উবার প্রতিরূপ বা ভগিনী রাজির) উত্তরাধিকার সূত্রে। উবা স্বর্, দেবতা, তাই তাঁর বাস হিমগিরিতে। এই সূত্রেই দুর্গা দেবীর সব চেয়ে পুরোনো নাম পাই ‘হৈমবতী’ অর্থাৎ ‘হিমবৎ-বাসিনী’। (এখানে কিছু বিদেশী প্রভাব থাকতে পারে। সে কথা পরে বলছি।)। বাসন্তী দুর্গা পৃথক দেবতা। ইনি জলদেবী বা নদী দেবতা। বেদে এ দেবতার কিছু কিছু ইঙ্গিত আছে। এ দেবতার ভাবনার ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে বিদেশী ঐতিহ্যের মিশ্রণ অনেকটা থাকতে পারে। পরবর্তী কালের পুরাণ কাহিনীতে এই জলদেবীর এক সংস্করণ জাহ্নবী হয়ে শিবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। উবার সঙ্গে বাসন্তী দুর্গার কোন প্রত্যক্ষ সঙ্গর্ষ নেই। তাই সে পূজার বোধনের স্থান নেই। যেটুকু হয়েছে তা শারদীয়ারই প্রভাবে। বাসন্তী দেবীর পূজাকে দুর্গা পূজা বলায় কোন অনায় বা অসঙ্গতি ঘটে না। দুর্গা মানে যে দেবী দুর্গম স্থানে বাস করেন, যাকে ধরা ছোঁয়া যায় না, যিনি দূর থেকে শাসন করেন, সাহায্য করেন। ইংরেজী করে বললে ঠিক বলা যায়, the unapproachable Goddess। এই ভাবে বিচার করলে আমরা কম বেশি তিনটি দেবীর উপাশনা (অর্থাৎ সামাজিক অঙ্গুষ্ঠান হিসেবে পূজা করি)—একই দেবতার তিন রূপ মনে করে। তিন জনেই দুর্গমস্থানবাসিনী, স্তবরাং দুর্গা। একজন হলেন হিমাচল পৃথিবাসিনী হৈমবতী পার্বতী দেবী, একজন হলেন ব্রহ্ম অথবা সমুদ্র-বাসিনী পদ্মাসনা কমলা (বা কমল-কামিনী) যার সঙ্গে দেবী মনসা মিলিয়ে আছেন। ইনিই বাসন্তী দুর্গা। আর একজন হলেন দুর্গম অরণ্যবাসিনী যাকে ঋগ্বেদের একটি অর্বাচীন সূক্তে দেবী অরণ্যানী বলে ডাক করা হয়েছে এবং পুরাণে বিদ্যাবাসিনী বলা হয়েছে। ইনি বনবাসিনীও বটেন, পর্বত-বাসিনীও বটেন—বিদ্যা অরণ্য ও পর্বতমালা দুইই। হিমালয় ও বিদ্যা

তারতবর্ষের দুই দিনক চিহ্ন-বহন পর্বত। এ দুই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাই হুবহুই পর্বতবাসিনী। স্তূতরাং ‘পার্বতী’ নাম দুই দেবীর পক্ষেই খাটে। পুরাণ থেকে জানা যায় যে দেবী বিদ্যাবাসিনী শবরদের পূজিতা ছিলেন। তারা মস্ত-মাংস দিয়ে অন্নোদান গান গেয়ে তাঁর নাচ করে তাঁর পূজা-উৎসব করত। এখনকার আমাদের দুর্গাপূজার প্রাচীন শবরোৎসবের অনেকটাই একদা ঢুকে গিয়েছিল। এখন তার চিহ্ন রয়ে গেছে শুধু পদ্মবলিদান কাণ্ডে আর মঙ্গলপূজার দেবীকে পশুর মাংস ও কুখির (এবং মদ্য ?) দানে।

অরণ্যাদী দেবী স্বতন্ত্রভাবেও টিকে আছেন কোথাও কোথাও তবে নিত্যন্ত কীর্ণভাবে এবং পাঁড়া গায়ের। হিন্দুরা তাঁকে বলেন, ‘বনদুর্গা’ (—হানীর অন্য নামও যথেষ্ট আছে।)। কোন কোন অঞ্চলে মুসলমান অধিবাসীরাও খাতির করেন এই দেবীকে ‘বনবিবি’ বলে।

শারদী দুর্গাপূজা বৈদিক উবা-উপাসনা থেকে এসেছে—এ ইঙ্গিত আগে দিয়েছি। কিন্তু এ দেবতার কল্পনার বিশেষের প্রভাবও বেশ কিছু আছে। সে কথা বলবার আগে উবার সঙ্গে হৈমবতীর মিল দেখাই।

একটা বড়ো মিল হল “বোধন” কাণ্ডে। তা আগে দেখিয়েছি। এ “বোধন” কাণ্ডে অপর দুটি দেবীর—বিদ্যাবাসিনীর ও বাসন্তীর বেলার খাটে না।

দেবী কর্তৃক বিশ্বসংসারের বোধন থেকে উপাসক কর্তৃক দেবীকে (চতুর্থ মণ্ডলে) বোধন পরিণতির আভাস স্বপ্নবেদেই মিলবে। একটি ঋক আছে এই কথা, কবি ঋষি বলছেন—

প্রতি স্তোমৈর, অতুংস্মহি।

—‘এই স্তব দিয়ে যেন (তোমাকে) জাগাই’।

সপ্তম মণ্ডলের একটি ঋক্ থেকে জানতে পারি যে দেবীর উবার বোধন স্তব বা গান প্রথম করেছিলেন বা গেয়েছিলেন বসিষ্ঠ বংশজাত ব্যক্তিরা।

প্রতি স্তোমেতিব্ উবসং বসিষ্ঠা

গীর্ভির, বিপ্রাঃ প্রথমা অবুয়ন্।

—‘হৃদয়ে গাথা বাণীতে স্তব করে উবাকে প্রথম জাগিয়েছিলেন বসিষ্ঠ-বংশীয় বিপ্রেরা।’

উবা হুন্দরী, হুবেশা, হু-অলতুতা। বখন তিনি উদিত হন তখন বোধ হয় যেন বা ঘেরকে লাড়িয়ে দিয়েছে—“মাতৃকৃটেব বোবা”। কেন উপনিষদে হৈমবতীর যে বর্ণনা পাই তা তো উবারই মতো—“বহশোভমানা”। আনাদের দুর্গা প্রতিমাও তাই—মাতৃকৃটেব বোবা, বহশোভমানা।

শারদী দুর্গা “দশ বাহ চণ্ডা” ও দশভূজা, ঋগ্বেদে কিরণময়ী উবার আবির্ভাব কালে তাঁকেও একবার দশবাহ বলা হয়েছে (“অন্তর, দশহু বাহবু”) তাঁর অন্ত বহুশ যে পোদ্গমধারিনী অরিত্তি (অর্থাৎ পৃথিবী) তাতেও একবার তাঁকে দশভূজা বলা হয়েছে (“পৃথিবী দশভূজিঃ”)।

শারদী দুর্গা বিশ্বমাতা। ঋগ্বেদে উবা দেবতাদের মা (“মাতা দেবানাম্”)।

শারদী দুর্গা মহিষাসুরকে, শুভনিভন্তকে বধ করে দেবতাদের উপকার করেছিলেন। ঋগ্বেদে একস্থানে বলা হয়েছে যে দেবী এগিয়ে এসে কৃক-বর্ণ কিছুতুকিমাকার ভরদরকে বাধা দেন।

বি তিষ্ঠতে বাধতে কৃকম্ অভ্যম্ ॥ ১.১১.৫ ॥

শারদীয়া দুর্গার যে প্রতিমা বছর বছর গড়ে পূজা করা হয় তাতে দেবীর মূর্তিতে নানারকম ভেদ দেখতে পাওয়া যায়। এ ভেদ হাতের সংখ্যায়, হাতে অস্ত্রশস্ত্রের অস্তিত্বে অনস্তিত্বে, অস্ত্র ও সিংহের অস্তিত্বে অনস্তিত্বে। একটা বিষয়ে কোথাও অমিল নেই। তা হল প্রতিমার মাথার উপরে চালের বা চালচিজের। কেন এ চাল? পূজা তো মন্দিরের মধ্যে। মন্দিরের মধ্যে তো অমন হাঁচা-চাল থাকে না। তবে কেন? কেন ছবি?

এ প্রশ্ন ইতিপূর্বে কোন পণ্ডিত ঐতিহাসিকদের মনে জেগেছে বলে জানি না। তবে আমার মনে জেগেছে। আমি তার উত্তরও খুঁজে পেয়েছি।

চাল হল মন্দিরের হাঁচা। চালচিজ আগলে হাঁচার চালের নীচের নকশা বা কাককাঁর্ব। লোকালের মাটির বাড়িতে এরকম হত। আর মাটির বাড়ির অল্পকরণে মন্দির গড়া চালু হলেও তাতেও হত। তবে সেখানে তো হাঁচা-চাল নেই। তাই সেখানে কাককাঁর্ব নকশা ছবি আঁকা হত মন্দির ঘাঘের উপরে, ঠিক চালচিজের স্টাইলে।

এরপর প্রশ্ন আগে কেন দেবীকে হাঁচার প্রদর্শন করিয়ে পূজা করা হয়?

এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের বিদেশী ইতিহাসের পাতা

কটোড় হবে। তবে দেবীর ইতিহাসে তার ইঙ্গিত যে নেই এমন নয়। সে ইঙ্গিত হল দেবীর ‘হারবাসিনী’ নাম। এ নামের ইঙ্গিত হরিবংশে আছে (‘হারটোলকবাসিনী’)।

আমরা যে হুর্গাপ্রতিমার পূজা করি তা হারবাসিনী দেবীর। হারবাসিনী দেবীর রত্নমূর্তির একটি পুরোনো ছড়া আছে মানিকগন্ডের চতীমন্ডলে। তাতে আছে এই ছত্র—

হারে বলে খাইছ মূর্তি চৌদ্দ ঘর পড়শী।

হারবাসিনীর ইতিহাস খুঁজতে গেলে এলিয়া মাইনরে যেতে হবে। সেখানে খুব প্রাচীন কাল থেকে (আনুমানিক ৩০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ) দেবতাদের মহা-মাতার (Great Mother of the Gods) পূজা প্রচলিত ছিল। পরে এই দেবতা ইণ্ডো-ইউরোপীয় ভাষা-ভাবী—সুতরাং আমাদের দূরদূরান্ত জাতি ফ্রীজিয়রা (Phrygians) গ্রহণ করে। এই দেবীকে তাঁরা ‘গেদান্ মা’ (সংস্কৃত ‘কমা’) অর্থাৎ পৃথিবী মাতা বলে পূজা করতেন। এই দেবীর খুব প্রাচীন মূর্তি পাওয়া গেছে। সে মূর্তি পাহাড়ের ঊপরে খোদাই করা। দেবী রয়েছেন তার মন্দিরের (বা গুহার) দরজায়। এ মূর্তি বৈদিক উবার সঙ্গেও দেখা যায়। উবা প্রকাশ করতেন আপনাকে রাজি-অন্ধকার রূপ গুহার দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থেকে। ঋগ্বেদের অনেক উবা স্তোত্রে এই ছবি আঁকা আছে।

আমাদের হুর্গাপ্রতিমাও এই স্তোত্রে পাওয়া—বেদ থেকে এবং/অথবা ফ্রীজীয় ঐতিহ্য থেকে। এ ঐতিহ্য যে আমাদের দেশে খ্রীষ্টীয় প্রথম শহস্রাব্দের গোড়ার দিকে রোমানদের সঙ্গে বাণিজ্যসূত্রে এসেছিল তার অনেক অবাস্তব প্রমাণ আছে।

দেবীর সিংহবাহিনীও আনাতোলীয় ফ্রীজীয় স্তোত্রে আগত। উমা ঈশ্বরবতী বা পার্বত্যের কোন পৌরাণিক উপাখ্যানে সিংহের উল্লেখ নেই। সিংহ আছেন দেবীর রথের বাহন রূপে অথবা পার্বত্যের রূপে এলিয়া মাইনরে প্রাপ্ত দেবীর মূর্তিতে। মুকুন্দ কবিকল্প তাঁর চতীমন্ডলে দেবী অন্তরা চতীর যে নামাবলী দিয়েছেন তার একটি হল ‘সিংহরথা’। এ নাম নিশ্চয়ই বিদেশ থেকে এসেছে। বেদে অবশ্য উবার রথের উল্লেখ আছে। তবে সে রথ চীনত ঘোড়ার অথবা গাই-গোকতে কিংবা বাঁকে। তাদের



রং ছিল লাল। (প্রাচীন ইণ্ডো-ইউরোপীয়দের সময়ে প্রথমে গোকই গাড়ি চানত, পরে খোড়াও ব্যবহৃত হয়েছিল)।

আমাদের দেশে এসে দেবী রথ ছেড়ে দিয়ে সিংহের পিঠে চেপে-  
ছেন। এই পরিবর্তনের একটু ইঙ্গিত দিয়েছেন কালিদাস রঘুবংশের  
দ্বিতীয় সর্গে। রাজা দিলীপ পূজকাম্যার গুরু বশিষ্ঠের আজন্মে গিয়ে  
তপস্বী করছেন। তপস্বী আর কিছু নয়, শুধু দিনভর গুরুর গোক  
চরানো। হিমালয়ের পাদদেশে এক গুহার একদিন গোকটি ঢুকেছিল।  
সেই অপরাধে এক সিংহ এসে গোককে আক্রমণ করে। তখন দিলীপ  
নিজের দেহ দান করে গুরুর গোকর মুক্তি চাইলেন। রাজার এই মনোভাবে  
খুলি হয়ে সিংহ নিজের স্বরূপ অভিব্যক্ত করলেন। তিনি আর কেউ  
নয়, গৌরীর অঙ্গুগৃহীত পাদপীঠ নিকৃষের মিত্র কৃন্তোদর। গৌরীর  
অঙ্গুগৃহীত পাদপীঠ এই কথাটি থেকেই সিংহবাহিনী দেবীর প্রাচীনতর  
রূপ গান-মা-এর ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। আনাভোলিয়ার প্রাপ্ত কোন  
কোন মূর্তিতে দেবীর উচ্চ সিংহাসনের পাশে সিংহ শুয়ে আছে।  
আমাদের দেশে পশু মূর্তিতে দেবীর পদ্মাসনে অথবা পাদপীঠের নীচে  
উপবিষ্ট সিংহমূর্তি দেখা যায়।

খুব সম্প্রতি গোরায় কতকগুলি প্রাচীন (আবিষ্কারীরা অজ্ঞান  
করেন খ্রীস্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে লিখিত) শিলালিপিও আবিষ্কৃত  
হয়েছে। কয়েকটি গুহার শিবমূর্তি—অর্থাৎ শিবলিঙ্গ বিনষ্ট হয়েছে।  
একটি গুহার শিবলিঙ্গের মাথাটি সিংহমুখাকৃতি। এই প্রাচীন  
শিলালিঙ্গটির আবিষ্কারের মূল্য ইতিহাসের পক্ষে অপরিণীম। এটি শিব-  
লিঙ্গ নয়, এটি সিংহলিঙ্গ। সম্ভবত দেবীর প্রতীক। (যেমন গরুড়লিঙ্গ  
বিষ্ণুর প্রতীক)। দেবীর শক্তির প্রতীক সিংহ (যেমন বিষ্ণুর শক্তির  
প্রতীক গরুড়)। তাহলে এখন আমাদের দেশে বা বরাবর পূজা পেয়ে  
আগছে সেই শিবলিঙ্গের অন্তত দুটি পৃথক্ উপাস্তি স্বীকার করতে  
হয়। প্রথম হল লিঙ্গ। লিঙ্গপূজার প্রাচীনতর ইতিহাস আনাভোলিয়ার  
ঐতিহ্যে লভ্য। রোমান ইতিহাসেও তার গভীর ছাপ আছে। তারপর  
হল এই সিংহলিঙ্গ। প্রাচীন ইতিহাসবেত্তারা জানেন যে কোন কোন  
প্রাচীন শিবলিঙ্গে মূখ আঁকা দেখা যায়। কেন এই মূখ—এ প্রশ্নের  
একটা উত্তর হচ্ছে যেনে, এ মূখ শিবের, স্বভাবাৎ এটা যেন লিঙ্গতে

শিবের নই। কিন্তু তাই বা হবে কেন? “মুখশিব” তো অত্যন্ত  
অর্থোত্তিক ও অস্বাভাবিক। এই যে গ্রন্থ তার কোন উত্তর দেলেনি আছে,  
তার উত্তর মিলছে সিংহনদের আবিষ্কারের কলে। মুখশিব এল মুখন  
থেকে, আর এই মুখন এল সিংহন থেকে। তবুও এ উত্তরে একটু  
খিঁচ রয়ে যায়। কী কারণে সিংহের মুখ শিবের মুখে পরিণত হল?  
কী পথে?

এ খিঁচ সরিয়ে দেওয়া যায় একটু ভেবে দেখলে। শিব ঈশ্বর—পরমেশ্বর, কিন্তু তিনি উপাসক, “বোঙ্গী”। বোঙ্গী মানে অন্তরঙ্গ পরিচারক, যিনি ঐশ্বর ব্যক্তিগত বোগানদার, হুতরাং তিনি উপাসকও। আনাতোলিয়ার মহাদেবীর বা পৃথিবীমাতারও এমনি ঘনিষ্ঠ সেবক-পুরোহিত ছিল। বোঙ্গী শিবের মূলস্থান সন্ধান করতে হলে সেখানকার ঐতিহ্য অন্বেষণ করতে হবে। লিংহও এক হিসাবে দেবীর ঘনিষ্ঠ সেবক ছিল। তাই পরবর্তী কালে লোককল্পনার—হয়ত বা পূজকদের ভাবনারও—কখনো কখনো বাহন লিংহ আর বোঙ্গী ভূত্যা মিলে গিয়ে এক হয়ে পড়েছিল। এই ধারণার কালে লিংহধ্বজ মুখধ্বজে মুখলিঙ্গে পরিণত হয়েছিল ( শুধু লিঙ্গও ধ্বজরূপে পূজিত হত। আমাদের দেশে এখন পর্বত তার অবশেষ চিহ্ন আছে—চড়কে। চড়কগাঁহ বিচ্ছিন্ন লিঙ্গের প্রতীক। এ লক্ষ্যে কিছু আলোচনা আগে অন্তর্ভুক্ত আমি করেছি।)। আমার এই অহুমানের সমর্থনে সংস্কৃত শব্দকোষ থেকে প্রমাণ উপস্থাপিত করতে পারি। সংস্কৃত অভিধানে লিংহের এক বিশেষণ নামান্তর হল পকাল্য বা পকানন—মানে পাঁচ (অর্থাৎ বিদ্যুত প্রকাণ্ড) মুখো। আমার “পকবজ্র” “পকানন” শিবকেও বোঝায় ( শিবের পঞ্চমুখের যে পুরাণে গল্প আছে তা অর্বাচীন এবং তা পকানন বিশেষণ নামেরই ব্যাখ্যা হিসাবে তৈরি।)। শিবের মাথায় পাকানো কুঁটি (“কপর্দ”) অথবা জটা এবং মুখভরা দাড়িগৌক। হুতরাং দেখতেও কতকটা লিংহের মতো। এই ভাবনার বশেই পণ্ড-ভূত্যা আর বোঙ্গী-ভূত্যা এই নামটির মধ্যে দিয়ে এক হয়ে গিয়েছিল।

একটু আগে যে কথা বলেছি তার সংশোধন করতে হচ্ছে। আমি বলেছি যে গোরার প্রাচীন জাহার প্রাপ্ত সিংহী মুখ "শিবলিঙ্গ"টি সিংহলক এবং এটি নভবত দেবীর প্রতীক। নভবত কথাটি ভুলে গিয়ে হবে। এটি যে দেবীর প্রতীক সে বিষয়ে নিশ্চয়তা পেরিয়েছি হরিবংশ থেকে। হরিবংশে

(২. ১০৭) দেবীকে বর্ণনা করা হয়েছে নিম্নে বর্ণন (অর্থাৎ নিম্নবর্ণনা) এবং “নিম্নপ্রবন্ধকেন্দ্র” বলে। শেষ কথাটির মানে নিম্নবর্ণনা (দেবী)।

নিম্নবর্ণন ছিল শারদা (হৈমবতী পার্বতী) দেবীর। বিদ্যাসাগরী (অরণ্যানী-পার্বতী) দেবীর ছিল বহুবর্ণন। আর বাগতী (কবলা-বনলা) দেবীর ছিল নাগবাহন অর্থাৎ নাগবর্ণন। নাগ মানে হাতি, বকর, নাগ—অর্থাৎ ভীষণ অলম্ব (ইংরেজীতে Sea Monster)।

---

## হরি-হর, সাদা-কালো দেবতা ও তিন কালী

আমরা জানি হরি বিষ্ণু-কৃষ্ণের নামান্তর, হর শিবের। কিন্তু কেন এ নাম ?

এ প্রশ্নের উত্তর সোজা হরির বেলায়। হরি শব্দটি প্রাচীন। এটি বেদে আছে, আবেস্তায়ও আছে। বেদে-আবেস্তায় নামটির—আনন্দে বিশেষণটির—মানে ছিল, ব্রাউন রঙ, হলদে, অমির্ষ, মধুরতা ও লব্ধকাল। মধু, সোমরস, বজ্রাগ্নিশিখা ইত্যাদির বিশেষণ ছিল। তার থেকে ঘোড়ার মতো জন্তর ও ইজের মতো দেবতারও বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হত। আবেস্তায় পাওয়া গেছে সোমের অর্থাৎ দেবতার। সোমরসের বিশেষণ হিসেবে ( “হওম. জইরে”—হে সোম হরে ! )।

কণ্ঠবেদে বিষ্ণু অক্ষর মধুভাণ্ডারের অধিকারী ব্রাহ্মণে তিনি অধিবেদ বজ্র পুরুষ। মধুর রঙ হরি বজ্রাগ্নির বর্ণও হরি। হুতরাং বিষ্ণুর হরি নাম সহজেই এসে গিয়েছিল। কালক্রমে মাধব বিষ্ণু বধন কৃষ্ণে পরিণত হলেন ( মদীর কৃষ্ণবিষ্ণু কথা প্রবন্ধ ঐউবা—চতুর্থ ১৩৮০। ) তখন হরি কৃষ্ণকেও বোঝাতে লাগল। হরিবংশ এই গ্রন্থ নামটি—মানে ‘হরির গাথা’—কৃষ্ণকেই বোঝাচ্ছে বিষ্ণুর সম্পূর্ণ উত্তরাধিকারী রূপে। এই নামটি গোড়া থেকেই বৈষ্ণবদের খুব প্রিয় হয়েছিল। তার কারণ নামটির একটি বিশেষ ব্যুৎপত্তি কল্পনা। সংস্কৃতে হু ধাতুর মানে হরণ করা যিনি অল্পমত ভক্তের হৃৎ-দৈন্ত-পাপ হরণ করেন তিনিই হরি। ( যেমন হু ধাতু থেকে তরি, ‘হু’ ধাতু থেকে তার তেমনি। ) ঈশ্বরের নাম এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে ?

হরের বেলায় উত্তর দেওয়া সহজ নয়, জানি না কেউ আবার আগে এ সমস্যার আলোচনা করেছেন কিনা। ধারা শাস্ত্রপাহী তাঁরা বলবেন এর উত্তর তো সোজা। হরির মতো হরও তো ‘হু’ ধাতু থেকে উৎপন্ন—হুতরাং হরির বা অর্ধ হরের তাই হবে না কেন ? ( তুলনা করুন চলতি গল্প ‘হরি হরি হরি ? হর হর হর ! ’ )

এ ব্যাখ্যা শব্দবিভার দিক দিয়ে আমি মানতে প্রস্তুত নই। ‘হর’ শব্দটি বেদে নেই। আছে পরবর্তী কালের রচনার। অধিকারী, কালেক্টর বলে শিবের ‘হর’ নাম স্বীকৃত হয়েছে আখ্যায়ন-পুঁথ্যগ্রন্থে ( ৩ অঙ্ক )।

এই অর্থ স্বীকার করলে ‘হর’ শব্দকে বৈদিক ‘হরন্’ শব্দের সঙ্গে সন্ধান করা যায়। তাহলে নামটিকে বৈদিক কোশল দেবতা রত্নের নামান্তর বলে নেওয়া যায়।

## তুই

ঋগ্বেদে কালো রত্নের একটি নাম দেবতার উল্লেখ আছে। তিনি হচ্ছেন নক্‌ত্‌, (‘রাজি’), রজনী (‘চন্দ্রতারার রাজি’) ‘রাজী, কুকী (‘কালো মেয়ে’)। এর প্রতিরূপ বা অধাংশ হল অরবী (‘অরুণবর্ণ দেবতা’) অর্থাৎ দিবা হার মুখ হল উবা (‘সূর্যোদয়ের প্রাক্কাল’)। বৈদিক কবিতাবনার কুকী আর অরবী বয়স ভগিনী রূপে কল্পিত হয়েছে। এই বয়স দেবতার কোন পূজার ব্যবস্থা ঋগ্বেদে নেই তবে স্তব আছে। এ কথা অস্বাভাবিক করার যথেষ্ট হেতু আছে যে, এ তুই বয়স দেবতার পূজা বেদের কালে সাধারণ লোকসমাজে প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদে উবার উপাসনা থেকে যে পরবর্তীকালে দুর্গা পূজার উৎপত্তি হয়েছিল তা আমি আগে কটি প্রবন্ধে দেখিয়েছি। (দুর্গা পূজার বোধন কেন?—বঙ্গিনীবার্তা ১৩৮৬)। রাজী বা কুকী দুর্গার সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। কী কাজে তা বলছি।

নক্‌ত্‌-উবা, কুকী-অরবী ঘোড়া দেবতাবনা হলেও এর উৎপত্তি যে এক দেবতাবনা থেকে হয়েছিল সে অস্বাভাবিক পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ঋগ্বেদে। আসলে দেবতা হলেন নক্‌ত্‌, কুকী—রাজির সর্বভীষের কর্মবিয়তি ও বিজ্ঞানের কাল কবিতাবনা নির্ভর আশ্রয়-আরামের আবাস, অন্ধকার গুহা, বেখানে কোন অশান্তি উপজব আসতে পারে না। এই আরাম-আশ্রয় আবাস বৈদিক কবির কল্পনায় দেবমাতা অদ্বিতীয় ঐতীক। রাজিবেলার বিশ্বজগতের সর্বভীষ গুহার বিজ্ঞান করে। সকাল হলে অদ্বিতি গুহার দ্বার খুলে দেন। সকালে—দ্বিগত চতুঃপদ নিজের নিজের কাজে—ধোঁয়াড়-মুক্ত গোকর মতো চরতে বেরিয়ে পড়ে। উবা হল রাজিগুহাঘর মোচনকারিণী অদ্বিতীয় প্রসন্নবদন। তাই ঋগ্বেদে কবি বলেছেন, উবা “অদিতের্ অনীকম্”। অর্থাৎ অদ্বিতি যখন অন্ধপুরে—গুহার ভিতরে থাকেন, যখন তিনি গুহাধরুপিনী—তখন তিনি রাজিকুকী, যখন তিনি বাইরে আসেন তখন তিনি উবা-অরবী।

পার্বতী-দুর্গা-চণ্ডীর মধ্যেও এই কুকী-অরবীর দ্বিধ্বয় সন্ধান পাই। পার্বতী দুর্গা গুহাঘর মধ্যে থাকলে তিনি কালী, গুহাঘরে অর্থাৎ গুহার বাইরে থাকলে

তিনি গৌরী। জনসমাজে পূজা পাবার জন্যে দেবী গুহামুখেই থাকেন গৌরী-রূপে। তাই তাঁর একনাম দ্বারবাসিনী। হুর্দার এই দ্বারবাসিনী গৌরীরূপেই আমরা পূজা করি।

দেবীর এই তিতরেঁ কালো বাইরে নাচা রূপের উল্লেখ মার্কণ্ডের-পুরাণে দেবীর কাহিনীতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। শুভ-নিশুভ বধের আগে দেবী পার্বতী দেবতাদের দ্বারা শুভ হয়ে তাঁর অধিকা বরুণ (গৌরীরূপ) প্রকট করলেন তখন দেবতাদের মনে হয়েছিল তাঁর দেহ থেকে অধিকা সত্তা বেরিয়ে আসবার পর যে খোলস দেহ রইল তা কালী হয়ে গেল। (অর্থাৎ কৃষ্ণী অংশ গুহার পরিণত হল।) মার্কণ্ডের পুরাণের এই অংশ (৮৫ অধ্যায় থেকে) উদ্ধৃত করছি।

দেবতারা শুভ ও নিশুভর কাছে পরাক্রান্ত হয়ে হিমালয়ে গিয়ে সকলে ঘিলে দেবী বিষ্ণুমারাকে স্তব করতে লাগলেন। এই সময় দেবী পার্বতী সেখানে এলেন প্ৰকার স্নান করবার উদ্দেশ্যে। তাঁদের স্তব করতে শুনে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এখন কার স্তব করছ? বলতে বলতেই তাঁর শরীরকোষ থেকে বেরিয়ে এসে শিবা (অর্থাৎ দেবী কল্যাণী) বললেন—দৈত্য শুভ ও নিশুভ দ্বারা পরাস্ত দেবতারা আমারই এই স্তব করছে। সেই পার্বতীর শরীরকোষ থেকে নির্গত হয়েছিল বলে তাঁর অধিকা (অর্থাৎ তরুণী দেবী) নাম। তারপর থেকে সমস্ত লোকে কোশিকী (অর্থাৎ শুটি থেকে বেরনো) বলে গীত হচ্ছেন। তিনি (অর্থাৎ অধিকা) বেরিয়ে গেলে পর সেই পার্বতীও কালো হয়ে গেলেন। হিমালয়স্থিত তিনি কালিকা এই নামে কীর্তিত হয়ে আসছেন। (ইতিক্রম্যমতিং দেবা হিমবীজং নগেশ্বরম্। জগৎসুত্র ততো দেবীং বিষ্ণুমারীং প্রভুঃকুর্বু...এবং ত্বাদি মৃত্যুনাং দেবানাং তত্র পার্বতী। দ্রাক্ষমত্যাধর্ষো তোয়ে জ্যাহ্বা নৃপনন্দন। সাদ্রবীং তান্ স্বরান্ স্বজুর্ভক্তিঃ শুরতেহর কা। শরীরকোষতচ্চায়াঃ পার্বত্যানিঃস্থতাদিকা। কৌষিকীতি সমস্তেনু ততো তত্রাং বিনির্গতারাং তু কৃষ্ণাকুং স্যামি পার্বতী। কালিকেশতি সমাখ্যাতা... )।

এই কাহিনীটুকুর অভ্যন্তর ঐতিহাসিক মূল্য আছে। পার্বতী হলেন পর্বত-বাসিনী দেবী, থাকে কঠ উপনিষদে বলা হয়েছে হৈমবতী উমা, থাকে পুরাণে বলা হয়েছে দেবী শারদা (অর্থাৎ হৈমবতী)। কপ্তবধের বর্ণনার দেবী হলেন আসলে গুহাবাসিনী আশ্বরদাজী অঙ্ককারের—রাজির দেবী। তিনি প্রকাশ হন উবা রূপে। মার্কণ্ডের পুরাণের সঙ্গে ঐক্য তাই। দেবতারা যেন স্ব

করছিলেন দেবদাতা অধিভির উদ্বাহারে বসে। উহার ভিতর থেকে তরঙ্গী উবা বেরিয়ে এলেন। শিহনে পড়ে রইল অন্ধকার গুহা। ইনিই কুকী নকুত্‌ ।

বৈদিক ভাবনার এই আপাত কিরে বাজার বাপারে পরবর্তী কালের লৌকিক ভাবনার ছাপ থাকতে পারে। আমাদের প্রাচীন অনেক কাহিনীতে “কালী গৌরী—দুটি মাতৃ”র উল্লেখ পাই। তার ছাপও এ কাহিনীতে অল্প-বহু পড়তে পারে। কিন্তু বৈদিক নক্সাবানার ছবিও তো “কালী গৌরী” দুটি মেয়ের চিত্র। রাত-দিনের ওই রকম নারী-রূপাঙ্গ মানবচিত্তার একটি প্রাচীনতম কল।

অনেক পরবর্তী কালে, তবে প্রথম খ্রীষ্ট শতাব্দীর আগেই আর দুটি নানা-কালো নারীদেবতা অল্পবিস্তর প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এঁরা হলেন হিমালয়-জাতা দুটি প্রারম্ভিক নদী (এই ভাবনার বশেই একটির নাম বমুনা। কথাটি আললে গঙ্গা বমুনা, অর্থাৎ বহন দুই গঙ্গা নদী)। বমুনা কালো অর্থাৎ বমুনীর জল দীপাত বা কালচে, গঙ্গার জল সাদা বা ঘোলাটে। বমুনীর প্রতিষ্ঠা কম হয়েছিল, যেহেতু এর অপর পারে দেশের যে বৃহত্তর ভূখণ্ড ছিল তা প্রায়ই ভুল ফুরি, সেখানে ব্রাহ্মণ্য অর্থাৎ বৈদিক বাগবক্তের—ভেমন রমরমা ছিল না। গঙ্গার তীরে তা ছিল। তাছাড়া গঙ্গা অনেক বেশী পলিমাটি কেনে এনেছে, বার কলে গঙ্গাবিধৌত অকলে চাববাবের কাজ খুব ভাল ভাবেই চলত। উত্তর ভারতের “কবিসংকৃতি”র বাস্তবত্বই হল গঙ্গা-বমুনীর উপত্যকা, তাতে গঙ্গার বান বমুনীর চেয়ে বেশী। গঙ্গার দেবীতে পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটেছিল আত্মনানিক দশম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে। তখনই গঙ্গাজলের মাহাত্ম্য দশম শতাব্দীর মহিমা ছাড়িয়ে গিয়ে বিজয় পাদোদকের মাহাত্ম্য পেয়েছিল। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর পর থেকে গঙ্গামাহাত্ম্য ভারতবর্ষের মনপ্রাণের একোয় একটি চুচুতম বস্তু-রস্মি হয়ে আছে।

এসকলকে পাঁচমবন্ধে একটি মেয়েলি আচার-অভ্যুতানের কথার উল্লেখ করা যায়। কালীপূজার রাজিতে কোন কোন অকলে মেয়েমহলে লক্ষী-অলক্ষীর পূজা হয়। দুইই শিটুগিতে গঙ্গা খেলার পুতুলের মূর্তি। তবে লক্ষীর রঙ সাদা, অলক্ষীর রঙ কালো। এখানে আললে গাছি আমরা কুকী-অলক্ষীর, কালিকা-দৌরীরই এক সংকরণ।

এইবার সাদা-কালো পুরুষ দেবতার কথা বলি।

কৃষ্ণ-বলদেব কালো-সাদা। কৃষ্ণের রঙ যে কালো, তা তার নাম থেকেই বোঝা যায়। কৃষ্ণ শব্দটির অন্ততম মৌলিক অর্থ, বা ইউরোপীয় অন্ততাবারও সমর্থিত, তা হচ্ছে কালো। কিন্তু বলদেব সাদা হলেন কেন? কৃষ্ণের বৈপরীত্য? সেটা সত্ত্ব আর একমিক থেকেও। পৌরাণিক কাহিনীর কৃষ্ণ-বলদেব যে বৈদিক দেবতা অশ্বিনের পরিণতি সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। উক্তির পুরোনো কাহিনীতে এঁরা—জমরাধ-বলরাম হলেন অশ্বারোহী দুই বোঝা, একজনের ঘোড়ার রঙ কালো, আর একজনের ঘোড়ার রঙ সাদা। ঋগ্বেদে অশ্বিনের নাম ছিল দম ও নাসত্য। এঁরা মাহুকের আভিহর দেবতা, এঁরা “হারা দেওয়ান, মরা বাচান”। এঁরা আবার দেবী উবার অহুচর-স্বহুও বটেন। ইউরোপীয় পুরাণকাহিনীতে এঁরা দুটি যমজ তার।

মনে হয় একটি হ’ল সন্ধ্যাতারা, কৃষ্ণ—নকংকরীর পুরুষ প্রতীক, অপরটি হল বলদেব—উষা-অরুণীর পুরুষ প্রতীক। কৃষ্ণ হলেন বৈদিক দম (অর্থাৎ খুব কালের লোক), আর বলদেব হলেন বৈদিক নাসত্য (অর্থাৎ বিলাসী পুরুষ)। কৃষ্ণের ব্রজলীলার যে কাহিনী আমরা পেয়েছি তা পরবর্তী কালের। সেখানে বলদেবের চিত্র খুব কিকে হয়ে গেছে এবং তাঁর গুণাবলী কৃষ্ণে সঞ্চারিত হয়েছে। এখন কৃষ্ণ-বলদেবে দুজনের বৈপরীত্য দেখাচ্ছি।

কৃষ্ণ রাজিতে বাস করেন, বলদেবের রাসলীলা দিনে। কৃষ্ণ গোপনে বাঁশি বাজিয়ে নিভুতে রাখাকে নিয়ে আসেন। বলদেব প্রকাশ্যে টেনে আনেন যমুনাকে। বলদেব দিনের ঠাকুর, তাই তিনি সকালে গোক চরাতে যান। (কৃষ্ণকে তিনিই ডেকে নিয়ে যান। আর কৃষ্ণ রাজির দেবতা, তাই তিনি সন্ধ্যায় গোক কিরিয়ে আনেন গোটে অর্থাৎ কৃষ্ণীর কুলারে)।

তাছাড়া বলদেবের সাদা হওয়ার আর একটা কারণ থাকতে পারে। তাঁর উপরে—যে কোন কারণে হোক—শিবের সাদৃত্ব ও সাদর্ভ্য এসে পড়েছে। শিব সাদা (কেন তা পরে বিবেচনা করছি), তাঁর ভূষণ সাপ, তিনি নেশাভোগ করেন। বলদেব—সর্পাঙ্গী, শেষ নাগের স্বরূপ, তাঁর রাজধানী জলের তলায়, সাপের ঘেঁষে। তিনি মত্ত। শিবের প্রতীক লিঙ্গ, বলদেবের অস্ত্র সাদল। শিবের একটিমাত্র কান্ডা—পার্বতী। বলদেবেরও একটি মাত্র কান্ডা—বারুণী (দেবতী)।

হিন্দুধর্মের প্রধান দুই পুরুষ দেবতা বিষ্ণু-শিব হলেন কৃষ্ণ-বলদেবের



মতোই কালো ও সাধা। বিষ্ণু কালো, যানে ভ্রামর, আকাশের রঙ বলে। বিষ্ণু সর্বব্যাপী, সবদিক্ দিয়ে আছেন, তিনি আকাশ। কিন্তু শিব? তিনি কেন সাধা?

শিবের ব্যাপার বিষ্ণুর মতো সরল সহজ নয়। বিষ্ণু সবান্নি এসেছেন বেদের থেকে। শিব তেমনি আসেনি। তাঁর মধ্যে অনেক দেবভাবনার মিশ্রণ ঘটেছে। ঋগ্বেদের দেবতা রুদ্র অংশত শিব, পুরোপুরি নয়। অর্বাচীন বেদের—ব্রাহ্মণ গ্রন্থের—দেবতা রুদ্র, বাঁকে দেবতার। সৃষ্টি করেছিলেন নিজের নিজের অংশ দিয়ে (—যেমন করেছিলেন মহিষাশুর বধের জন্য দেবীকে—) তাঁর বিশেষ নাম হল ‘দৃতমর’ বা ‘ভব’। অবৈদিক দেবতা বোধী শিব বৈদিক দেবতা দুটির সঙ্গে মোটেই সংগত নয়। একবারেই মিল নেই বলা কুল হবে, কেননা মিল কিছু ঘটেছে। তবে পরবর্তীকালে।

ঋগ্বেদে কিছু কিছু ভাঙ্গা ভাঙ্গা দেবভাবনা আছে। তার মধ্যে একটি হল ‘বাস্তোস-পতি’ অর্থাৎ বাস্তদেবতা, গেরস্থালির ঈশ্বর। ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলে (৫৪) বাস্তোস-পতির একটি স্তব (শ্লোক) আছে। পরের শ্লোকের প্রথম ঋকেও এর উল্লেখ আছে। কিন্তু ঋগ্বেদে এর সঙ্গে রুদ্রের অথবা অস্ত্র কোন দেবতার যোগাযোগ উল্লিখিত নেই। তবে তৈত্তিরীয়-সংহিতার বাস্তদেবতাকে রুদ্রের নামান্তর বলা হয়েছে।

পরবর্তীকালে লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানে বাস্তদেবতার মাহাত্ম্য স্বীকৃত হয়েছে, পূজাও চলিত হয়েছে। প্রাচীন ভারতের চৈতাপূজা একটি বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল। এ পূজা প্রকারান্তরে বৌদ্ধ ধর্মেও স্বীকৃত হয়ে এসেছে। কামতা-কামরূপ অঙ্কনে এখনও বাস্তদেবতার নামটি বিলুপ্ত হয়নি, ‘বার্থো’ রূপে রয়ে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এ দেবতা ও পূজা এখন বিলুপ্ত। তবে ‘বাস্তবাবা’র স্বীকৃতি আছে ডিটা-বানী প্রাচীন গোখরো সাপে।

লৌকিক আচারে বাস্তদেবতার প্রতীক ছিল পূর্বপুরুষের সমাধিস্তূপ বা সমাধি সৌধ বা সমাধি স্তম্ভ। এই তিন বস্তু সাধারণত চুনকাম করা হত। তাই থেকে শিব হয়েছেন খেতকার। স্তম্ভ একরিকে হয়েছিল ভিত্তি-স্তম্ভ, মূলস্তম্ভ বা পুরোনো বাংলার ‘জাঠি, জাঠা’। আর একরিকে হয়েছিল বহনকারী লম্বা, বিধ বা শেখ। এই প্রসঙ্গে বাণভট্টের একটি শ্লোক বা অনেক শৈব রাজার শাসনশব্দে উদ্ধৃত দেখা যায় তা স্মরণীয়। শ্লোকটি চমৎকার রচনা।

নমস্ তুভ্যশিবচ্চুৰিচজ্ঞচামরচারবে ।

জৈলোক্যনগরারভুলতত্তার শক্তবে ।

“নমস্কার ( করি ) শঙ্করে, ধীর উচুমাধা চক্রকিরণের চামরে বলমল,  
যিনি ত্রিভুবনরূপ নগরপরিগরের ভিত্তিতত্ত ( স্বরূপ )।”

আমাদের এখনকার শিবভাবনার অনেকগুলি খেই এসেছে এই বাস্তবাসু  
পতি ভাবনা থেকে। যেমন, মূলকার, লামা, রঙ চিত্তাভবলপ ও মণ-  
ভূষণ। এইখানে উল্লেখ করি যে মূলতত্ত্বের সঙ্গে মণের যোগাযোগের স্পষ্ট  
প্রমাণ মিলেছে। আসাম অঞ্চলে প্রাপ্ত একটি পূজা তত্ত্বের গারে জড়ানো  
লাপের প্রতিকৃতি আছে। ( মংসম্পাদিত, এগিরিটিক সোসাইটি প্রকাশিত  
বিপ্রণাসের মনসামল্লের ভূমিকা জটয়া। )

### তিন

দেবী কালী একজন নন, অন্তত তিন জন ছিলেন। দুজনের উল্লেখ লামা-কালো  
দেবতার আলোচনায় ধরা পড়েছে। এ দুজনের একজন হলেন ঋগ্বেদের  
নকৃৎ-কৃকী, যিনি পৌরাণিক মহাদেবীর খোলসের মতো। শুভ নিশ্চয় বধের  
কাহিনীতে যিনি উল্লিখিত হয়েছেন ‘কালিকা’—অর্থাৎ কালো-মেয়ে রূপে।

দ্বিতীয় কালী বেরিয়ে এসেছিলেন মহাদেবীর (—অধিকা, চণ্ডী—) লমার  
থেকে। শুভনিশ্চয়ের সেনাপতিস্বর চণ্ড ও মণ্ড বধন দেবীর বাহিনীকে  
হারিয়ে দিচ্ছিল তখন দেবীর ক্রোধ যেন কালীর বীভৎস মূর্তি ধরে বেরিয়ে  
আসে ও চণ্ডমণ্ডকে হত্যা করে। এই দ্বিতীয় দেবী কালী—আমাদের এই  
নামে অধুনা পূজিত দেবতা—“মহাদেবীর লমার” থেকে বেরিয়ে এসেছিল।  
মার্কণ্ডেয়-পুরাণ থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করছি ( অধ্যায় ৮৭ )

ক্রকুটীকুটীলাং তত্তা লমার্কলকাদ্ ত্রুতম্ ।

কালী করালবদনা বিনিক্রান্তসিপাশিনী ॥

বিচিহ্নখট্টাধরা নরমালাবিকৃষণা ।

বীপিচর্মারিধীনা তুচ্ছমাংসাভিভৈরবা ।

অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা ।

নিমগ্নরক্তনরনা নাদপুরিতদিগ্ধৃষা ॥

তার তুরকৌচকানো কপাল থেকে অমনি বেরিয়ে এল কালী। তার  
মুখ ভয়ঙ্কর। তলোয়ার ও কীল নিয়ে। বিচিহ্ন ঢাল ধরে। বাহুর ( অর্থাৎ  
মার্কণ্ডেয় মণ্ড বা অঙ্গ ) মালা করে পরে, বাঘের ছাল জড়িয়ে। গায়ের

মাংস ভুকিরে গেছে। অত্যন্ত ভয়বর দেখতে। মুখে প্রকাণ্ড হাঁ। জিব ভয়বরভাবে লক্‌লক্‌ করছে। বলে গেছে লাল চোখ। ডাকে চারদিক সুখরিত।’

এই যে ছবি তা ঠিক আমাদের এখনকার পুজিত কালী ঠাকুরের প্রতিমূর্তি নয়। মনে হয় মার্কণ্ডের-পুরাণের এই বর্ণনাটি একটি বিকৃত সংস্করণ। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাবীদের মধ্যে (এবং তার বাইরেও) লোক-বিশ্বাসে প্রায় সর্বত্র (অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থে বৃক্ষমানবতার, বাপক অর্থে পশুমানবতার) উদাহরণ পাওয়া যায়। গ্রীসে ছিল মানববরাহ (তুলনীয় আমাদের বরাহ-অবতার), ইংলেণ্ডে মানবশশ, মিশরে মানবশৃগাল, আফ্রিকায় মানবহেঁড়েল, চীনে মানবশৃগাল, জার্মানিতে মানবনেকড়ে, ভারতবর্ষে মানব-শাহুঁল ইত্যাদি।

মার্কণ্ডের পুরাণের বর্ণনাটি যেন মানববাহের বিমিশ্র চিত্র। অত্যন্ত সূক্ষ্মত, অংশত মানব অংশত বাঘ—মানববাহ। যার লাল চোখ বলে গেছে, যার কণি উন্নয় আরও কণি হয়েছে, খাত্তের প্রত্যাশায় জিব লক্‌ লক্‌ করছে। বাঘের চার পা, এ দেবীও চতুর্ভূজ। (স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও বোঝা যায়—এক হাতে অগ্নি, এক হাতে পাশ, এক হাতে ঢাল, এবং অবশ্যই অপর হাতে অক্ষুশ (ভলোয়ারের সঙ্গে ঢাল যেমন, পাশের সঙ্গে অক্ষুশও তেমনি।)

বিচিত্র মানবশাহুঁল কালী মহাদেবীর দেহ থেকে বেরিয়ে এসে শাহুঁ-লুপ্তভাবে শক্তলৈঙ্গদের সব খেয়ে ফেললেন, আর মানবস্বরূপে চণ্ডমুণ্ডের মাথা কাটলেন। তারপর সে দুই মুণ্ড দুহাতে ধরে নিয়ে কালী মহাদেবীর কাছে উপস্থিত হলেন। দেবী সে উপহার পেয়ে খুশি হলেন। বললেন,

বশাচ্, চণ্ডং চ মুণ্ডং চ গৃহীত্বা

স্বয়ং উপাগতা।

চামুণ্ডেতি ততোলোকে খ্যাতা

দেবি ভবিষ্যি।

‘যেহেতু চণ্ড ও মুণ্ডকে নিয়ে তুমি এসেছ, (সেই হেতু) হে দেবী, জনসমাজে তুমি চামুণ্ডা নামে বিখ্যাত হবে।’

চণ্ড-মুণ্ড বধের পরেও স্তম্ভ-নিষ্ঠের দলকে কাবু করা গেল না। তখন আবশ্যক হল দেবীরও সেনাপালের। সে দল গড়া হল। দেবতাদের দেহ থেকে তাঁদের শক্তি বেরিয়ে এসে মহাদেবীর নারীবাহিনী সৃষ্টি করলেন। বিষ্ণু থেকে এল বৈকরী, ব্রহ্মা থেকে ব্রাহ্মণী, ‘ইন্দ্র থেকে ইন্দ্রাণী, কুমার থেকে কুমারী

ইত্যাদি। এঁরা সব বৃদ্ধ করেও পেয়ে উঠতে পারছিলেন না তত্ত্ব-নিপুণের নৃতন সেনাপতি রক্তবীজের কাছে। রক্তবীজকে কেটে ফেললেও সে মরে না। (তখন বোধ হয় অগ্নি আর শূল ও ধনুর্বাণ ছাড়া বধের কোন উপায় জানা ছিল না।) তার রক্ত এক কোঁটা মাটিতে পড়লেই আর একটা রক্তবীজ জন্মায়। রক্তবীজের কাছে হররাণ হয়ে মহাদেবী তখন নিজের শরীর থেকে শক্তি বার করলেন। এ শক্তি শিরাল (অথবা নেকড়ের আকৃতি), অথবা এ শক্তি শৃগাল-মুখ অথবা কোকা-মুখ, অর্থাৎ বর্ষাধি মানবক।

ততো দেবীশরীরাত্তু বিনিজ্জাত্যতিভীষণা।

চণ্ডিকাশক্তিরু অত্যাশ্রা শিবাশতনিনাদিনী।

—‘তারপর দেবীর শরীর থেকে বেরিয়ে এস অতিশয় ভয়ঙ্কর চণ্ডিকাশক্তি, শৃগাল, একশ (শিরালের) রব-কারিণী ॥’

[স্লোকটি আলোচনা করবার আগে দেবীর দুটি মানবজাতব মূর্তির কথা বলতে চাই। পুরাণকাহিনীতে এবং প্রত্নলিপিতে মহাদেবীর ‘কোকামুখা’ বা ‘কোক-মুখা’ নাম পাওয়া গেছে। ‘কোক’ নামে নেড়ে বাঘ অথবা শিরাল। বিষ্ণুর নামও মিলেছে ‘কোকমুখ’। এই নামের বিষ্ণুমূর্তি বুলিংহ-মূর্তির মতো তুলিয়ে গেছে। মহাদেবীর বেলায় ‘কোকামুখা’ মূর্তি লোণ পেয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু লোকব্যবহারে কিছুকাল আগে পর্যন্তও “শিরালী কালী” পশ্চিমবঙ্গে একেবারে অজ্ঞাত ছিল না]

এই প্রসঙ্গে মহাদেবীর আর একটি মানবজাতব রূপের কথা বলে দিই। মার্কণ্ডেয়-পুরাণে মহাদেবীর পক্ষীমূর্তির কোন উল্লেখ পাইনি, তবে হরিবংশে এবং পুরানসাহিত্যে অস্ত্রজ আছে। কংস কর্তৃক শিলাপাটে আছড়ে মারার সময় সন্তোজাত শিশুমূর্তি দেবীর চিল হয়ে উড়ে বাবার কাহিনী সকলেই অবগত আছেন। এই বিষয় অম্বুসারে আমরা এখনও আকাশে শব্দচিল উড়লে নমস্কার জানাই। শাস্ত্র অম্বুসারে দেবীপূজার কোন প্রাচীন বিধানে পক্ষীমূর্তি অথবা পক্ষীমুখ মহাদেবীর উল্লেখ পাইনি। তবে লোকব্যবহারে তা চলিত ছিল। বোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কবিকরুণ মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর কাব্যমধ্যে দেবীতোজ্ঞে লিখে গেছেন—

‘বলাক পূজিয়া বলদেবের ভগিনী।

‘কোক ( “বলাক”, “বলাকা” )-রূপে

পূজিত ( ভূমি ), বলদেবের ভগিনী।’

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্রের অনন্যমূল্যে এবং এইসময়ে লবলিত তত্ত্বগ্রন্থে মহাদেবীর নাম পাঞ্জি ‘বগলা’ ( বগলা তুলনীর বকলক) অথবা ‘বগলা-দুখী’। ভারতচন্দ্র ও তাঁর সমসাময়িকেরা শুধু নামটিই পেরেছিলেন, এমন কোন পক্ষী-দেবতার অথবা পক্ষী-মানব দেবতার মূর্তি দেখেছিলেন বলে মনে হয় না। তাহলে নিশ্চয়ই কিছু বর্ণনা পাওয়া যেত।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের তিনটি দেবীমাহাত্ম্য কাহিনীর কোনটিতেই যে দেবীর পক্ষীরূপের উল্লেখ নেই তা অত্যন্ত তাৎপর্যবহু। কাহিনী তিনটির মধ্যেও যেন কিছু মতের তফাত আছে। দ্বিতীয় কাহিনীতে মানবজাতক যোটেই নেই, যদি না মহিষাসুরকে মানবজাতক বলে মনে না করি। তবে প্রথম কাহিনীতে একটু আছে। মধুকটক হল মধুকীট ( “মধুকীট+ত”)। এখন মূল আলোচনার ক্রমে বাই।

দেহ থেকে শিবাশক্তি বার করবার প্রয়োজন হল রক্তবীজের রক্ত মাটিতে পড়বার আগেই তা খেয়ে ফেলা। ( কে জানে হয়ত শৃগাল শব্দের লোক ব্যুৎপত্তির ব্যাতিরেই—“অন্যক্ লাভি”—বৃক (‘কোক’) এখানে শৃগাল হয়েছে। )

মহাদেবী চণ্ডিকার দেহ থেকে কালীমূর্তি বেরিয়ে তা চণ্ড-মুণ্ডকে নিহত করেছিল। এখন যে আবার রক্তবীজকে ধ্বংস করতে আর এক শক্তি নিষ্কাশনের প্রয়োজন হল তাতে মনে হয় যে এখানে একটি স্বতন্ত্র কাহিনীর সংযোজন হয়েছে। হয়ত এখানে সব দেবতারই শক্তি শৃগাল (কোক) রূপে প্রকাশ পেয়েছিল। মহাদেবীর শক্তি তাদের নেতা ছিল। মহাদেবী তাঁর এই শৃগাল স্বরূপকে ( অথবা শৃগাল-বাহিনীকে ) দূতরূপে পাঠিয়েছিলেন শুভ-নিশ্চয়ের কাছে। তারা যদি প্রাণে বাঁচতে চায় তবে মূছ ছেড়ে দিয়ে যেন পাতালে আগ্রহ নের। মহাদেবী তর দেখিয়েছিলেন, অন্যথা তাঁর শিবাশাল তাদের মাংস ছিঁড়ে থাকবে। সংযুক্ত কাহিনীর মর্ম না জেনে আমাদের শাস্ত্র-কারেরা শিবদূতের আসল অর্থ বরতে পাবেন নি। আসল অর্থে শব্দটি কর্ম-ধারয় সমাস, শিবাই দূত। ওঁরা ধরে নিয়েছেন সমাসটির ঠিক পাঠ শিবদূতী। তাহি তাঁরা অকস্মাৎ শিবকে মহাদেবীর দূতরূপে কল্পনা করেছেন। তাঁরা বিবেচনা করে দেখেননি যে শুভ-নিশ্চয় কাহিনীর মধ্যে—এমন কি মার্কণ্ডেয় পুরাণের আর দুটি কাহিনীর মধ্যেও শিবের কোনই স্থান নেই দেবীর সম্পর্কে। শাস্ত্রকারদের গৃহীত অর্থ হল—শিব দ্বার দূত এমন নারী বহুবীহি সমাস)।

মহাদেবীর যে শিবাবাহিনী ছিল তা তাঁর উক্তি থেকেই প্রমাণিত হয়।  
সুত-নিজন্তের প্রতি উক্তির মধ্যে এই কথা ছিল,

বলাবলেপাদ্ অথ চেম ভবন্তো বৃদ্ধকাটিকণঃ ।

তদাগচ্ছত তৃণ্যন্ত মচ্ছিব্যাঃ শিশিতেন বঃ ।

—‘সামর্থ্যের অভাবের যদি তোমরা বৃদ্ধ করতেই চাও তবে এগিয়ে এস।  
আমার শৃগালেরা তোমাদের ছুঁনের মাংসে তৃণ্ডিলাত করুক।’

সুত-নিজন্ত মহাদেবীর প্রত্যাব অগ্রাহ্য করলে। রক্তবীজের ডাঙব-চলতে লাগল। তার বিকড়ে চামুণ্ডা নিয়োগ করলেন কালীকে। কালীর সঙ্গে শিবের কোন উল্লেখ নেই। থাকা উচিত ছিল। একা কালী রক্তবীজের সব রক্ত আগে গলাধঃকরণ করতে পারে নি। এখন শিয়ালদের সহযোগিতায় সে কাজ করতে পারা গেল।

আগে কোকামুখা দেবী ও শিয়ালী কালীর উল্লেখ করেছি। এখন মনে পড়ছে “শতনিনাদিনী” শিবা-দুতীর কথা। এমন একটি দেবতার পূজা বহুকাল থেকে প্রচলিত আছে রাতদেশে—কাটোয়া অঞ্চলে। দেবীর কোন মূর্তি এখন নেই, আগে ছিল কিনা তাও ঠিকমত জানা নেই। দেবীর নাম ক্ষুরা আর দেবস্থানটির এবং গ্রামটির নাম অট্টহাল। এখানকার দেবীপূজার বৈশিষ্ট্য হল ‘শিবাভোগ’ অর্থাৎ শিয়াল খাওয়ানো।

মহাদেবীর শৃগালরূপের (খাঁটি মানবজাতক) উল্লেখ হরিবংশ বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি পুরানো পুরাণে কৃষ্ণভক্ত গ্রন্থে আছে। মহাদেবী শৃগালরূপ ধারণ করে বহুদেবকে বম্বার মধ্যে দিয়ে পথ নির্দেশ করে দিয়েছিলেন গোহুলে বাবার অন্তে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের কালী-চামুণ্ডা অল্প-বল্প পরিবর্তন নিয়ে মানবজাতকতা একেবারে পরিত্যাগ না করে এখানকার কালী ঠাকুরে দাঁড়িয়েছেন। আর মানবজাতকতা একেবারে ঝেড়ে কেলে লোকসংস্কৃতিতে—শিল্পে ও পূজাকর্মে—তিনি পরিণত হয়েছেন ককালসার শীর্ণমূর্তি দাঁত বার করা ডাকিনী মূর্তিতে। নাম তাঁর চট্চিকা (মানে, চাঁচা ছোলা), রক্তিনী (মানে, শীর্ণকার ক্ষুধার্ত নারী) অথবা বকালী (মানে, ককালসার নারী)। চামুণ্ডা নামও চলে।

দ্বিতীয় কালীর সম্বন্ধে অনেক কথা বললাম। তৃতীয় কালীর সম্বন্ধে কিন্তু প্রথম কালীর মতো বলবার বেশি কিছু নেই। এই তৃতীয় কালীর উল্লেখ করেছেন কালিদাস। কুমারসম্বৎসরে শিব বধন পার্বতীকে বিবাহ করতে হিমালয়-ভবনে বাহ্য করেছিলেন তখন বরষাঈর মধ্যে ছিল নরাহি-অলঙ্কার পরা কালী।

কালী কপালভরণা চকাশে ॥

এ কালী শিবের গণের একজন, নন্দীভূজীর মতো। স্ততরাং অপদেবতা।

# ধর্মঠাকুরের ইতিহাস

এক

ঋগ্বেদে বম ও বমী বাংলার লৌকিক পুরাণে ধর্ম ও মনসা (কেতকা)। বম-বমী মানে বমজ তাইবোন। ধর্ম-কেতকাও তাই। ধর্মের শরীরায়ণ থেকে কেতকার উদ্ভব যেমন হিত্রপুরাণে আদম থেকে ইবার উৎপত্তি। বাংলার লৌকিক পুরাণে সৃষ্টিগতনে ধর্ম-কেতকার বম-জীবনের গোড়ার কথা নেই। আছে এইটুকু যে তাঁদের বিয়ে হয়েছিল কিন্তু সংসার করা হয় নি। বিয়ের পরেই ধর্মঠাকুরের বৈরাগ্য উদয় হয়, তিনি বিবাসী হয়ে চলে যান তপস্রা করতে। তাৎপরে আর কেতকার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নি। এই কাহিনীর মধ্যে যেটুকু অজ্ঞত আছে সেটুকু ঋগ্বেদের বমবমী-সূক্ত (১০.১০) পূর্ণ করেছে। অর্থাৎ ধর্মের কোন ইচ্ছা ছিল না এই অবৈধ ও অসঙ্গত বিবাহে, কেবল কেতকার নির্বোঁই তা হয়েছিল। (কেতকা-মনসা নামের মধ্যে এর ইঙ্গিত আছে। কেতকা শব্দটি কেত শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত, কেত মানে বাগনা কামনা। আর মনসা এসেছে মনস্ থেকে, সে শব্দের অর্থও তাই। পরবর্তী কালের ধর্মপুণ্যের অহুঠানে এর নাম রয়ে গেছে কামিনী। এখানেও কাম।) ঋগ্বেদের সূক্তে দেখি যে বমী উতলা হয়ে চাইছেন বমকে ভর্ত্তাকপে। কিন্তু বম কিছুতেই রাজি নন। বললেন, 'রাত্রির পর রাত্রি কাটবে আমাদের দিনের পর দিন, সূর্যের চোখ বুজবে খুলবে, ভৌ আর পৃথিবী চিরকালের সঙ্গী ও বন্ধু, আর তাদের সামনে বমী করবে বমের সঙ্গে অবৈধ আচরণ, তাও কি কখনো হয়।'

রাজ্যভিন্নশা অহতিবস্ত্রং

সূর্যন্ত চক্ষুর্মুহকস্মিবীয়াং।

দিবা পৃথিব্যা মিথুনা সবদ্ধু

বমীর্বস্ত্র বিভ্রাদ্যামি।

এর পরের কথা বেবে অজ্ঞত রয়ে গেছে কিন্তু তার অহুভুতি রয়েছে ধর্মঠাকুরের কাহিনীতে। বড় বর্ষাহত হয়ে তিনি বর ছেড়েছিলেন।

ধর্মঠাকুরের কাহিনীতে পাই যে ধর্মের বিব (প্রাচীনতম অর্থে, রেকস্) পান করে কেতকা ব্রহ্মা-বিক্র-মহেশ্বর এই ত্রিবেদাকে অন্ন দিয়েছিলেন। একথা

বেদে বম-বমীর প্রসঙ্গে নেই। তবে এর একটু আভাস আছে বৃষ্টি-ঊষকম প্রসঙ্গে ( ১০. ১২৩. ৪ কথ )। ‘তখন আপে বেরিয়ে এল কাম, বা ছিল মনের প্রথম রেতঃ।’

কামন্তরগ্রে লমবর্ততাপি

মনসো রেতঃ প্রথমং বদাসীৎ।

যমের সঙ্গে ধর্মের যোগাযোগ এইখানেই শেষ নয়। আরো আছে।

বহুকার যেখানে প্রথমে ধর্ম পরে তাঁর পুত্র জিবেবা তপস্তা করেছিলেন তার কাছে ছিল এক বট গাছ। ধর্মকে বহন করে অমণ্ডলাস্ত উলুক এই গাছে বিজ্রাম করেছিল। ঋগ্বেদের এক সূত্রেও যমের পত্নবহুল যুদ্ধের উল্লেখ আছে ( ১০. ১৬৫. ১ কথ )। সে পত্নবহুল গাছের তলার দেবতাদের সঙ্গে বম লোম (?) পান করতেন।

বসিন্ বুদ্ধে স্থপলাশে

চেষ্টৈঃ সংশিবতে বমঃ।

ধর্মঠাকুরের নামটি নিয়ে অনেক কল্পনা-জল্পনা হয়েছে। ধর্মঠাকুরের পাদপীঠ কূর্ম। কচিং কূর্ম তাঁর প্রতীকও। এর থেকে ত্রীযুক্ত হনুতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অজ্ঞমান করেছেন যে ধর্ম শব্দটির মূলে ছিল কূর্মবাচক অনার্য (কোল) শব্দ “নড়ম্”। “নড়ম্” বা “নরম্” থেকে ‘ধর্ম’ হওয়া নানা দিক থেকে দুর্ভব। ধর্মঠাকুরের নাম আধুনিক নয়। এবং গোড়া থেকেই বম ‘ধর্মরাজ’। ধর্মঠাকুরের নামের শেষাংশ ‘রায়’ সেই নামাংশ বহন করে চলেছে। দেবতাদের মধ্যে প্রধানত দুজনকে রাজা বলা হয়েছে ঋগ্বেদে, বমকে আর বরুণকে। পরলোক-পথিককে উদ্দেশ্য করে বেদের ঋষি বলেছেন, ‘বধায় মত্ত রাজা’ দুজন বম আর বরুণকে তুমি দেখতে পাবে’ ( ১০. ১৪. ৭ )।

উভা রাজানো অধরা মদস্তা

বমং পত্নাসি বরুণং চ দেবম্।

ধর্মঠাকুরের মধ্যে বম বরুণ দুজনেই আত্মগোপন করে রয়ে গেছেন।

বমকে ধর্মরাজ বলা হয়েছে মহাভারতে পুরাণে। এ নাম ঋগ্বেদে একবার আছে ( “বমরাজঃ” )। পুরানো বৌদ্ধ সাহিত্যেও এ নাম অজ্ঞাত নয়। ত্রীযুক্ত নলিনাক দত্ত সম্পাদিত প্রিন্সিট পুঁথিতে ( বঠ শতাব্দী ) পাই,—“বমস্ত



ধর্মধরাজ্ঞঃ,” “যমোহিণি ধর্মধরাজ্ঞঃ” । ধর্মধরাজ নামের সূত্র এবং তাঁর গ্রাম্যবেদান্তের ইঙ্গিত রয়েছে ঋগ্বেদের একছন্দে ( ১. ১৭. ২২ প ) । ‘ধর্ম হয়েছেন গ্রাম্যাবানীর রাজা’ ।

### ধর্মীকুব্ধ বৃকভক্ত রাজা

ঋগ্বেদে ( আবেতারও ) বম প্রথম মর্ত্য । তিনিই প্রথম বৃত্তা বরণ করেছিলেন এবং স্রেষ্ঠ দেবতার মতো গণ্য হয়েছিলেন । বেদে যমের বৃত্তার উল্লেখমাত্র আছে ।<sup>১২</sup> বাংলায় সৃষ্টি-পত্তনে গল্পটি পুরোপুরি দেওয়া আছে । বাংলা কাহিনীর কিছু রূপান্তর পাওয়া যায় কোন কোন আদিবাসীদের মধ্যে । আনাম অঞ্চলে পাই গোকর বৃত্তদেহ রূপে ধর্মের ছলনা । এর থেকে মনে হয় কাহিনীটি খুবই প্রাচীন এবং খুব প্রাচীন কালেই এই কাহিনী বৈদিক আর্ষদের দ্বারা গৃহীত হয়েছিল । ত্র্যম্বক-সৃষ্টি কাহিনীর সূত্রও অনাৰ্যদের ( লম্ববত অষ্ট্রিকদের ) কাছে পাওয়া ।

এখন ধর্মীকুব্ধের বরণান্তের আলোচনা করি । ধর্মীকুব্ধের মাহাত্ম্যাকাঙ্ক্ষিত কাহিনীর মতো প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হরিশ্চন্দ্র-লুইচন্দ্র উপাখ্যান । এটি ধর্মমূল্যে আছে ধর্মপুরাণেও আছে । আর আছে বরণের মাহাত্ম্যাকাহিনীরূপে প্রাচীনতম বৈদিক গদ্য গ্রন্থ ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে । ঐতরেয়-বলেছে : ইন্দ্রাকুব্ধীয় বেষনের ছেলে রাজপুত্র হরিশ্চন্দ্র ছিলেন অপূত্রক । বরণের অঙ্গগ্রহে তাঁর ছেলে হল রোহিতাশ্ব । কথা ছিল অপূত্রক নাম শূচলে পরে রাজা পুত্র বলি দিয়ে বরণের পূজা করবেন । পূজার কাল হলে রাজা কেবলি সময় নেন, আর একটু বড় হোক আর একটু বড় হোক বলে । অবশেষে যখন আর ঠেকানো অসম্ভব হয়ে উঠল তখন দৈববাণীর আদেশে রোহিতাশ্ব ঘর ছেড়ে নিকৃৎশন হলেন । যেখানে-সেখানে সেখানে শোনে দৈববাণী, চলো চলো এগিয়ে চলো । এই প্রসঙ্গে কয়েকটি পুরানো কবিতা ( “পাখা” ) উদ্ধৃত হয়েছে । দেওলি ভারি চমৎকার, যেন বাঘাবর আদি-আর্ষদের চলতি পথের গান । সে গানের ধূয়া “চরৈবেতি”, চলো চলো ।

পুল্লিপ্যো চরতো জল্যে কুকুরাঙ্গা কলেগ্রহিঃ ।

শেরেহস্ত সর্বে-পাশ্চাত্যঃ অশ্বশ্রেণে হতাঃ চরৈবেতি ।

—‘যে চলল তার পায়ে কোটে ফুল, তার আঙ্গা হয় বিস্ফারিত কৃতার্ধ । সব পাশ তার করে পড়ে প্রশংসে, পরিশ্রমে হত হয়ে । চলো চলো ।’

চরন্ বৈ মধু বিন্ধতি চরন্ বাহুমুহুরন্ ।

স্বৰ্ণস্য পশু জ্ঞেয়াণং যো ন তদ্রসতে চরন্ চরৈবেতি ॥

—‘বে চলে সে মধু পায়, পায় বাহু ফল । দেখ স্বর্ষের প্রোভব. যিনি চলতে চলতে তদ্রাস্ত হন না । চলো চলো ।’

কলিঃ শরানো ভবতি সন্ধিহানস্ত বাপরঃ ।

উত্তিষ্ঠন্ত্রেতা ভবতি কৃতং সম্পত্ততে চরন্ চরৈবেতি ॥

—‘ভয়ে থাকলে তার পরাজয়, যে উঠবার উত্তম করে তার হু পোয়া লাভ । উঠে ঠাড়ালে তার লাভ তিন পোয়া । বোল আনা পায় যে চলে । চলো চলো ।’

রোহিতাষ তো গায়েব হল, এখন বরুণের রোষ এড়ানো যায় কিনে । বরুণের রোষে রাজা উদরীতে ভুগছেন । হরিশ্চন্দ্রের ঋষি-পুত্রোহিত পরামর্শ দিলেন, অপরের ছেলে কিনে এনে বদল দাও । রাজা তাই করলেন । দরিদ্র ঋষি অজীর্ণের ছিল তিন ছেলে । তাঁরা একটিকে বেচতে রাজি হলেন । বাপ বললেন বড়টি বাব, মা বললেন ছোটটি ছাড়া । মেজ তনুশেপকে রাখতে কেউই চাইলেন না । সুতরাং সেটিকে কিনে আনা হল । বলিদানের পূর্ব-মুহুর্তে ঋষিপুত্র কাতর হয়ে বরুণের স্তুতি করতে লাগলেন । সে স্তুতি ঋগ্বেদের একটি প্রসিদ্ধ সূক্ত ( ১. ২৪ ) । তনুশেপ শুরু করলেন একে একে দেবতাদের বন্দনা করতে ।

কস্য নুনং কতমসাম্যতানাং

মনামহে চাক দেবস্য নাম ।

কো নো মহ্যা অমিতরে পুনর্দাং

পিতরং চ দৃশেরং মাতরং চ ॥

—‘কোন দেবের, অমরদের মধ্যে কার চাক নাম আমরা নিই এখন । কে আমাদের ছেড়ে দেবে আবার মহান্ স্তুতিতে বাতে দেখতে পাব আ নি বাপকে মাকে ।’ শেষে বরুণের কাছে নির্বন্ধ,

তনুশেপো হি অহম্ গৃভীতঃ

জিহাদিত্যাং ক্রপনেনু বন্ধঃ ।

অষ্টবনং রাজা বরুণঃ সন্থজ্যাম্

বিষা অরকো বি যুযোক্তপাশান্ ॥

—‘তনুশেপ ডাকছে জিহাদিত্যাকে বন্দী হয়ে খোঁটার তিন ঠাই বাধা হয়ে ।

এখন রাজা বরুণ এক দিন ছেড়ে। তিনি জানেন কোনো অপরাধ করা হয় নি। বন্ধন খুলে দিলেন তিনি।' জনশ্রুতির পাশ্চাত্য ধীরে ধীরে খুলে পড়ল।

বাংলার কাহিনীতেও হরিশ্চন্দ্র রাজার ছেলে লুইচন্দ্র বা লুইয়া ( <লোহিয়া <রোহিতাশ <রোহিতাশ ) ধর্মের কাছে মানত করে পাওয়া। ধর্মঠাকুরের শর্ত ছিল, বড় ছেলেকে বলিদান দিতে হবে। ছেলে বড় হল। রাজারানী মানতের দায় এড়িয়ে চলেছে। ধর্মঠাকুরও তুলে গিয়েছিলেন। বিপদ ডেকে আনলে লুইয়া নিজেই। একদিন সে বাঁটুল ছুঁড়ে পাখী মারছিল। এক বাঁটুল লাগল ধর্মের বাহন উল্লুকের গায়ে। উল্লুক ধর্মের কাছে নালিশ করলে। ধর্মের মনে পড়ে গেল “সেই লুইচন্দ্র বটে আমার মানান”। চললেন তিনি হরিশ্চন্দ্রের বাড়িতে মানান নিতে। রানী টের পেয়ে ছেলেকে তার মামার বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসিবেশী ধর্ম ভোলবার নন। তাঁর নির্বন্ধে ছেলেকে আনতে হল এবং তাকে কেটে তার মাংস রান্না করতেও হল। সে মাংস মুখে ভোলবার পূর্বসূহর্তে সন্ন্যাসী নরম হলেন। নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে লুইয়াকে বাঁচিয়ে দিলেন।

বেদের কাহিনীটি শুধু হরিশ্চন্দ্রের গল্পেই পর্ববসিত নয়। ধর্মের পূজাবল্লভেও অল্পবৃত্ত হয়ে এসেছে। ধর্মের ঘরভরা গাজনে শাদা ছাগল বলিদান দিতে হয়। সেই ছাগল কিছু দিন ধরে পুতে হয়। তার এক পায়ে লোহার বেড়ি থাকে। এই পাঠাকে বলে লুয়ে। নামটির উৎপত্তি একাধিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ব্যাখ্যা করেছেন পায়ে লোহার বেড়ি ( “লোহ”) থেকে। আমি বলি এটি রোহিতাশ নামের পরিণতি হওয়াও সম্ভব। পায়ে বেড়ির তাৎপৰ্য হুদিক দিয়ে। এক, বরুণের পাশের অঙ্গুল, দুই, ঘমের ঠাড়ুকার ( বৈদিক “পঙ্কবাশ”—পায়ে বেড়ির ) প্রতীক। ( একপুত্রবতীর অথবা স্ত্রীত্ববঙ্গার পুত্রের পায়ে লক লোহার বেড়ি কিংবা ডান হাতে নোরা দেওয়ার রীতির মূলও এখানে। )

ধর্মঠাকুরের পূজাবল্লভে ঠাকুরকে পাই রাজার মত, রাজসভাধিষ্ঠিত। আগেই বলেছি বেদে যে কয়জন দেবতাকে রাজা বলা হয়েছে তার মধ্যে ঘম আর বরুণ প্রধান। এ দুজনের মধ্যে আবার বরুণেরই প্রাধান্য। বেদে শুধু বরুণকেই বলা হয়েছে “সন্ন্যাসী” অর্থাৎ অধিরাজ। স্ত্রীত্বাং ধর্মের গাজনে যে বরুণের স্বরূপ বেশি প্রকটিত হবে তা অস্বাভাবিক নয়।

ঘরতরা (গৃহভরণ) পুজোবিষয়, পূজা হলেই ঘর ভরে। গাজনের অহুষ্ঠানে ধারা অংশ নেন অথবা উল্লিখিত হন তাঁদের নাম থেকে বোকা বার বে তাঁরা মূলে ছিলেন রাজসভার পদিক। যেমন ধামাংকনি (“ধর্মাধিকরণিক,” প্রধান বিচারক), শান্তিবিগ্রহী (“শান্তিবিগ্রহিক,” সন্ধি ও বিগ্রহ করবার অধিকার আছে এমন মন্ত্রী), পড়িহার (“প্রতীহার,” সভারক্ষী), মহাপাত্র (অমাত্য), পট্টমহাদেবী (প্রধান মহিষী), কোঞরসাক্ষি (“কুমারস্বামী” অর্থাৎ কুমারামাতা), পাহড়সাক্ষি (“প্রাচুটসংঘপতি,” বিদেশী আগন্তুকদের তত্ত্বাবধায়ক), ইত্যাদি ইত্যাদি।

গাজন অহুষ্ঠানের পুরানো নাম ছিল সাংজাত। কথাটি এসেছে সংবাদ (এক সঙ্গে বহু ব্যক্তির নোকা কবে যাওয়া) থেকে। একদা এমনি করে ধর্মের পুরানো মন্দিরে (“পুরানো দেহারা”) গিয়ে ঠাকুরের পূজা করা হত। যাওয়া হত নোকা করে নদী দিয়ে। কোথাও কোথাও সমুদ্রের উল্লেখ আছে। স্থানটির নাম চাঁপাট। কোথাও কোথাও জাজপুরের নাম আছে। যদি সভ্যসভাই কোন পুরানো দেহারার গিয়ে এমনি করে ধর্মের পূজা হত তবে তা কোনরকম হওয়া অসম্ভব নয়। (ধর্মঠাকুর সূর্যদেবতাও বটেন।) তবে এ বিষয়ে জোর করে কিছু বলা অযৌক্তিক।

বৈদিক কালে এমনি করে বরণেরও সাংজাত হত। তার উল্লেখ আছে মৈত্রায়ণী-সংহিতায় (২.৫.৬)। এই বর্ণনায় সূরে পাঠার ইঙ্গিত আছে।

প্রজপতিঃ প্রজা অহুজত। তা এনং সৃষ্টা অতামন্তত। তা অতিমন্তমানা বরণেনাগ্রাহয়ং। তা বরণগৃহীতাঃ কৃকঃ পোষোহধ্যাক্ষয়ং। তন্ত্রাহুহায় পাদমগৃহাং। তন্ত শকং প্রাবুজত। স একশিতিপাদভবং। তমবোচদ্ অয়ং বাবাসাং প্রজানাম্ অবরণগৃহীতোহেনেনমাঃ প্রজা বরণান্ যুকানীতি। তং বরণমালভত। তত ইমাঃ প্রজা বরণাং প্রামুচ্যন্ত। ...দীপে বাজরেন্। এতা বৈ প্রত্যক্ষং বারুণীর্বাদাপঃ। যে বা এতদ্ বোনৌ প্রত্যক্ষং বরণমববজতি। সমন্তমাপঃ পরিবহন্তি রক্ষসামহবারায়।

—‘প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করলেন। সৃষ্ট প্রজারা তাঁকে অবজা করলে। প্রজাপতি অবজাকারী তাদের বরণকে দিয়ে ধরিয়ে দিলেন। বরণগৃহীত তাদের কালো ভেড়া অধিষ্ঠান করলে। অহুধাবন করে (প্রজাপতি) তার পা ধরলে। তার খুর ফাঁক হল। সে এক-পা-শাদা হল। তাকে বললে, প্রজাদের মধ্যে এইই বরণগৃহীত নয়, একে দিয়ে বরণের কাছ থেকে প্রজাদের

ছাড়িয়ে নিই। সেই বকশ-উদ্দিষ্ট (পতকে) বলি দিলে। তখন সব প্রজা বকশের কাছ থেকে মুক্তি পেলো।—দীপে বজ্র করতে হয়। এই যে মোতের জল এ প্রত্যাক বাকশী। এতে যেন প্রত্যাক নিজের ঘরে বকশকে বসন করা হয়। চারদিকে জল বয় রক্ষীঘের (বা রাক্ষসঘের) ঘিরে (বা তাকতে) রাখবার জন্ত।’

পাণনের দাঁড়বাটা পর্ব জলোৎসবের মত। এখানেও বকশের পূজার ইঙ্গিত। ধর্মের পূজার মন দেওয়া নিষিদ্ধ নয়। এতেও বকশের ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক সূচিত।

ধর্মের ঘট ভরে নিয়ে পবিত্রভাবে এনে ধর্মের কাছে প্রতিষ্ঠা করা হয় এই সময়ের। ধর্মঘটের নাম ‘কামিনী-কুণ্ড’। ইনিই বাকশী। বিসর্জন হলে পর ভক্তিমারা ঘটের জল (বাকশী ? সোম ?) পান করে।

হরিশ্চন্দ্র-কাহিনীতে কিরে আসা থাক। ঐতরের ব্রাহ্মণের কাহিনীতে যেমন ধর্মমজল—ধর্মপুত্রাণের কাহিনীতেও তেমনি হোহিতাশ-লুইয়ার ঘর ছেড়ে পালাবার সময়কার কোন বৃত্তান্ত নেই। পোড়ায় হয়তো কিছু ছিল না কিন্তু পরে নিশ্চয়ই কিছু কাহিনী গাঁথা হয়েছিল। এমনও অসম্ভব নয় যে ধর্মমজলের লাউসেন-কাহিনীতে তারই পরিণতি। লাউসেন নামের সঙ্গে লুইয়া বা লুইচন্দ্র নামের সাদৃশ্য ভাসাতালাই। নাম ছটির ‘সেন’ আর ‘চন্দ্র’ অংশ যথাক্রমে পিতৃনাম থেকে এসেছে। লাউসেনের বাপ কর্ণসেন, লুইচন্দ্রের বাপ হরিশ্চন্দ্র বা হরিচন্দ্র। ‘লাউ’ এসেছে সম্ভবত রাহু থেকে। লাউসেনের জন্ম ধর্মের ঘরে। তবে তাঁকে বলিদান দিতে হয়নি প্রচলিত কাহিনীতে। আসলে হয়তো অল্পবয়স্ক ছিল। হাকস্বে লাউসেনের বহুতে শিরশ্ছেদ বোধ হয় প্রথমে ছিল ধর্মের মানান-শোধ। তার পরে তাতে কিছু তাত্ত্বিক স্বধোপালনার ব্যাপার যুক্ত হয়েছে। লেখা পরে বলছি। রাহুর স্বর্ধগ্রাস-ব্যাপারের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে।

লাউসেন ধর্মের সেবক, তাঁর বরপুত্র। তবে সে ধর্মঠাকুরের কালপেচা (কাক, উল্লুক) নয়। সে হুহমানু—মহামজ, যে স্বর্ধকে বগলদ্বারা করেছিল। লাউসেনের এডভেঞ্চারগুলি লৌকিক গল্প সম্ভব নেই, কিন্তু সে গল্পগুচ্ছের ভিতর দিয়ে চলেছে লাউসেনের অবসায় পথটন। ধর্মঠাকুর একদিক দিয়ে যেমন তাকে ‘চট্টবৈতি’ করে ছাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন অপরদিকে তেমনি তাকে কানু করবার জন্তে বাধার পর বাধার সৃষ্টি করে চলেছেন। লাউসেনের

ঠাকুর বেদের বরণের মত সর্বাধ্যক্ষ, তাঁর চর সর্বজন্যমী। মাহুতা (বা মহামদ) যেন বরণেরই একেট, যদিও ককলীলার সঙ্গে লামা রাখতে গিয়ে তাকে মাতুল বনতে হয়েছে।

‘মাহুতা’ নাম নিয়ে গোলমাল আছে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে যে নামটা ‘মামুদ’ বা ‘মহমদ’ এই বিদেশী নাম থেকে এসেছে বাংলা ‘ইয়া’ প্রত্যয়ের যোগে। আসলে তা নয়। গৌড়রাজের মহামন্ত্রী মাহুতা প্রায়ই ‘মহাপাড’ বলে উল্লিখিত। মহাপাডের প্রতিশব্দ ‘মহামাত্র’। মহামাত্রের দুটি মানে—মহামন্ত্রী ও হস্তিচালক। শেষ অর্থে শব্দটি বাংলার হয়েছে ‘মাহত’। মাহুতা এর থেকে এসেছে খরা যেতে পারে। তবে গুপ্তগোল দ-কারে। আপাতত এখানে মামুদিয়া বা মহমদিয়া এইরকম বিদেশী নামের প্রভাব স্বীকার করা ছাড়া গতাস্তর নেই। ধর্মমঙ্গল-কাহিনীতে এমন কিছু নেই যাতে কাহিনীকে তুর্কী অভিযানের পরবর্তী বলা যেতে পারে। অথচ নিরঞ্জনর কথা থেকে দেখছি যে মুসলমান-শক্তি তখন দেশে বেশ জেঁকে বসেছে। সেকন্তভোদয়র লক্ষণসেনের সভায় শেখ জালালুদ্দীনের যেমন প্রতিপত্তি বর্ণিত হয়েছে ধর্মমঙ্গলে গৌড়রাজসভায় মাহুতার প্রতিপত্তি প্রায় সেই রকমই। সেকন্তভোদয়র ষোড়শ শতাব্দীর রচনা, কিন্তু এর মূলে ছিল প্রাচীনতর পত্ত রচনা। সে রচনা হলায়ুধমিত্রের লেখা হতেও পারে। মোট কথা লক্ষণসেনের বা তাঁর পুত্রের রাজসভায় কোন এক প্রভাবশালী মুসলমান সমস্তের অস্তিত্ব ঐতিহ্যবাহী ছিল মনে করতে পারি। সেই ঐতিহ্যযুগেই মাহুতার নামবিকৃতি। তবে সমগ্র কাহিনীটি মুসলমান অধিকারের পূর্বেই দৃঢ়রূপ নিয়েছিল। গৌড়রাজ নিঃসন্তান। লাউসেন তাঁর জালিকাপুত্র এবং উত্তরাধিকারী। লাউসেন খতম হলে মাহুতার সিংহাসন-অধিকার অব্যাহত। এই জগ্রেই তার জিবাংসা লাউসেনের প্রতি।

ধর্মঠাকুরের কাহিনীতে তাঁর বরণবস্ত্রের নিরাবরণ প্রকাশ দেখি একবার—গৌড়ে অধোরবাদল সংঘটনে। বরণ জলাধিপতি। জামতি ও গোলাহাট এই দুই পালার লাউসেনের বিপর্য ও বন্দী হবার গল্প আছে। জামতিতে অন্তী নারীর ছলনার আর গোলাহাটে বেস্তার সঙ্গে জুয়া খেলার বিপত্তি ঘটেছিল। এ দুটি গল্প প্রাচীন বলে মনে হয়। আর মনে হয়, এখানে লাউসেন যেন বেদের সেই বিপর্য বরণভঙের প্রতিনিধি, যিনি লাউসেনের মতই বন্দীশাশ পড়ে কাতর হয়ে দেবতার কাছে বাট বেনেছিলেন।

ন ন বো বকো বকণ ক্ৰতিঃ সা

হুয়া মহা বিজীতকো অচিতিঃ ।

অতি জারান্ কনীরল উপারে

অগ্নচেনননুতত্ত এয়োতা ।

—‘হে বকণ, (এ দশা) নিজের বুদ্ধির কেবের নয়। এ মোহছলনা—হুয়া, কোথ, হুয়া, অববিবেচনা। বড় হয়েছে ছোটর কাছে অপরাধী। যুমেও এ অপরাধের এড়ান নেই।’

“অতি জারান্ কনীরল উপারে।”—লাউসেন ছোটটাই কর্পূরধবলের পরামর্শ গ্রাহ করেন নি বলে কষ্ট পাচ্ছেন। এখানে কি এমনি কিছু ব্যাপারের ইঙ্গিত?

ধর্মমঙ্গল-কাহিনীর ক্লাইমাক্স হাকন্দ বা পশ্চিমোদয় পালায়। লাউসেনকে পশ্চিমোদয় করাতে হবে। বড় কঠিন কাজ। লাউসেন রীতিমত ধর্ম-পূজার বসলেন ধর্মের মূলস্থানে। কিন্তু কিছুতেই ঠাকুরের টনক নড়ে না। অবশেষে নিজের হাতে নিজের মাথা কেটে ধর্মকে নিবেদন করলেন। তখন ধর্ম বিচলিত হলেন। লাউসেনকে জীয়ে দিয়ে সূর্যের পশ্চিম-উদয় দেখালেন। বেদের বরুণের মত ধর্মমঙ্গলের ধর্ম সূর্যের অধাক, “বি বো মমে পৃথিবীং সূর্যেণ”। লাউসেনের আশ্রয়ভাষার চারিদিকে, “আকন্দ” পড়েছিল, প্রাকৃত-পৈতলের একটি কবিতার ভাষায় “হাকন্দ” পলে। তাই এই ঘটনা বা অহুষ্ঠানের নাম হাকন্দ, উচ্চারণ-বিকৃতিতে হাকণ্ড। এই হাকন্দের ঘটনা সূর্যপূজা-ঘটিত তাত্ত্বিক অহুষ্ঠান - একরকম ছিন্নমস্তা-সাধন। এ অহুষ্ঠানের অহুরূপ প্রক্রিয়া ত্রীমূক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত সাধনমালায় গ্রথিত (২৭২) বৌদ্ধ তাত্ত্বিক গুণাকরগুপ্ত রচিত সমারিসাধনের মধ্যে মিলবে। এই সাধনের বলিয়ন্ত্রে যমের সঙ্গে বরুণেরও উল্লেখ আছে। যমের সঙ্গে সূর্যের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বেদে-আবেস্তায় যম বিবস্থানের পুত্র। ধর্মমঙ্গলের হাকন্দ-অহুষ্ঠানের দেবতার সঙ্গে যমের প্রত্যক্ষ সূত্র অন্তত একটা আছে। বেদে ও আবেস্তায় যমের অহুচর ও মৃত কুকুর। সাংখ্যজিক লাউসেন যখন হাকন্দে যাচ্ছিলেন তখন এক কুকুর তাঁর সঙ্গে নেয়। (এই প্রসঙ্গে ধর্মরাজ-পুত্র যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থানের পথে কুকুর-সহযাত্রীর কথা স্মরণীয়।) মানিকরাম গাঙ্গুলি সে কুকুরের এই বর্ণনা দিয়েছেন—

লোহিতবরণ বেট, নোটা দুই কান।

পরিমল দন্তপাটা শিঙ্গল নয়ান।

এই “বাঁটুরা” কুহুর পশ্চিম-উত্তরের সময় পর্বত হাজির ছিল। তুলনা করুন  
কপ্বেদের কবির প্রার্থনা যমের কুহুরের উদ্দেশে—

উরুণগাবহুতপা উহুযলৌ

যমত দুতৌ চরতো জনা অহ।

তাবহতাম্ দূশরে সূর্ধায়

পুন ধীতাস্তমন্তেহ তত্রম।

—‘হুদনাল, প্রাণলোভী, উহুযল (?) এই দুই যমের দূত জনমধ্যে বিচরণ করে।  
তারা যেন আজ এখন আমাদের আবার দেয় ভয় জীবন বাতে সূর্ধকে  
দেখতে পাই।’

কাহিনীতে ধর্ম ঠাকুর শৃঙ্গমূর্তি নিরঞ্জন। তবে তাঁর পায়ে উল্লেখ আছে।  
সেই পায়ে পূজা হয়। (অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে প্রচলিত হরির-চরণ  
পূজা ধর্মের পা-পূজারই এক পরিণতি।) বেদের বরুণ-দেবতার মুখ-হাত-  
চোখের সঙ্গে পায়েও উল্লেখ আছে। বরুণের মত ধর্মেরও ঘর। দু দেবতাই  
ধৃতব্রত এবং তাঁদের ব্রত অলঙ্ঘ্য। বরুণের নামান্তর ‘ধবল’, ধর্ম নিরঞ্জন।  
বরুণের খেত নির্গিক্, ধর্মের ধবল বসন। বরুণ মায়াবী, “ধর্মের বিষম মায়া  
কহনে না যায়।” বরুণীর সঙ্গে ধর্মঘটের সম্ভাব্য যোগ আগেই দেখিয়েছি।

## দুই

ধর্ম ঠাকুর রাজদেবতা, তাই স্থানীয় ধর্ম ঠাকুরের নামের শেষ অংশ ‘রায়’।  
সব চেয়ে সাধারণ নাম বাঁকুড়ারায় (নামটির মানে আছে। বাঁকুড়া  
মানে দুর্ধর্ষ, নাছোড়বান্দা। আধুনিক বাকুড়া, বাগুড়া দেওয়া।)। তা ছাড়া  
পাই—কালুরায়, খুদিরায় (সূত্র থেকে, সম্ভবত প্রতীকের আকৃতি অনুসারে),  
বুড়ারায়, টানরায়, দলুরায়, জগৎরায়, মেঘরায়, মোহনরায়, ভামরায়,  
হুন্দররায়, ইত্যাদি। রায়ের বদলে ‘সিংহ’ও পাওয়া যায়। যেমন ফুলুইয়ের  
কতেসিংহ, বেলুটের শীতলসিংহ। অস্ত্র নাম পাই—বরুণনারায়ণ ও  
রুপনারায়ণ। এ দুটি নাম ধর্ম ঠাকুরের বিশিষ্ট নাম নয়। কালার্চাঁদও তাই।  
সবচেয়ে অকৃত নাম কীকড়াবিছা। মানিকরাম গাঙ্গুলি তাঁর কাব্যে বিভিন্ন  
স্থানের ধর্ম ঠাকুরের বন্দনার মধ্যে লিখেছেন—

দেপু্রে ভগৎরায়ে জোড় করি কর।

গোপালপুরের কীকড়াবিছার বন্দি তার পর।



একাধিক ধর্মঠাকুরের নাম পাওয়া যায় বাত্ৰানিহি। এ নামটির ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস কুর্মপুত্রের সঙ্গে বিজড়িত।

অনেক স্থানে ধর্মঠাকুরের প্রতীক গোল অথবা লম্বা নর এমন শিলাখণ্ড। কোন কোন ধর্মশিলার কূর্মের আয়ল আছে। সেটা আকস্মিকও হতে পারে, স্ফুটিক্তও হতে পারে। আবার অনেক স্থানে ধর্মঠাকুরের প্রতীক পাথরে খোদাই বা খাতুনিস্থিত কুর্মমূর্তি। (এরকম কুর্মমূর্তি প্রায়ই প্রাচীন নয়।) মল্লদেশ-অটোদেশ শতাব্দীতেই বেশী করে এই ধরনের মূর্তি খোদাই করা হত পূজার উদ্দেশ্যে। খোদাই করা কুর্মমূর্তিগুলি প্রায়ই ধর্মঠাকুরের লক্ষ্য প্রতীক নয়, কেননা সে সব মূর্তির শিঠে ধর্মের পা আঁকা আছে। সেই “ধর্মের পাহুকা”—ই ধর্মঠাকুরের আয়ল প্রতীক।<sup>২</sup>

উল্লেখ্যবাহনং ধর্মং .নবং তেভোময়ান্নকম্।

ইমানীং কুর্মপুঠে তু দিব্যকপং নমোহস্ত তে।

সেকালে ধর্মপণ্ডিতেরা গলায় ধর্মের পাহুকা ঝুলিয়ে রাখতেন। সময়ে অসময়ে তাঁরা সেকালে সেই পাহুকা পূজা করতেন। মানিকরাম গাজুলি লিখেছেন,

বৃকমূলে বসিলাম রেখে খুঁজিপুঁথি

একজন পণ্ডিত আসিএ উপনীতি।

ধর্মের পাহুকা ছুটি বাধা আছে গলে।

বসিলা বিজ্রাম আশে সেই বৃকতলে।

মানিকরামকে পণ্ডিত উপদেশ দিলেন—

পদ্ম তুল্যা পাহুকা সস্ততি কর পূজা।

যনে হয়, কুর্মপুঠে পাহুকা-অঙ্কনের রীতি গলায় বোলান পাহুকা পূজার স্থাবর ও জীকালো সংস্কার।

কখনো কখনো কুর্ম স্থাপিত হয়েছে ঘুরে-দেওর সিংহাসনে।

ধর্মঠাকুর গোড়ার কূর্মদেবতা ছিলেন না। তবে তাঁর পূজার কূর্মদেবতা-পূজা এসে মিশেছে। কূর্মদেবতা শূর্মদেবতা এবং কলদেবতা। ধর্মঠাকুরও অনেকটা তাই। ধর্মঠাকুরের বুটপরা অম্বাচোহী লিপাইমূর্তির বর্ণনা কোন কোন ধর্মপুরাণ পুঁথিতে আছে।

ইলা খোড়া খালা খোড়া পারে দিয়া বোতা।

অবশেষে বোলাইলে গোউড়ের রাজা।

এখনি শূর্মমূর্তি অনেক পাওয়া গেছে। এ মূর্তি ও তার পূজা এসেছে চালু

করেছিল ইরান থেকে আগত মগ বা শাকবীণী ব্রাহ্মণেরা। এই সঙ্গে এবং এই সূত্রে কুম্ভপুজারও প্রচার বেড়েছিল বলে মনে করি। তবে তারও আগে এ পূজা অজ্ঞাত ছিল না। বর্ষার ঝুটি না হলে কুম্ভপুজার বিধি আছে কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (৪.৩)।

বর্ষাব্যগ্রহে শতীনাথগঙ্গাপর্বত-মহাকঙ্ক[শ]পূজা: কারয়েৎ।

শতপথ-ব্রাহ্মণে সূর্যকে কুম্ভ বলা হয়েছে। মগ অবতারের মধ্যে কুম্ভ দ্বিতীয় অবতার। প্রথম অবতার মীনের কাহিনীও শতপথ-ব্রাহ্মণে আছে। সে কাহিনী যে বাইরে থেকে এসেছে এ কথা পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন। কুম্ভ অবতারের কোন বিশিষ্ট কাহিনী পুরাণে নেই। যা আছে তা পৃথিবী অথবা মন্দের পর্বত ধারণের। পৃথিবী-ধারণের কাহিনী সম্ভবত ধর্মঠাকুরের কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিল। কুম্ভে ধর্মঠাকুরে পাদপীঠ তাও এর সঙ্গে সংযুক্ত।

এদেশে কুম্ভপুজার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যা কিছু প্রমাণ-ইঙ্গিত পাচ্ছি সে সবই খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পরেকার। অর্থাৎ এদেশে ঈরানীয় সূর্যপূজা স্পষ্টচলিত হবার আগে নয়। কুম্ভপুজার না হোক মঙ্গলার্থে কুম্ভ পোবার উল্লেখ পাচ্ছি বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায়। বরাহমিহিরের উক্তি থেকে বোঝা যায় যে রাজারা যেমন কুকুর ও কুকুট পুষতেন তেমনি কুম্ভ-ও পুষতেন। স্থলকণ কুম্ভ পোষা হত ক্রীড়া-সরোবরে অথবা ইদারায় রাষ্ট্রবিবর্ধনের স্থলকণ বলে।

অজ্ঞানতুল্যভ্রামতস্ত বা

বিন্দুবিচিজ্জোহ্মাদশরীরঃ।

সর্পশিরা বা ফুলগলো বঃ

সোহপি নৃপাণাং রাষ্ট্রবিবৃষ্টো। ৬৩.২।

—‘কাজল বা জমরের মত ভ্রামবর্ণ অথবা বিন্দুর দ্বারা চিজ্জিতপৃষ্ঠ অবিকৃত-শরীর কিংবা সাপের মত মাথা ও ফুল গলা দ্বারা এমন (কুম্ভ) রাজাদের রাজ্যবর্ধন করে।’

বৈদূর্ঘ্যিষ্ট স্থলকণত্রিকোণে।

গৃহজ্জিহ্বাশ্চোদকবংশত শতঃ।

ক্রীড়াবাপ্যাং ভোরপূর্ণে মণৌ বা

কার্ণঃ কুম্ভে মঙ্গলার্থং নয়েতৈঃ। ৬৩.৩।

—‘বৈবৰ্ণবর্ণ তুলকৰ্ত্ত ত্ৰিকোণ পূৰ্ণচ্ছিত্ৰঃ প্রশস্ত পৃষ্ঠাহি—এমন ভালো কৃষকে রাজা মহলের জন্ত রাখবেন কীড়া-সরোবরে অথবা জলপূর্ণ কূপে।’

এখানে ধর্মঠাকুরের কৃষ-প্রতীকস্থের জন্যে বাজাসিদ্ধি নামের একটা অর্থ মিলল। সাধারণত কচ্ছপ অথবা বনেই ধরা হয়।

কৃষকে (প্রতিমা বা প্রতীক নয়) যে একদা পূজা করা হত তার উল্লেখ পেয়েছি কথাসরিংসাগরে (তরঙ্গ ৮২) লুকলিত বেতাল বর্ণিত ভোজনবিলাসী শরনবিলাসীর গল্পে। অজমেশের বৃহদ্বট (বৃহদ্বট ?) গ্রামনিবাসী বাজিক ভ্রাতৃপন বিকুবাসী পূজা করবেন বলে তাঁর তিন ছেলে সমুদ্র থেকে কৃষ আনছিলেন,—এই কথা পে গল্পে আছে। অজমেকালে বাংলা দেশেরই অংশ ছিল। অতএব বাংলা দেশে কৃষ পূজার এই এক প্রাচীন নজির পেলুম।

ধর্মঠাকুরের সঙ্গে সূর্যপূজার যোগ হওয়ার পর থেকে তিনি হয়েছেন নিরাময়ের—বিশেষ করে ধবল ও কুষ্ঠ রোগের নিরাময়ের—দেবতা। ধর্ম ভক্ত নিরঞ্জন, তাই ধবলস্থের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে আছে যে গঙ্গা ধর্মকে দেববার সৌভাগ্য পেয়েছিলেন বলে ‘ধবলমুখী’ হয়েছিলেন।

ধর্ম রাজরাজেশ্বর, রাজা ঠাকুর। তাই তিনি পূর্ব ভারতে—একদা যেখানে ধর্ম দেবতা ও তাঁর পূজা অচুতান চলিত হয়েছিল, এখন পশ্চিম বাংলার (বিশেষ করে বর্ধমান বিভাগে) আজও যেখানে ধর্ম জাগ্রত ঠাকুর—প্রধান গ্রাম দেবতা। একদা তাঁর সহপূজা গ্রামদেবী ছিল, এখনও কোথাও কোথাও আছে। এই গ্রামদেবী মূলে ছিলেন ধর্মী—অর্থাৎ কেতকী-মনসা। পরে তিনি হয়েছেন বিশালাকী চামুণ্ডা ইত্যাদি, দৈবাৎ মনসা হয়ে গেছেন। গ্রামের রাজা ধর্মঠাকুর পূজাবিহীন হয়ে কোথাও কোথাও শিবঠাকুর বলে পূজিত হয়েছেন, কিন্তু কোথাও বিকুদেবতার পরিণত হয়েছেন বলে তিনি নি। ধর্মের গাজন হয়, শিবেরও গাজন হয়—ধর্ম-শিবের এই এক যোগসূত্র। আর এক যোগসূত্র পাই নাথগড়ে। বাংলার নাথগড়ী যোগীদের কোন কোন অচুতানে ধর্মপূজার কিছু কিছু প্রক্রিয়া পূজিত হয়েছিল। [নাথগড়ীরা আসলে নিরীশ্বর, পরে শৈব, এখন অনেকেই বৈকব। নাথযোগীদের মহাশয় মীননাথ-গোরাক-নাথের বড় তাই শিব। শিব ধর্মের ঐশ্বর্য পূজ, মীনগোরাক ধর্মের শব্দ পূজ। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে উল্লিখিত পুরুষমেধের সঙ্গে ধর্মদেহের সংকারের কিছু মিল আছে। পুরুষের চার অঙ্গ থেকে চতুর্ভূষ সৃষ্টি হয়েছিল, ধর্মের

চার অব থেকে চার দিচ্চা—বীন, গোরক, হাড়ি ও চৌরদি জন্মেছিল। খুলনা জেলার এবং পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণ বঙ্গের স্থানে স্থানে প্রচলিত মেল (অর্থাৎ মেটল) পূজা এখন শিবের চড়ক-অছটানের অঙ্গীকৃত। ধর্মের পাকনের নামান্তর দেহারি বা মেটল পূজা। অবৈতচরণ দেবনাথ ললিত মেলপূজার পাঁচালীতে পাচ্ছি যে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু অছরোধে শিব মেল-পূজা করেছিলেন। মেল-পূজার স্থানে পাট-পূজা কোথাও কোথাও প্রচলিত আছে। এ পাট ধর্মের পাট,—(একধারে ধর্ম-সিংহাসন এবং শলা-খায়া।)

ব্রহ্মা বিষ্ণু হরষিত কহে জিলোসনে।

পূজা কর ধর্মদেবে প্রচার কারণে।

ধর্মের পূজার অন্তে মেটল তোলা হল।

স্বর্ণের কলস মুকুতার ঝারা।

মেটল নির্মাণ হৈল অক্ষয়-বট তলা ॥

মেটল গড়া শেষ হলে

শূন্তে থাকি বলেন ধর্মরায় স্তন মহেশ্বর।

মালকের স্রুটি কর থাকুক সয়াল ॥

ধর্ম রাজদেবতা, গ্রামরাজ-দেবতা। বর্ধমান বিভাগের যে যে গাঁয়ে ধর্মের পূজা এখনও অনবলুপ্ত সেখানে দেখা যাবে যে ধর্মঠাকুরের নামে ভূম্যধিকারীর (গ্রামানত বর্ধমান-রাজের) ভূমি দান করা আছে। গ্রামদেবীর বেলাতেও ঠিক তাই। এ সব স্থানে পূজার পাঁঠা বলি হলে আগে পাঁঠা পড়ে ভূম্য-ধিকারীর নামে।

ঐতিহাসিক দলিলে রাজদেবতা ধর্মের উল্লেখ পাচ্ছি প্রথম বর্ধমান জেলার মজলারুল গ্রামে পাঁওরা বিজয়সেনের তাম্রশাসনশাসনে (ষষ্ঠ শতাব্দী)। অছশাসন আরম্ভ হয়েছে ধর্মের বন্দনা করে। (ঐতিহাসিক দ্বারা অছশাসনটি নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা সবাই উদ্ভিষ্ট দেবতাকে মহাবান বৌদ্ধ দেবতা লোকনাথ মনে করেছেন।)

...কনাথঃ যঃ পুংসাং স্কৃতকর্মকলহেভুঃ।

সত্যন্তশোময়মূর্তি লোকধরসাধনো ধর্মঃ।

—“বিনি পুরুষের পুণ্যকর্মের কলহেভু, সত্য এবং তপস্বী ধর্ম মূর্তি, ইহলোক পরলোকের বিনি উপায়, সেই (জিলোক-) নাথ ধর্ম (অরক্ষক হোন)।”

এই বন্দনা ধর্মঠাকুরের পক্ষে বেশ খাটে। আরও একটা প্রমাণ আছে বলে মনে করি। তাত্রপটের শীর্ষে “...রাজ বিজয়সেনত” এই নামযুক্ত মোহর আছে। মোহরে এক দেবতার চিত্র। তার তলার রাজার নাম। বহু অরবুত দীর্ঘাঙ্গিত এক চক্র পিছনে করে বিকৃত পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন। তান হাত উর্ধ্বে উৎক্লিষ্ট, বাঁ হাত কোমরের কাছে। ধর্মঠাকুর বিকৃত— এইটুকু ছাড়া মৃত্তিকে ধর্মঠাকুরের বলবার কোন কারণ নেই। তবে পিছনের চাকাটি লক্ষ্যীয়! এ চক্র ধর্ম-চক্র, তবে বৌদ্ধশাস্ত্রের ধর্ম-চক্র নয়, সে ধর্ম-চক্র গোল। দীর্ঘাঙ্গিত চক্রটির পরিসীমায়েবা কুম্বাকৃতি। ধর্মঠাকুরের কুম্ব-প্রতীকের পেটের দিকে অনেক সময় চক্র আঁকা থাকত। এটি বক্রণের পাশ হওয়াও সমান সম্ভব। সুতরাং বন্দনা-শ্লোকের দেবতাকে ধর্মরাজ মনে করবার পক্ষে জোরালো যুক্তি আছে।

বাংলাদেশে ধর্মপূজার প্রথম স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় কুম্বাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে—

মন্তমাংস দিয়া কেহ বক পূজা করে ।

এ বক বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবতা মঞ্জুষার অথবা হিন্দু তান্ত্রিক দেবতা ভৈরব হতে পারে। কিন্তু যেভাবে বিবহরি-চণ্ডী-বালসী পূজার সনে বর্ণিত হয়েছে তাতে মনে হয় এ বক ধর্মঠাকুর ছাড়া আর কেউ নয়। এই প্রশ্নে কেন-উপনিষদের বক স্ববর্ণীয়, বদিও সেখানে মন্তমাংস দূরের কথা, পূজারও আভাস নেই। কেন-উপনিষদে বকের চলনা ধর্মঠাকুরের কাহিনীতে তাঁর জিদেবা পুজের চলনার কথা মনে করার। মহৎ বকের আবির্ভাব শুনে দেবতার পাঠালেন অগ্নিকে ব্যাপার জানতে। অগ্নি হাজির হতে বক বললেন, তুমি কে হে? অগ্নি বললেন, আমি আগুন, সব কিছু পোড়াতে পারি। বক তাঁর সামনে একগাছি তুণ দিয়ে বললেন, পোড়াও তো দেখি। অগ্নি তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়েও তুণখণ্ডকে দগ্ধ করতে পারলেন না। লজ্জিত হয়ে দেব-সমাজে কিরে এলেন। তারপর পাঠানো হল বাবুকে। তাঁকে দেখে বক বললেন, কে বট হে? বাবু বললেন, আমি বাবু, আমি বেগ দিলে কিছুই অচকল থাকতে পারে না। বক তুণখণ্ড এগিয়ে দিখে বললেন, নাড়াও তো বাপু খালটিকে। বাবু তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়েও সেটাকে নড়াতে সমর্থ হলেন না। বাবু খুঁ কালো করে কিরে এলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং চললেন বককে দেখতে। ইন্ড্রের আগমনে বক অতর্কিত হলেন। হতাশ হয়ে ইন্দ্র কিরে আগছেন, পথে

দেখা অশ্রু শোভাবতী সঙ্গে হৈমবতীর সঙ্গে। তাঁর কাছে ইন্দ্র জেনে নিলেন বন্ধ কে। ধর্ম পুরাণের সৃষ্টি কাহিনীতে আছে, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর জিহেবা জন্মাবার পর বহুকার সেনেন তপস্তারত পিতা ধর্মকে দেখতে। তাঁদের আগমন টের পেয়ে ধর্ম অস্তিত্ব হইতেছিলেন।

বৃন্দাবনদ্বারের সমসাময়িক চূড়ামণিলাল তাঁর গৌরাঙ্গবিজয়ে গৌরাঙ্গের পরাধাতা প্রসঙ্গে তাপনপুরের কাছে ধর্ম ঠাকুর ও মনসার তৎকালপ্রসিদ্ধ মন্দিরের উল্লেখ করেছেন—

বাহাগলপুর তেজি বাইতে উত্তরে।

দেখিলত ধর্ম রাজ মনসার ঘরে ॥

### ভিন

কোন কোন ধর্ম পুরাণে সৃষ্টির উপক্রমে নীল ও অনিলের উল্লেখ আছে। “বিজ” লক্ষণের মতে নীল-অনিলের সংযোগে শূন্যবিষয়ঙ্গমী আদিদেব ধর্মের উৎপত্তি। লক্ষণের অনিলপুরাণে ধর্ম-কাহিনীর সঙ্গে নাথ-তত্ত্বের সন্ধি হয়েছে। তাই এখানে—

মন হব অনিল পবন হব নীল।<sup>৩</sup>

শূন্যতরে করতার সৃষ্টিলা শরীর।

ঋগ্বেদের ‘নারদীয় সূক্তের স্বধা-প্রবর্তির সঙ্গেও নীল-অনিলের মিল রয়েছে। অরুণি কাষ্ঠত্বের মন্থনে যেমন অগ্নির উৎপত্তি এখানেও তেমনি নীল-অনিলের সংযোগে আদিদেবের আবির্ভাব।

দেবতা রূপে নীলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব খুব ব্যক্ত না হলেও একেবারে লুপ্ত নয়। চৈত্র-সংক্রান্তিতে শিবের পূজন হয়। তার আগের দিন হয় নীলের পূজা। এখনকার দিনে তা নীলের উপবাস বলে মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত। কল্পলোহিতের সঙ্গে নীলের সম্পর্ক বাংলার লৌকিক ধর্মাহুষ্ঠানে কেমন রূপ নিয়েছিল তার একটু ইঙ্গিত অত্যন্ত অনিশ্চিত ভাবে পেরেছি বড়ু চণ্ডীদানের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে। রাধা নিজের লাস-বেশের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন—

খোঁপা পরতেক মোর জিহপ-ঈশ্বর হর

কেশপাশ নীল বিভ্রমানে।

এ উপমা থেকে অজ্ঞে অজ্ঞান করা যায় যে, এখনকার শিবলিঙ্গের গৌরীপট্টই একদা ছিল শিবলিঙ্গের পাঠ নীল, যেমন ধর্মপাদকার পাঠ কৃষ্ণ।

শিবের আধাররূপে খুব স্বাভাবিক ভাবেই নীল কোথাও কোথাও নীলাবতী রূপে ব্রীহেবতার পরিণত হয়েছেন। মুকুন্দরায়ের চতুর্থকালে ‘নীলা’ চতুরই নামান্তর। কালকেতুর চৌতিশান্তবে পাই,

নিভন্তনামিনী নীলা নীলপতাকিনী।

নীলভারা, নীলসরস্বতী প্রভৃতি তান্ত্রিক দেবীর নামও অবশ্যই।

নীলের উপবাসের দিন সন্ধ্যায় সন্তানবতী মহিলারা সন্ধ্যায় শিবের কাছে বাতি জালিয়ে দেন। একে বলে “নীলের ঘরে বাতি”। এক সময় মনে হয়েছিল এ রীতি বুঝি ‘নীলাবতী’ কথাটি ভেঙ্গে উৎপন্ন। এখন মনে হচ্ছে তা নয়। নীল (যদি আললে নীর না হয়) হয়ত বেদের মাতরিশা, অগ্নি-মহনজাত অগ্নি।

শিবের নীল-নীলাবতীর সঙ্গে ধর্মের নীল-অনিলের এবং অধর্ষবেদের ব্রাত্যপুজাবলীর নীল-লোহিতের ও মাতরিশা-পবমানের তুলনা করা যায়।

নীলমন্তোদয়ং লোহিতং পৃষ্ঠম্ ৪

নীলেনৈবাপ্রিয়ং ব্রাহ্মবাং প্রোর্ণোতি লোহিতেন দ্বিষন্তং বিধাতীতি  
ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি ৫

মাতরিশা চ পরমানন্ত বিপথবাহৌ... ৬

—‘এ’র পেট নীল, পিঠ লোহিত।

‘নীলের ঘারা অগ্নির শত্রুকে বেঁধে ফেলেন; লোহিত দিয়ে ষেবকারীকে বিঁধে ফেলেন।

‘মাতরিশা ( অগ্নি ) আর পবমান ( বায়ু ) এ’র বিপরীত পথের বাহন।’

### চার

উপরের আলোচনা থেকে জানা গেল যে ধর্মঠাকুরের কাহিনী ও তাঁর পূজা-অর্চনাদের সঙ্গে বৈদিক অধ্যাক্ষভাবনার ও অর্চনাদের অপরিচ্ছিন্ন যোগাযোগ আছে। এর থেকে কেউ যদি মনে করেন যে ধর্মঠাকুরের ঐতিহ্যে ও অর্চনানে অবৈদিক ও অর্বাচীন কোন ভাব বা বস্তু নেই তাহলে তুল করবেন। ধর্মঠাকুরের পূজা চলে এসেছে দেশের তথাকথিত নিরন্তরের জনগণের মধ্যে দিয়ে। এঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণবিহার এঁদের অধিকার ছিল না। বাংলা দেশে ব্রাহ্মণেরা ব্যাপক ভাবে আসতে শুরু করেন গুপ্তরাজাদের সময় থেকে। তাঁরা বাংলাদেশের প্রাচীনতর অধিবাসী নন। তাই ধর্মপূজার সঙ্গে তাঁদের সংগ্রহ ছিল না।

পুরানো ব্রাহ্মণ বীরা আগে থেকে ছিলেন তাঁরা নবাসভ ব্রাহ্মণদের দ্বারা কোণঠাসা হয়ে পড়েন। এঁদের অনেকে পরে বর্ণ-ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। কেউ কেউ বা জাত খুঁয়ে ছিলেন এমন অল্পমানও অসম্ভব নয়। চণ্ডালদের উপবীত-সংস্কারের উদ্দেশ্য করেছেন বৌদ্ধ আচার্য অশ্বরথজ (দ্বাদশ শতাব্দী)। রামাই পণ্ডিতের কাহিনীতে এই প্রাক্তন জাতিচ্যুত ব্রাহ্মণদেরই অল্প-বোধগার চেষ্টা। এঁরা মৃত্ত উপবীতধারী ছিলেন না, ছিলেন তাম্রপবিজ্ঞারী। এঁদের বেশ কক্সামবকুর বাইরে। অধর্ববেদের ত্রাত্য-মৃত্তগুলি এমনি অ-ব্রাহ্মণ্য-পন্থী প্রাক্-বৈদিক আর্ষদের লুপ্ত ভাণ্ডারের টুকরা। ত্রাত্য—ত্রতের উপাত্ত, ত্রাতের উপাত্ত এবং বৈদিক-ত্রতবাহু। এই তিন অর্থেই অধর্ববেদের ত্রাত্য বাংলা সংস্কৃতির ধর্মঠাকুরের প্রাচীন প্রতিরূপ। ধর্মঠাকুরের পূজা ত্রত ছাড়া কিছু নয়। ধর্মঠাকুরের পূজার বহু লোকজনের আবশ্যক, তিনি বহু লোকের পূজা সার্ব-জনিক দেবতা, ব্যক্তির উপাত্ত মাত্র নন। সুতরাং তিনি ত্রাত্য। আর তাঁর পূজক হাড়ি-ডাম-চণ্ডাল প্রভৃতি অত্যন্ত অ-ব্রাহ্মণ জাতি। সুতরাং ত্রাত্য তো বটেই।

ত্রাত্যের যে বর্ণনা অধর্ববেদের পঞ্চদশ কাণ্ডে আছে তাতে কোন কোন বিষয়ে ধর্মঠাকুরের পূজার সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যায়। ধর্ম রথে চড়ে বিজয় করেন, ত্রাত্যও তাই। ধর্ম রাজা, ত্রাত্যেরও রাজবৎ আচরণ। ধর্ম-ঘরের চার দিকে চার দরজা, তাতে চার প্রহরী। ধর্মের রাজপাট সিংহাসন, ত্রাত্যেরও আসন্দী বা দেবতারী তাঁকে এনে দিয়েছিলেন বলবার জন্তে।

### পাঁচ

ধর্মঠাকুরের অর্বাচীন ও অনু-আর্ষ (এখানে ‘আর্ষ’ বলতে বুঝি প্রাক্-বৈদিক ও বৈদিক সংস্কৃতিসমূহ) রূপের স্পষ্ট প্রকাশ দেখি ধর্মমঙ্গল কাব্য-রচয়িতাদের নিজস্ব বিবাসে। ধর্মমঙ্গল দ্বারা লিখেছিলেন তাঁরা সকলেই ধর্মের প্রত্যাদেশের দোহাই দিয়েছেন। সন্ন্যাসী ককির অথবা ধর্মপণ্ডিত কিংবা সিপাইয়ের বেশে প্রত্যাক্-গোচরে, অথবা ব্রাহ্মণের বেশে কিংবা নিরাকার রূপে অপ্রত্যাক্ জন্মের ঘোরে তাঁরা ধর্মঠাকুরের আদেশ পেয়েছিলেন। ধর্মের আবির্ভাব তাঁদের মনে জন্মের সকার করেছিল এবং এ আবির্ভাব সাধারণত ঘটত শনিবার ঠিক দুপুর বেলা। ঠিক দুপুরবেলায় ত্রাত্যের আবির্ভাব লোক-সংস্কারের অঙ্গবায়ী। ছেল-ভুলানো ছড়ার বলে,

ঠিক দুপুর বেলা

ভূতে মারে ঢেলা।



ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবি রূপরায় চক্রবর্তী ( সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ) লিখেছেন যে তিনি তেপাকুরের মাঠে ধর্মের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন আখা সন্ন্যাসী আখা-কবির রূপে । তাঁর কিছু পরবর্তী কালের কবি রামদাস আদক ও নীতারায় দাস দুজনেই নিপাইবেশী ধর্মের সামনে পড়েছিলেন । অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মানিকরায় গাঙ্গুলি ধর্মপণ্ডিতরূপী ঠাকুরের দর্শন পেয়ে প্রত্যার না করার পরে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরূপী ধর্মের কাছে তৎসম্মত হয়েছিলেন । জয়ের ঘোরে স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন কামকান্ত রায় । এঁদের সকলেরই দিশা লেগেছিল ।

দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার কোন কোন স্থানে নিম বা অস্ত গাছে সন্ন্যাসী ঠাকুরের বা ব্রহ্মচারীর পূজা হয় । ইনিই ধর্মমঙ্গল-কবির প্রত্যাশেশ-দাতা ধর্মঠাকুর । এঁর উলটা পিঠ অপদেবতা ব্রহ্মদেবতা ।

### ছয়

আর একটা কথা বলবার আছে ।

আমাদের লৌকিক দেবতাদের ( অর্থাৎ যে সব দেবদেবীর পূজা এখন চলে তাঁদের ) একটি করে নির্দিষ্ট গাছ আছে, অথবা একটি করে নির্দিষ্ট গাছের পাতা বা ফুল বা ডাল তাঁদের পূজার লাগে । যেমন বিষ্ণুর তুলসী, শিবের বেল, চণ্ডীর জবা, বনভূগার শেওড়া, বটীর পাকুড় ( বা অশ্বখ ), মনসার নিজ । ধর্মের পূজার কোন গাছের বা পাতার আবশ্যক নেই । কিন্তু তাঁর নির্দিষ্ট গাছ বট, ঝগ্বেদের “হুশলাশ বৃক” । এমনি অকর বটের নীচেই ধর্মের আদি পীঠস্থান জনস্বাথ কেন্দ্র, যেখানে

দেউল নির্মাণ হৈল অকর বটতলা ।

### পাদটীকা

১ “সাক্ষী প্রত্যক্ষং মৃতং নাম্ভ্যাত । তাং কপাঙ্কন্ ধর্মি কহি” তে প্রাজমুর্ভেতি” [ কপিটলকট-সংহিতা ৪.৯ ] ।

২ ধর্মপুঙ্খাবিধান, প্রায়শ্চিত্ত নীতিমূল কল্যাণপাথ্যের সম্পাদিত, পৃঃ ৮৮ ।

৩ ‘নীল’ পাঠ কম্পনা করলে পরস্পরে মিল হয় । কে জানে হস্ত লেখকের নীলই ছিল । সুতরাং নীল-অনীল = জল-সাদা । নীল = নীর = কার্দ্দময় খট, অনীল = নিরঞ্জন ।

## শ্রীক্ষেত্রের ঠাকুর

পুরীধাম একদা বাঙালীর ঘরে শ্রীক্ষেত্র নামে সম্বিক পরিচিত ছিল। এখন তা, লব্ধ কান্দণেই, পুরানো নামটি ধারিত্ব হয়েছে। পুরী এখন মধ্যত বেড়াবার স্থান। কিন্তু দুটি নামই পূর্ণনামের ব্যবহৃত বর্ণিত রূপ। ‘পুরী’ এসেছে ‘পুরুষোত্তম পুরী’ এবং ‘ভগৱাণ পুরী’ থেকে আর শ্রীক্ষেত্র হল ‘শ্রী’-র অর্থাৎ দেবী লক্ষ্মীর অঙ্গন। নামটি ‘পুরুষোত্তমক্ষেত্র’ এবং ‘ভগৱাণক্ষেত্র’ থেকেও আসতে পারে। ঠিক শ্রীক্ষেত্র অর্থে ‘শ্রীধাম’ দেখা যায় একাদশ শতাব্দীর গোড়াকার একটি তাম্রশাসনে “শ্রীধামঃ পুরুষোত্তমস্ত মহতো নারায়ণস্ত প্রভোঃ”। তবে সম্পূর্ণ এই সূত্রেই নয়, গোড়ার বৈকুণ্ঠের পুণ্য স্থান নামের আগে “শ্রী” যোগ করতেন। যেমন শ্রীধও। নামটির ব্যাখ্যা পরে লব্ধ্য।

### দুই

শ্রীক্ষেত্রের দেবতা মন্দির মধ্যে ত্রয়ী মূর্তি তবে একত্র সমুদ্র নয়, স্বতন্ত্র এবং পাশাপাশি অবস্থিত। দুটিকে মূর্তি পুরুষ, মাঝখানে মূর্তি নারী। মূর্তিগুলি ভারি কাঠের গুঁড়িতে অনিপুণভাবে শিল্পের পুতুলের ধরনে খোদাই। লাজলজ্জা বাদ দিলে পুরুষমূর্তিঘর থেকে ত্রয়ীমূর্তিটি স্বতন্ত্র করা যায় শুধু এটির খর্বতা থেকে। মাঝের মূর্তিটি পাশের মূর্তিঘর থেকে ছোট। বামিকের পুরুষমূর্তিটির রঙ কালো। ইনি যে বিষ্ণু-কৃষ্ণের প্রতীক তা জানাবার অসম্ভব। কখন থেকে মূর্তিতে রঙ লাগানো আরম্ভ হয়েছে তা জানা যায় না।

এই ত্রয়ী মূর্তি বলরাম, হুতরা ও পুরুষোত্তম (মাধব-বিষ্ণু-কৃষ্ণ) বলে পূজিত হয়ে আসছেন অন্তত তৃতীয় অনন্তভীমের সময় থেকে (১২০৫ খ্রীষ্টাব্দ)। তার আগে পুরুষোত্তম ছাড়া আর দুটির নাম স্পষ্টভাবে জানা যায় না। হুতরার অর্থাৎ দেবীমূর্তির উল্লেখ পাওয়া যায় নানাভাবে। গোড়ার দিকে, অর্থাৎ দশম একাদশ শতাব্দী থেকে, দেবী অল্পলিখিত হলেও ইদিকে ‘শ্রীলক্ষ্মী’ বলে স্বীকৃত। (রাজরাজেশ্বর শাসনের উদ্ধৃত অংশ অবগত করুন)। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইনি ভদ্রাধিকা নামে উল্লিখিত হয়েছেন। ‘ভদ্রাধিকা’ বানে ভালো মেয়ে, ‘হুতরা’ মানেও তাই—অতি ভালো মেয়ে। হুতরা ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে—

অনবদীপের কথা চক্রিকার প্রতিষ্ঠিত জয়ী দেবতার উল্লেখ থেকে—সুতরাং নাম চলে এসেছে। বার্কজের পুরাণে চতীর নামান্তর পাই ‘তরা’ তা এখানে স্মরণীয়।

এখান দেবতার নাম জগন্নাথ। প্রথমে পুরুষোত্তম, তারপর পুরুষোত্তম-জগন্নাথ, তারপরে চতুর্ভুজ শতাব্দীর গোড়াতেই পাই জগন্নাথ। অধ্যাপক কে. নী. মিশ্র তাঁর ‘কালটু অব জগন্নাথ’ ( ১৯৭১ ) গ্রন্থে বলেছেন যে, অনেকদিন থেকেই উড়িষ্যা ও আশেপাশে শিব, দুর্গা ও বিষ্ণু সমবেত মূর্তির উপাসনা প্রচলিত ছিল। ঐক্যের জয়ী দেবতার সঙ্গে মেলাতে গেলে সহনা মনে হতে পারে যে, ডানদিকে মূর্তি বা বলভদ্র ( বলরাম ) নামে পূজিত হয় তা আসলে শিবের প্রতীক মূর্তি ছিল। শিব ও বলরামের মধ্যে কিছু মিল আছে সন্দেহ নেই। উভয়েই গৌর বর্ণ, উভয়েই সর্পসম্বন্ধিত এবং জলের সঙ্গে উভয়েরই সংযোগ আছে। শিবের মাথায় গজা, বলরাম ( শেব ) সমুদ্রাশ্রিত। তবুও ঐক্যের বলভদ্র শিব নয় এবং কখনও ছিলেন না। এই মন্তব্য দুর্গা ও সুতরাং সম্বন্ধেও প্রযোজ্য, যদিও—পরে দেখাব—দুর্গা ও সুতরাং পুরাণ-কাহিনীতে গোড়ার অভিন্ন ছিলেন।

## ডিন

যখন থেকে ইতিহাসে ঐক্যের দেবতার উল্লেখ মিলছে তখন থেকে কেন, সম্ভবত তার অনেককাল আগে থেকেই, জয়ীর মূলদেবতা ছিলেন একজন। আগে তিনি উল্লিখিত হতেন ‘মাধব’ বলে। বিষ্ণুর এক নাম মাধব। তবুও এ নামটির এক বিশেষ তাৎপর্ষ ছিল। যিনি মধুর অর্থাৎ সুখাদ্যা-পানীয়ের ভাণ্ডারী তিনি মাধব। ঐক্যের প্রধান বিশেষত্ব এখানকার ‘ভোগ’-এর বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য। ঐক্যের নামটিও সমুদ্রোত্তীর্ণ লক্ষীর ভাণ্ডার দ্যোতনা করে। বিষ্ণুর মাধব নামটি যে কলিজ অকলে ঐসীর চতুর্ভুজ শতাব্দী থেকে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল তা অধ্যাপক মিশ্র দেখিয়েছেন। পুরাণে দেখতে পাই যে মাধব নামটি কক বলরামের মত হুতারজন বহুবংশীর বীরের অভিধা বা সাধারণ নাম। এই নৃত্যে বিষ্ণু-কৃষ্ণের এক বিশিষ্ট নাম হয়েছিল ‘নীলমাধব’। ঐক্যের জয়ী দেবতার প্রধানের নাম তাই পাই নীলমাধব। ঐক্যের ঠাকুরের পীঠস্থান একলা ছিল সমুদ্রের উপরে উঁচু টিলায় বা পাথরের ভিত্তিতে ( এবং এখন যেখানে আছে তাও সমুদ্রের অধূরে এবং আশপাশের সমতল থেকে কিছু উঁচু বটে )। এই কারণে দেবস্থানটির নাম হয়েছিল ‘নীলচল-ক্ষেত্র’ অর্থাৎ নীলমাধবের অধিষ্ঠিত অচলায়তন ভূমি-খণ্ড। ঐক্যের প্রধান দেবতা পুরুষোত্তমের নীলমাধব নাম অর্বাচীন নয়। স্মারি

শিখের (নবম-দশম শতাব্দীর নব্বিকাল) অনর্থ-নাথবের প্রত্যাশনা থেকে জানা যায় যে, নাটকটি নীলনাথ পুরুষোত্তমের এক “বাজা” (অর্থাৎ উপন্যাস, নোলবাজা, চন্দনবাজা অথবা রথবাজা) উপলক্ষে রচিত হয়েছিল (‘তো তো লবণবেলাবনালিতমালতরকমলত / ত্রিভুবন-মৌলিকমণ্ডন-বহানীলবর্ণে :…… ভগবতঃ পুরুষোত্তমত বাজারাম উপহানীত-সত্যনামঃ”)।

নীলাচলক্ষেত্র কলিযুগে এবং লমুজকুলপ্রান্তে হলেও দেবতার নাম-বংশ লক্ষীর্ণ নীলবস্ত্র ছিল না। মধ্য ভারতে বালব পর্বতও যে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ছিল তার বখেট প্রমাণ আছে। মধ্যভারত ও রাজপুতানার এবং অভ্যন্তর অঞ্চলের রাজরাজড়ারা যে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে প্রচুর ধনরত্নাদি দান করতেন তা নাগপুরে প্রাপ্ত একটি প্রত্নলেখ থেকে (১১০৪ খ্রিষ্টাব্দ) জানা যায়।

আগলে বাদব-নাথব ঠাকুরের উপাসনা কলিযুগে অকালেরই বৈশিষ্ট্য ছিল না। মধ্য ভারতের আরণ্য-মেখলা একদা যার প্রান্ত এলে ঠেকেছিল নীলাচল পর্বত, যে ‘বত্তীর্ণ অকলকে টলেমির মানচিত্রে দশান’ বলে দেখানো আছে, তার স্থানে স্থানে এই জরী দেবতার পূজা দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল। (যেবদ্ব্যুত কালিদাস দশান দেশের গ্রামে গ্রামে চৈত্যবহনতার উল্লেখ করেছেন। বতই মনে হয় কালিদাস উল্লিখিত চৈত্য বৃষ্টি বোদ্ধ পূজা তুণ ছাড়া কিছু নয়। এ অসুস্থমান সম্পূর্ণ ঠিক নয়। চৈত্য ছিল গোড়ার লম্বা-ভাঙ্গতুণ, পরে হয় বাস্তবদেবতার প্রতীক তুণও, সম্ভবত এর মধ্যে গৃহস্থবাড়ির যাত্রাকর্তার অস্থিভগ্নও সংগৃহীত থাকত। বেদের আমলেই বাস্তবদেবতা দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। বোদ্ধ-তুণ প্রাচীনতর এই বাস্তব-তুণেরই ভের টেনে এসেছিল। হয়ত শ্রীক্ষেত্রের পুণ্যস্থল নীলাচলে মন্দির পড়ে ওঠার বহু বছরকাল আগে এমনি এক তুণ ছিল অথবা তুণরূপে কল্পিত পুণ্য বস্ত্র ছিল। এখানে মনে পড়ে মহাভারতের বনপর্বে পাণ্ডবদের তীর্থবাজা প্রসঙ্গে কলিকদেশে এক শৈলের উল্লেখ আছে যার উপর চড়লে মাহুব স্বাধীন হয়। পরে আলোচনা করছি।)

কলিকাতা মিউজিয়মে বেনারসের কাছে সংগৃহীত একটি প্রস্তরকলক আছে। কলকটির শীর্ষে তিনটি মূর্তি আছে, দু পাশে পুরুষ, মাঝখানে নারী। সকলে উপবিষ্ট। পুরুষ মূর্তিদের হাতে গদা, নারী মূর্তি ভোড়হাত। নীচে পাঁচ ছত্রলিপি আছে সে লিপি অংশত ভগ্ন ও অস্পষ্ট। লিপির আরম্ভ এই, “ও নমঃ শ্রীতাইজ নাথব-ভট্টারকতঃ……”। শ্রীপ্রিয়তোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রস্তর কলকের পরিচয় প্রকাশ করেছিলেন এপিগ্রাফিক সোসাইটির জার্নালে। তাতে

জিনি কলেছেন যে, হাবি তিনটি হল উপাসক উপাসিকার। কিন্তু গঙ্গা হাতে  
স্থিতি দুইটি উপাসকের হওয়া সম্ভব নয়। “ঐতিহাসিক মাধব ভট্টাচার্য”—যে  
বুঝতে কষ্ট হয় না যে কলকাতার উৎকর্ষ স্থিতিগুলি সম্ভবত মাধব তাই (ও বোন)  
দেবতাদের—অর্থাৎ ঐক্যের দেবতাদের সহিত অভিন্ন। লিপিদ্বয়ে অনুমান  
হয় প্রস্তরকলকটির নির্মাণকাল নব্ব-দশম শতাব্দী।

### তার

আধুনিক কালের পণ্ডিতদের দৃষ্টিতে ঐক্যের দেবতার আদিত্তে ছিলেন  
বৌদ্ধ ত্রিপুর। এই চিন্তার কয়েকটি সূত্র আছে। হিন্দুর দেবতা এবং প্রচণ্ডভাবে  
মাত্র দেবতা হওয়া সত্ত্বেও প্রচলিত হিন্দু শাস্ত্রীয় ও পৌরাণিক দেবদেবীর সঙ্গে  
এই স্থিতিতে কোন মিল নেই। পূজা পরিচর্যারও কোন মিল নেই।  
ভক্তাচারের বেশ ব্যতিক্রম আছে, প্রসাদ-ভাত সন্ধি বলে গণ্য নয়, প্রসাদ  
থেকে হাত না ধুলেও চলে। তার উপর আধুনিক পণ্ডিতদের বিশ্বাস যে এ  
অকালে অশোকের কাল থেকে বৌদ্ধ (এবং জৈন) ধর্ম প্রচলিত ছিল। সর্বশেষ  
উড়িষ্যার সাহিত্যে ও চিত্রকলার প্রতিকলিত ঐতিহ্যে দশাবতারের অন্তর্গত বুদ্ধ  
অবতার ভগবান। (কিন্তু এ ঐতিহ্য উড়িষ্যার আধুনিককালের বৌদ্ধ  
শতাব্দীর পরবর্তী)। অল্পকাল সময়ের বাংলা চিত্রকলার বুদ্ধাবতার (বৌদ্ধমূর্তি)।  
তাই ধরে নেওয়া হয়েছিল (বোধ করি এখনও হয়ে থাকে) যে ভগবান-ভক্ত-  
বলরাম বৌদ্ধ ত্রিপুরের বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘের স্থানীয় হিন্দু সংস্করণ। যারা এই মত  
পোষণ করেন তাঁদের ভাষা উচিত যে ধর্ম (অথবা সংঘ) নারী রূপ পাবে কেন ?  
বৌদ্ধ ত্রিপুরকে ব্রাহ্মণ্য ত্রিদেব ব্রাহ্ম-বিকৃ-শিব করলেই তো অনেক ভালো হত।  
পণ্ডিতদের এমন বিশ্বাসও ছিল (বা এখনও আছে) যে নীলাচল প্রথমে বৌদ্ধ  
স্থল ছিল, এর মধ্যে বুদ্ধের মন্দির ছিল এবং সে মন্দির খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে লিহলে  
অপনীত হয়েছিল। এ মন্দির সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র প্রমাণ অথবা প্রমাণাত্মক  
নেই। তবে নীলাচলক্ষেত্রে সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে যে (বাসুদেবের ?) স্থল  
ছিল তার কিছু প্রমাণ আছে। পরে বলছি।

বৌদ্ধভাবনার পরে যোগানো হয়েছে “অনার্য” কল্পনা। ঐতিহাসিকদের  
ধারণা আমাদের সংস্কৃতির অনেক কিছুই এরূপের প্রাচীনতর অধিবাসী যারা  
আর্য, অর্থাৎ সংস্কৃত অথবা তৎসম্পর্কিত কোন ভাষা বলত না, তাদের কাছ  
থেকে এসেছে—বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য ইত্যাদির চিত্র-প্রলেপমণ্ডিত

হয়ে। বিড়ম্ব অহুমান হিসেবে এতে খুঁত ধরবার কিছু নেই। সংকট অবধা সংকুচিতসম্পর্কিত কোন ভাবা এদেশে মহত্ববানের আদিকাল থেকে বলা হয়ে এসেছে এমন কথা কোন দ্বির্বী পণ্ডিত কখনো ভাবেননি। হুতরাং প্রভাবটি নির্দোষ এবং প্রায়-বৃত্তান্তিক। মুশকিল হয় প্রভাবটির প্রয়োগে। বৃত্তান্তিক পণ্ডিতেরা মনে করেন এখন যে ভারতের আদিবাসী রয়েছেন তারা এবং অভ্যন্ত অহুমানত সম্প্রদায়ের লোক তারা আছে তাদেরই বহু বহুকালের পূর্ব-পুরুষই এদেশের প্রাগাৰ্ঘ অধিবাসী ছিল। এ কথা অস্বীকার করা যায় না, কেননা এমন ব্যাপার অনেক দেশেই ঘটেছে। মুশকিল হচ্ছে, এ দেশের প্রাগাৰ্ঘ অধিবাসীদের সম্পর্কে আমরা কিছুই অবগত নই। দু'চারটি পাথরের অস্ত্রশস্ত্র, কিছু ভাঙা হাড়িকুড়ি এবং এক আখটি হাড়গোড়ের টুকরা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি বা স্থানিকভাবে প্রাচীন এবং প্রাগাৰ্ঘ বলে স্বীকার করা যেতে পারে। বাই হোক বৌদ্ধ মতবাদীদের পরে এগিয়ে এলেন এই অনাৰ্ঘ মতবাদীরা। এঁদের অভিমত বৌদ্ধপ্রভাববাদীদের মতো অতটা শূন্যগর্ত নয়। ঐক্যের দেবমূর্তির উপাদান নিমকাঠ একদা আরণ্য শবরজাতি যোগান দিত, হুতরাং নৌলম্বাধব আগিতে তাঁদেরই দেবতা ছিলেন। কিন্তু শুধু এইটুকুর উপর নির্ভর করে অমন সিদ্ধান্ত করা যায় না। সেকালের কোন একালেও নিমগাছের কেউ চাব করে না। আপনিই হয় এবং সেকালে আরণ্য অকল বহুবিভীর্ণ ছিল। হুতরাং কাঠ আনতে হত জল থেকেই এবং সে কাজ লহজে পাওয়া যেত আরণ্যক শবর-বারা আরণ্যকুমির অধীশ্বর—তাদের কাছ থেকেই। শবরদের দ্বারা নিমকাঠের যোগান ছাড়া ঐক্যের দেবতার অহুতানে এমন কোন কিছু দেখা যায় না বা ‘অনাৰ্ঘ’ বলে ছাপ মারা যায়। (ভাত খেয়ে হাত না ধোয়া অনাচার হতে পারে, তবে অনাৰ্ঘ আচার নয়।) ঐক্যের ঠাকুর যদি অনাৰ্ঘ বীজ থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকেন তাতে আপত্তির কিছু নেই। আপত্তি হল এই যে, সে বীজ মহাকালের পর্তে নিঃশেষে হজম হয়ে গেছে।

## পাঁচ

পূণ্যভীর্ণ ঐক্যের প্রথম আভাস রয়েছে মহাভারতের বনপর্বে চতুর্থাধিক শততম অধ্যায়ে বৃষ্টিবীরের ভীর্ণবাজা প্রসঙ্গে। উপরুক্ত অংশের সংক্ষিপ্ত অহুমান দিই। ভীর্ণবাজার লোমশ মূনি যেন দেখা হয়েছেন। বর্ণনা তাঁরই উক্তি।

অকস্মেৎ কোশিকী নদী ধরে যুধিষ্ঠির সব তীর্থ ও মন্দিরাদি দেখলেন । তারপর তিনি এলেন গঙ্গা-সাগর সন্ধ্যায় । এখানে পাঁচশ নদী এসে মিলেছে । সেই সন্ধ্যায় তিনি স্নান করলেন । তারপর তিনি ভাইদের নিয়ে চললেন সমুদ্রতীর ধরে কলিকতেশে । সেই কলিকতেশে আছে বৈতরণী নদী, সেখানে স্বয়ং ধর্ম ও সাধাব্য পাবার জন্যে দেবতারের উদ্দেশে বজ্র করেছিলেন ।..... এইখানে দেবতারের ক্রোধের বজ্র-ভাগ পাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন ।... তারপর পাণ্ডবেরা সমগ্র বৈতরণীতে অবগাহন করে পিতৃপুরুষের স্মরণ করলেন ।

জালপুর ছাড়িয়ে এগিয়ে তাঁরা আরণ্যভূমিতে প্রবেশ করলেন । লোমশ বললেন, যুধিষ্ঠির এই যে সব পাহাড় জঙ্গল দেখছ, একলা ভ্রম্মা বজ্র করেছিলেন এবং সেই বজ্রের দানরূপে এই সব কশ্যপ মুনিকে দান করেছিলেন । তারপর এই ভূস্থান কৃতলে নেমে যেতে থাকে । তখন পৃথিবীকে প্রসন্ন করবার জন্যে কশ্যপ সমুদ্রের কূলে একটু ভূমি উন্নত 'বেদী' করে দিয়েছিলেন । লোমশ বললেন,

সেই বেদী ( পৃথিবী ) সমুদ্রে পড়ে গিয়ে তারপর এই বেদী আশ্রয় করে রয়েছেন । এতে আরোহণ করলে পরে ভূমি একলা সাগর উত্তরণ কর গিয়ে । আমি তোমার স্বস্ত্যয়ন করে দিচ্ছি যাতে ভূমি আজই ( বেদীতে ) অধিরোহণ করতে পার । ( স্বস্ত্যয়ন না করে ) সাধারণ মানুষ বেদীকে ছুঁলেই বেদী সাগরে অন্তর্ধান করবেন । যুধিষ্ঠির, এই 'সত্যবাক্য' ভগ্ন করতে করতে ভূমি সাহস করে বেদীতে উঠে যেও :

ও নমো বিশ্বগুণায়

নমো বিশ্বরূপায় তে ।

সান্নিধ্যং কুরু দেবেশ

সাগরে লবণাস্ত'সি ॥

অগ্নিমিত্রো যোনিরাপোণ মেঘো

বিকো রেতস্বম্ অমৃতত নাভিঃ ।

তার পরে এই "সত্যবাক্য" বলে ভূমি সমুদ্রে অবগাহন করো,

অমিত্ত তে যো'নরিড়া চ মেঘো

রেতোধা বিকোরমৃতস্য নাভিঃ ।

অন্যথা, ভূমি কুশাগ্রেও সমুদ্র স্পর্শ করো না ।

লোমশের কথামত যুধিষ্ঠির কাজ করেছিলেন ।

বেদী-আরোহণ ও সমুদ্রস্নান বয় ছাটি ভিষ্টত হচ্ছে দেখা একটি বৈদিক

খাঁচের ছটি স্নোকাঁধ। অর্ধ অগ্নি মিত্র এবং অগ্নি দেবীরা তোমার বোনি, তুমি বিকূর বীধ, অকৃতের আধার। অগ্নি তোমার বোনি এবং ইচ্ছা (অন্ন-পানীয়) দেহ, বিকূর তুমি বীর্ঘান, অকৃতের উৎপত্তিস্থল।

মহাভারতের এই বিবরণের মধ্যে কিছু লতা থাকলে বুঝতে হবে যে, একদা-প্রায় হাজার দেড়েক বছর আগে অকৃত কলিদের সমুদ্রকূলে কোথাও একটি পুণ্য ভূগুণ অথবা শৈল ছিল এবং লোকের বিশ্বাস ছিল যে, সমুদ্র নিউরে পার হতে গেলে সেখানে পূজা দেওয়া অথবা প্রজ্ঞাপন আবশ্যিক। আরও, সেখানে বৈদিক ধরনের পুণ্য রীতি ছিল। এখনকার সঙ্গে মেলাতে গেলে এ স্থান যে নীলাচল তা বলতে হয়।

### ছত্র

শ্রীকৃষ্ণের জিদেবা হলেন অগ্নিরাধ, বলভদ্র, হুভদ্রা। অগ্নিরাধ হলেন মাধব বিকূ-কৃষ্ণ, বলভদ্র—সর্ষণ-বলরাম। হুভদ্রা নিয়ে একটু গোলমাল আছে। মহাভারতীয় কৃষ্ণ-কাহিনীতে হুভদ্রা বলরাম ও কৃষ্ণের ভগিনী (সহোদরা অথবা সমপিতৃকা নন, সম্পকিতা), অর্জুনের পত্নী, অভিমুখ্যর জননী, পরীক্ষিতের পিতামহী। কিন্তু বলরাম-কৃষ্ণের প্রথম দিকের কাহিনীতে হুভদ্রার নামই নেই। একই দিনে ভূমিষ্ঠ যশোধার কন্তা ও দেবকীর পুত্র দুজনে বদল হয়েছিল। যশোধার কন্তাকে দেবকীর লন্তান ভেবে কংস আছড়ে মারতে গেলে শিশুটি হাত পিছলে বেরিয়ে পড়ে আকাশে উড়ে যায় লম্বাচিল হয়ে এবং কংসের মৃত্যু যে অবশ্যজ্ঞাবী সে দৈববাণী করে। হরিবংশে ও বিষ্ণু-পুরাণে তিনি অরলোকে ইন্দ্রের ভগিনী বলে সংবর্ণিত হয়েছেন। হরিবংশে এঁকে ‘একানংসা (একানংশা)’ বলা হয়েছে। পরে বলা হয়েছে, ইনি যাদব-মাধবনের মধ্যে পালিতা হয়েছিলেন। এই হুভদ্রা একানংসাকে মহাভারতের হুভদ্রার সঙ্গে এক ভাবা যায়। হুভদ্রার ‘বলাধিকা’ নাম (বা অভিজা) বলভদ্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সূচিত করে। কবি-কল্পের চণ্ডীতে দেবীর নাম একবার পাওয়া গেছে “বলারু”—অর্থাৎ বলরূপা। এই কথা এ গ্রন্থে অর্জব। বলরাম ও হুভদ্রার জন্ম ব্রজে, হুভদ্রা দুজনে সম্পর্কে ভাই-বোন বটে। বলরাম ভোষ্ঠ, কৃষ্ণ হুভদ্রার সমবয়সী। ‘হুভদ্রা’ এবং ‘বলাধিকা’ (বলা অধিকা) দুই-ই ‘বলভদ্র’ নামের জের টানে।

বলভদ্র ও কৃষ্ণ এই মাধব দুজনের দলে হুভদ্রাও, হুভদ্রা “মাধব” ছিলেন



(যেহেতু তিনি তখন অবিবাহিতা)। (এখানে মনে করিয়ে দিই যে, মহাভারত-কাহিনীর স্তম্ভরায় সঙ্গে বিষ্ণুপুরাণ-হরিবংশের যশোধা-নন্দিনীর সরাসরি যোগ নেই।) বাহুদেব (বৃক), লক্ষ্মণ (বলরাম), প্রহ্লাদ (বাহুদেব পুত্র), অনিলক (প্রহ্লাদ পুত্র) এবং শাশ (বাহুদেব পুত্র) একসাথে “পঞ্চবীর” রূপে পূজিত হতেন, এবং পরে শাশকে বাহু দিয়ে “চতুর্বাহু” কল্পনা হয়েছিল, তা ঐতিহাসিকরা জানেন। অতএব ঐতিহ্যে পুরুষোত্তম (বৃক), বলভদ্র ও একানঙ্গা (স্তম্ভরায়) এই তিন “মাধব ভাই” নামে যে পূজা পেতেন তার ঐতিহাসিকগত প্রমাণ আগে উপস্থাপিত করেছি। এই ঐতিহ্য প্রাচীনতর; কেননা এ সরাসরি এসেছিল বৈদিক ঐতিহ্য থেকে স্বতন্ত্র পথে এবং সে বৈদিক ঐতিহ্য এসেছিল আরও অনেক পুরানো ইন্দো-ইউরোপীয় ঐতিহ্য থেকে। সে কথা এখন বলছি।

সংস্কৃত, আর্যসী, আরমানী, গ্রীক, লাতিন, গোথিক ইত্যাদি ভারতে, ইউরোপে ও মধ্যবর্তী কোন কোন দেশে যে প্রাচীন ভাষাগুলির বংশধর এখন শাখাপ্রশাখার ছড়িয়ে রয়েছে সেগুলি এক সুপ্রাচীন অবলুপ্ত ভাষা থেকে উৎপন্ন। এই সুপ্রাচীন অবলুপ্ত বংশকর্তা ভাষাকে এবং সে ভাষা বারা একসাথে বলত, তাদের নাম দেওয়া হয়েছে ‘ইন্দো-ইউরোপীয়’। ইন্দো-ইউরোপীয়দের দেশ এবং ভাষার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আবৃত হয়েছে বংশধর প্রাচীন ভাষাগুলি ও সে ভাষার সাহিত্য আলোচনা করে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা ও ভাষীর বিষয়ে আমাদের সমাহিত (এবং আহ্বিত) জ্ঞানের এক মোটা অংশ মিলেছে কঙ্গবৈদ থেকে।

কঙ্গবৈদের নৃত্যে বহু উল্লীত চারটি প্রধান দেবতার মধ্যে একটি হলেন বৃহদেব, ‘অশ্বিনা’ (অর্থাৎ অশ্বিন্—“অশ্ববান” হুজন): প্রাচীনতর নামে ‘নাসত্য’ (অর্থাৎ নাসত্য হুজন)। ‘অশ্বিন্’ নামটির তাৎপর্য সহজেই বোঝা যায়। এঁরা বিচরণ করতেন কিংবা অশ্ব বাহিত রথে। ‘নাসত্য’ নামটির অর্থ একসাথে মনে করা হত যে-হুজন ‘বীরা নাক থেকে জাত’ তার পরে ভাষা হত, ‘যে-হুজন অসত্য নয়’ এখন এ দুটি অর্থ পরিত্যক্ত হয়েছে। পণ্ডিতেরা এখন অশ্ববান করছেন, নামটি এক প্রাচীন ‘নস্’ ধাতু থেকে উৎপন্ন, এ ধাতুর অর্থ হল “আলস্য করা”। ধাতুটির সরাসরি ব্যবহারের কোন উদাহরণ পাওয়া যায়নি, তবে বর্তমান কালের অভ্যন্তরীণ রূপের ব্যবহার আছে, ‘নিংস’ (সংস্কৃত ব্যাকরণে এটি স্বতন্ত্র ধাতু বলে পরিগণিত), অর্থ ‘আলস্য করা’

চুষন করা"। তদনুসারে 'নাসত্য' যানে হবে আশঙ্ক কর্ণের অধিকারী। 'নাসত্য' এই বিবচন দেবনামটি আবেতার পাওরা পেছে (তবে দেবতার নামে নয়, অস্থরের নামে; বেদের কোনো কোনো দ্বন্দ্ব আবেতার অস্থর হয়েছেন, এশিয়া মাইনরে মিটারিদের এক গ্রন্থলেখ, খ্রীষ্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পাওয়া গেছে বিবাহের ঘটকদেবতা রূপে।

বেদের নাসত্য অস্থরের ইন্দো-ইউরোপীয় কোন সাধারণ নাম মেলেনি, তবে ভিন্ন নামে ও অভিধানে তাঁদের সাক্ষাৎ মিলছে গ্রীক ও ল্যাটিন-লিথুয়ানিয় ঐতিহ্যে। সর্বত্রই তাঁরা ভৌ-পুত্র,—বেদে 'দিবো নপাতা', গ্রীকে 'দিওস্ কোউরোই' (বাক্তিগত নামে 'কসতোর' ও 'পোলুহেটকেন', ল্যাটিনে 'দিএব দেলি', লিথুয়ানে 'দিএবে সুনেলিয়স'। এঁদের এক ভগিনীও ছিল,—বেদে ইনি 'হৃহিতা সূৰ্য্য' (বা 'সূৰ্য'), গ্রীকে হেলেন, ল্যাটিনে 'সউলোর ডুক্‌তেরিয়া'। ইন্দো-ইউরোপীয় ঐতিহ্যের নাসত্য দুজন তাঁদের ভগিনীকে যে পত্ন-ভাবেও দেখতেন তার বখেটে ইঙ্গিত ঋগ্‌বেদে আছে : "শেযাবনীত জেতা সুবাংপতী", "যেন পতী ওবধঃ সূৰ্য্যঃ", "সূৰ্য্যা অখিনা বরা।" সূৰ্য্য নাসত্যের সঙ্গে জাকতমকে বখে পরিভ্রমণ করেন : "সুবো রথং হৃহিতা সূৰ্য্যঃ সহ ত্রিরা নাসত্যাবণীত"; "রথং কন্‌ কাহই ত্রবদন্‌ আণ্ডং সং সূৰ্য্যং হৃহিতাবণীত"। ইন্দো-ইউরোপীয় ঐতিহ্য যেমন বেদেও তেমন অস্থরের অনেক রকম বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার করেন, বিশেষ করে সমুদ্রে বিপত্তি ও বিবিধ দুর্গম পতন থেকে। উভয়ই এঁরা আরোগ্যেরও কর্তা। (পৌরাণিক ঐতিহ্যে এঁরা দেবভিব্যক্ত হয়েছেন।)

ঋগ্‌বেদের দেবতাদের সঙ্গে পৌরাণিক বা শাস্ত্রীয় দেবতাদের একটা বড় রকম সন্নিহিত আছে। ঋগ্‌বেদের দেবতার উপাসকের প্রতি অনেকটা নির্দিষ্ট। পূজা ও পূজক যেন কাছাকাছি আসা জমিদার ও সম্পন্ন গ্রাম। খাতপানীর বিধিযুক্ত অর্বাং বজ্রবিধিসূত্রে গেলে দেবতার খুশি, আর উপাসকেরা নিজেদের জোতজমি ঘর-পাড়ি বধারীতি বজ্র থাকলেই কৃতার্থ। পরবর্তীকালে শাস্ত্রীয় দেবতাদের সঙ্গে উপাসকের সম্পর্ক নির্দিষ্ট নয়। এখানে দেবতা যেন বাপ-মা আর উপাসক যেন বিপদগ্রস্ত কাতর সন্তান। যখন খুশি যেমন করে হোক শরণ নিলেই তার বিপদ দেবতা দূর করে দেবেন। ঋগ্‌বেদের প্রাচীন দেবমণ্ডলীতে এমন দেবতা একটি আছেন—'নাসত্য'—'অখিনা'। ঋগ্‌বেদে উল্লেখ থেকে জানা যায় যে, এঁরা নানা অস্থরের নানা বাহুবলে এমন

কি ইতর প্রাণীকেও দুর্গতি থেকে মুক্ত করেছিলেন। তাঁদের কৃপায় রেল উত্তার হয়েছিলেন জল থেকে, কুছা সমুদ্রে নৌকাডুবি থেকে জিনটি রখের সাহায্যে বাড়ি পৌঁছে, পেছ কিপ্রগামী লামা ঘোড়া পেয়ে কুছাত্তর গৌতন বরণার জল পেয়ে, শরও কুছার জল পেতে, জাহ্নব শত্রুর কবল থেকে, চাবান (=চাবন) জরা থেকে, অজি অগ্নিভর থেকে, বর্তিকা (বটের পাখি) বৃক্ষের মুখ থেকে ইত্যাদি। অক্ষহীন বিশ্ণুর লোহার পা লাগিয়ে দিয়ে তাঁরা তাকে চলনসমর্থ করেছিলেন। তাঁদের অঙ্গগ্রহে বহ্নিমতী পুত্র-সন্তান লাভ করেছিল। বালক পদ্মার রোগগ্রস্ত ছিল বলে তার বাপ তাকে পছন্দ করত না। এই নন্দ ভিমকষর ("নল ভিবজা") তাকে ভালো করে নিয়েছিলেন। তাঁদের কৃপায় বিশ্বক হারানো ছেলেকে ফিরে পেয়েছিল। বিমদকে তাঁরা পত্নী জুটিয়ে দিয়েছিলেন। অক্ষাবীকে তাঁরা স্থলসমৃদ্ধি ও স্থলসন্তান দিয়েছিলেন। শবুর গাভীকে দুগ্ধবতী করে দিয়েছিলেন তাঁরা। হালা দিবোদাসকে তাঁরা বিশেষ অঙ্গগ্রহ করেছিলেন।

নাসতা বা অশ্বিন দুজন স্থপাতি-পানীর বিতরণে মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁরা ছিলেন "মালী", মধুর দেবতা। তাঁদের সবই মধুর, এমন কি চাবুকও ("বা বাং কলা মধুমতী")। ঋগ্বেদে বিষ্ণুর সঙ্গে মধুর সম্পর্ক আছে, তবে তিনি মধুবিভরণকারী নয়, মধুর ভাতারী ("বিষোঃ পদে পরমে মধু উৎসঃ")। এই যুগ্মেই পৌরাণিক ও শাস্ত্রীয় ঐতিহ্য বেধানে নাসত্যা—অশ্বিন। বিষ্ণুর সঙ্গে অংশভ মিলে গিয়েছেন—বিষ্ণু হয়েছেন মাধব এবং সব ভালো কাজের কর্তা। ("নর্বকাধেহু মাধবঃ")।

পুরাণ কাহিনীর ও শাস্ত্র গ্রন্থের দেবতা বলভত্র এবং কুক (বাস্তবদেব) বেধে আছেন বটে তবে দেবতা রূপে নয়, অসুর রূপে। ঋগ্বেদে উল্লিখিত ইন্দ্র-শক্রদের মধ্যে দুজন হলেন 'বল' এবং 'কুক'। বল বহুবীর উল্লিখিত, তিনি যেন ক্রোধেরই অন্ত রূপ। জলস্রোতকে রুদ্ধ করে বল গুহার আটক করে রেখেছিলেন, ইন্দ্র বক্রের দ্বারা সেই গুহার বাঁধ ভেঙে দিয়ে জলস্রোত বইয়ে দিয়েছিলেন। আর ঋগ্বেদে কচিং উল্লিখিত কুক আকাশে বন বেধের মতো, অগ্নিমতী নদীর তীরে বন হাজার লৈল নিয়ে অভিযান করেছিলেন। ইন্দ্র তাঁর লক্ষ্মীকে হারিয়ে দিয়েছিলেন। পুরাণে-শাস্ত্রে দেখি যে ইন্দ্র আর বল ও কুক ভোল কিরিয়ে কেনেছেন। বল ও কুক হয়েছেন কর্তা, ইন্দ্র হয়েছেন অবিনীত কৃত্য। বল এখন অসুর নয়, ভদ্র দেবতা, তাই তিনি বলভত্র।

আর কৃষ্ণ হলেন বাহুবল (বানে “ভালো দেবতা”)। নানত্যবয়ের ছাপও কিছু পড়ল এদের উপর। এঁরা ছতাই, বর্ষ পরিবর্তন না করে; হলেন বাসববৈদ্য মথো মাধব-সোমি। নানত্যবয়ের অনেক বিশিষ্ট কবী কৃষ্ণ-বলরামের আচরণের মথো খুঁজে পাওয়া যায়।

নানত্যবয়ের তর্পিনী “দিবো হুহিতা” খুঁধ হলেন এঁদের তর্পিনীস্থানীয়া নন্দগোপ-সুতা, যিনি হরিবংশে ও বিষ্ণুপুরাণে, ‘একানংগ’ এবং পুরাণে সর্বত্র ‘যোগমারা’, ‘মহামারা’ অথবা ‘কাত্যায়নী’ নামে অভিহিত। ‘একানংগ’ নামটি ‘নানত্য’ নামের সঙ্গে যোগ রেখেছে। ‘একানংগা’ এই পাঠান্তরটি ধরে পণ্ডিতেরা নামটির ব্যাখ্যা করেন, “যিনি এক এবং কারো অংশ নন”। অর্থাৎ “অখণ্ড”। এ ব্যাখ্যা তাবার দিক দিয়ে ভুল। আসলে নামটি হল ‘একানংগা’। অর্থাৎ, একা (অর্থাৎ অবিবাহিতা) এবং অবিবাহিতা। (এখানেও সেই প্রাচীন ‘নস’ খাড়া, এবং খাড়ুটি এখানেও সরল রূপে নেই, আছে সম্প্রকালের অভ্যন্তর রূপে।) মার্কণ্ডেয়-চতুর্থী কাহিনীতে দেবীর একানংগা রূপ প্রকটিত (“যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দপং বশোহতি। যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি”)।

মাধব দুজনের সঙ্গে একানংগার পূজাও যে কলিঙ্গ অঞ্চলে (এবং অনাঙ্গ) জানা ছিল সে কথা আগে বলেছি। শ্রীকৃষ্ণের নীলমাধব ও বলভদ্রের তর্পিনী—সত্বিনী একানংগা চলিত পুরাণ কাহিনীর সঙ্গে মিল রেখে পরে হুজুরা নামে পরিচিত হয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণের অগস্ত্য বলরাম ও হুজুরার কাহিনীর সঙ্গে বৈদিক ও প্রাক-বৈদিক ‘নানত্য-অশ্বিনা’ ঐতিহ্যের গভীর মিল আছে। তা সংক্ষেপে নির্দেশ করে এই আলোচনা শেষ করি।

বৈদিক দেবতাসমূহের মতো নীলাচলের ঠাকুরও মাল্লবের সব রকম কৃষ্ণ-বেদনার প্রতিকার করতে সমর্থ বলে ধারণা দেশের এক বৃহৎখণ্ডে হাজার বছরেরও বেশি কাল ধরে প্রচলিত আছে। রাজা-রাজ্ঞী খেতে আরম্ভ করে বসিক-পূহন পর্বত সকলে আপদশান্তির কৃতজ্ঞতার সর্বসাধারণের জন্ত উন্নত এই দেব-ভাতারে বখালাখ্য দান করে এসেছেন। গজকল্প কাহিনীতে ইতর প্রাণীর উদ্ধারের গল্প রয়েছে। বিবাহের ঘটকতার বিশিষ্ট প্রমাণ কাকী-কাবেরীর গল্প। এই কাহিনী থেকে আরও উপলব্ধি করতে পারি যে,

ভগদাদ-বলরাম ‘অধিনা’। তাঁরা অধারোদী হয়ে কলিদের রাজাকে হুকে সাহায্য করে জয় দিয়েছিলেন।

বৈদিক ঐতিহ্যে যেমন, এখানেও তেমনি তিন জনের তিনটি রথ। সমুদ্রে এঁদের নৌবাহাদার এবং আকাশবানের যুগপৎ ইচ্ছিত রয়েছে নরেন্দ্রলরোবরে চন্দনবাহাদার অহুষ্ঠানে। হাঁসে যেন টানছে এমন এবং তিনটি নৌকার এই দিন জিহব বিহার করেন।

মিল এইখানেই শেষ নয়। আরও আছে।

সমুদ্রে পরিমাণ ঘটানো নাসত্য-আখন্ দেবতাদের বিশেষ কর্তব্য। ত্রীকৈত্রে সমুদ্রের ধারে (—গোড়ায় তীরের নিকটে সমুদ্রগর্ভে?—) প্রথমে শিলাভূপ বা শৈল এবং পরে অটুলা অথবা মন্দির, এই দেবতার স্মারক এবং এখনকার আলোচকের মতো কাজের জন্মেই কি আগে ব্যবহৃত হত? চণ্ডীমঙ্গলে সমুদ্রগামী বণিক ধনপতি ও ত্রীপতি বহু দূর থেকে নীলাচল মন্দিরের চূড়ায় “পতেক হাথ নেতের পতাকা” উড়তে দেখে আশঙ্ক হয়ে নীলাচলের দেবতাকে বন্দনা করে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, ভালোর ভালোর দেশে ফিরতে পারলে মন্দিরের দেওয়াল সোনার মুড়িয়ে দেবে।

আর্ঘ্য ভাষা ও সংস্কৃতি এ দেশে পৌঁছবার আগেই এ স্থানের মাহাত্ম্য ছিল হয়ত। তবে অধিনদের মাহাত্ম্য বহু বহু কাল আগে থেকেই প্রাক্-আর্ঘ্য মাহাত্ম্যকে আত্মসাৎ করে নিয়েছিল তা অস্বাভাবিক করতে পারি।

এই প্রবন্ধে আমার বক্তব্য হল এই যে, আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাসে ত্রীকৈত্রেয় ঠাকুর তৃতীয় খ্রীষ্টপূর্ব সহস্রাব্দ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দীর এই প্রায় শেষ পর্যন্ত পাঁচ হাজার বছরের যেন অখণ্ড জের টেনে এসেছে।

## ব্রথযাত্রা

### ত্রীক্ষেত্রে পুরুষোত্তমপুরী ও ত্রিদেব

হাতীর বারশ বছর আগে থেকে উড়িষ্যার ( তখন নাম কলিঙ্গ ) পূর্বপ্রান্তের এক অকল প্রাচীন মন্দিরের প্রান্তভাগ দেবস্থান রূপে সমগ্র ভারতবর্ষে বিখ্যাত হয়েছিল। এই অকলের এক প্রান্তে সমুদ্র থেকে দূরে বন পাহাড়ি অকলে শিবস্থান বলে অধুনা প্রসিদ্ধ ভুবনেশ্বর প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল অষ্টম নবম শতাব্দী থেকে। তার ছ-চার শতাব্দী পরে থেকে বিকুস্থান বলে অধুনা সর্বপরিচিত পুরী—সমুদ্রের এক রকম উপরে—খ্যাতি লাভ করতে থাকে। উড়িষ্যার রাজাদের স্থাপত্য শৃংখলা এই দুটি দেবস্থানকে ভারতবর্ষের প্রধান তীর্থস্থান বলে ঘোষণা করে এসেছে। পুরীর মাহাত্ম্য অনতিবিলম্বে ভুবনেশ্বরের মাহাত্ম্যকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তার কারণ বোকা দুক্লহ নয়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পুরীতে ঐচৈতন্ত্যের অবস্থিতি পুরীমাহাত্ম্য কাহিনীর শেষ অধ্যায় রচনা করে দিয়েছে।

লংকৃত পৌরাণিক সাহিত্যে ভুবনেশ্বর ও পুরী দুটি দেবস্থানেরই উল্লেখ আছে। মহাভারতে পাণ্ডবদের তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে পুরীর—তখন নীলশৈল বা নীলাচল নামে প্রসিদ্ধ—মাহাত্ম্য যেভাবে বর্ণিত আছে তাতে এস্থানটি অনেক প্রাচীনতর বলে মনে হয়। হরত এখানে প্রাগাৰ্ঘ মাল্লবের দেবপীঠ ছিল। তার কিছু যে বেশ নেই তা নয়, কিন্তু আমাদের নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা সে বিষয়ে যে পরিমাণে মুখর সে পরিমাণে প্রমাণসহ নয়। একথা পরে বলছি।

শিবক্ষেত্রের প্রাচীন নাম ছিল ‘একান্ত কানন’ (অর্থাৎ একটি আশ্রম বাগানের বাগান)। আশ্রম অহুমান করি নামটি আসলে ছিল ‘একান্ত কানন’ অর্থাৎ “এক নারী ব্রহ্মচারী” শিবের বোগোত্তান। এখানে মনে করতে হবে যে, ভুবনেশ্বরে কোন প্রাচীন দেবীপীঠ নেই। এখানে সবই লিঙ্গরাজ।

পুরী—বা আমি বিকুক্ষেত্র বলে নির্দেশ করেছি তা হরত আগে দেবীক্ষেত্র ছিল। দেবী মানে সৌম্য শান্ত সু-ভদ্রা জগদ্ধাত্রী দেবী। সেই কারণেই এস্থানের প্রাচীন নাম ‘ত্রীক্ষেত্র’। (নামটি আসলে ‘ত্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র’ নামের সংক্ষিপ্তরূপ হতেও পারে।) কোনো এক সময়ে এই নীলশৈলবাগিনী নিজ্যা

দেবীর সঙ্গে বৈদিক উপাসনাত্তর উপাসনা জড়িয়ে যায়। তখন থেকে এখানে বলদেব-হুতরা-কৃক এই ত্রিমেবের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা। এই তিন “মাধব” দেবতার পূজার নতীর অন্তর্ভুক্ত মিলেছে। কয়েক বছর আগে উক্তর প্রবেশের নির্ভাপুর অকলে এই তিন দেবতার প্রতিষ্ঠা সহ প্রত্নলেখ মিলেছে। সে প্রত্নলেখ একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর।

নীলাচল যে আগে দেবীধাম ছিল একথা বহুবার পক্ষে বিশেষ সূক্তি আছে। সে সূক্তি এই এদের নিয়েই। আবারও বৈদিকতার ঐতিহ্যে দেবী-উপাসনার সঙ্গে বিকু-উপাসনার তেমন কোন বিরোধ অবধা দৃঢ় ছিল না, যেমন ছিল কিছু কিছু শিব-বিকুর উপাসনা নিয়ে। ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির মহাদেবী দুর্গা-পার্বতীর উপাসনা প্রথম থেকেই বিকু-উপাসনার সহযোগী ছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডী বিকুর আবেশিনী শক্তি মহামায়া নিজে। হরিবংশে দেবী নিজে বিকুর ভগিনী রূপে অবতীর্ণা। হরিবংশের সব কাহিনীতেই বৃক্খবীরের। দেবীর স্তব করে উদ্ধারের পথ পেয়েছেন।

পুরীর ত্রিমেবতার সূক্তি অত্যন্ত বীভৎস Crude ও আদিম ধরনের হলেও কোন আদিম দেবতার নয়। এ সূক্তি তিন “মাধব” দেবতারই। আগে যে প্রত্নলেখের কথা বলেছি, তাতেও ত্রিমেবের ছবি আছে এবং তা বীভৎস নয়। আসল কথা হল যখন প্রথম সূক্তি গড়া হয় তখন যারা খোদাইকর ছিলেন তাঁদের সূক্তিগিরি বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আদিম স্তরের ছিল। এখানে অবশ্য তর্ক উঠতে পারে। এখানে যে আদিম এক বা একাধিক দেবসূক্তি ছিল—ছিল যে তা যদি ধরে নেওয়া যায়—সে দেবসূক্তির বড়চও অন্তরকম ছিল হয়ত। পরে যখন “মাধব” দেবতাদের আরোপ করা হল তখন একটিকে জ্ঞী সূক্তিতে এবং অপর দুটিকে লাবা ও কালো রঙের পুরুষ সূক্তিতে রূপান্তরিত করা হল। অবশ্য বেশ কুয়া ছাড়া আর কিছুতে এই ত্রিমেবের মধ্যে লিঙ্গভেদের লক্ষণ নেই। (অন্তত আমার জানা নেই।)

প্রাচীন কালের বিরাট স্তুভাগ দশানের এই পূর্বপ্রান্তের স্থানীয় চিরন্তন অধিবাসীদের বিশ্বাস ও সংস্কৃতির কিছুমাত্র চিহ্নাবশেষ যে পুরীর ত্রিমেবের সম্পর্কে এখন নেই তা বলা চলে না। সূক্তিগুলি নিমকাঠের তৈরি। সে কাঠ আনতে হয় গহন অরণ্য থেকে। সে কাঠুরিয়াও এক বিশিষ্ট গোষ্ঠীর “আধিবাসী” শব্দ। বাঘো বছর অন্তর দেবসূক্তির কলেবর পরিবর্তন হয়। তখন সেই শব্দ লক্ষ্যবস্তুর ডাক পড়ে। এই জাতির নাম শবর লক্ষ্যেও এখানে একটু বলবার

অছে। কলিযুগে একদা যোগী ও শৈব লিঙ্গ সম্প্রদায়ে বড় আত্মা ছিল। শৈব-তান্ত্রিক যোগী-সম্প্রদায়ে শিব ও পার্বতী শবর-শবরী রূপে দীত হয়েছেন। একথাও স্বীকৃত করতে হবে যে, বিদ্যাবাসিনী মহাদেবী মহাভারতে ও অন্তর্জে কীরাতিনী রূপে বর্ণিত হয়েছেন।

ভারতীয় ঐতিহ্যে মহাদেবী নিত্যাকে প্রধানত দুটিরূপে পাই। প্রাক-পুরাণিক সাহিত্যে “বাকিনী” হৈমবতীরূপে, পৌরাণিক সাহিত্যে “কিরাতী” বিদ্যাবাসিনীরূপে। এখানে লক্ষ্য করতে হবে যে, দুটি দেব ডাবনাই পর্বত বসতি-“পর্বতী” এবং দুর্গম স্থানবাসিনী—“দুর্গা” হৈমবতীর সঙ্গে শিবের সম্পর্ক আছে, বিদ্যাবাসিনীর সঙ্গে শিবের কোন রকম সম্পর্ক নেই,—তিনি কুমারী, অশ্বচাৰিণী।

হৈমবতীর প্রথম উল্লেখ পাই কেনোপনিষদে। এঁর বাল্যকথা ও যৌবন কাহিনী পাই কালিদাসের কুমারসম্ভবে, এবং তার অনেককাল পরে লেখা শিবপুরাণে। অস্ত্রা পুরাণকাহিনীতে হৈমবতীর কোন বিশেষ ভূমিকা নেই। ইনি শিবের ভাৰ্গা ও সহচরী বলে স্বীকৃত হয়েছেন এইমাত্র।

ঈশ্বরে পুরুষোত্তম পুরীর “মাধবী” দেবী হুভদ্রার আমরা পুরোপুরি দেবী বিদ্যাবাসিনীর স্বরূপটি দেখতে পাই। তিনি কুমারী, থাকেন ছই ডায়ের সঙ্গে। তিন ভাই বোন এক বাপের কিশু তিন মায়ের লতান। বলদেব রোহিণীর, হুভদ্রা যশোদার আর কৃষ্ণ দেবকীর। ঙ্গবেদের কবিতা থেকে জানা যায় যে এই ভাবে বাস করতেন হুভদ্রার পূর্বতন প্রতিরূপে নিশাউবা ও মন ও নাসত্যের সঙ্গে। ( ঙ্গবেদের মন পুরাণের কৃষ্ণ, ঙ্গবেদের নাসত্য পুরাণের বলরাম। )

হরিবংশ, বাতে মহাদেবীর পুরাণ কথা লবার আগে মিলছে—থেকে জানতে পারি যে, দেবকীর কস্তাকে যখন কংস পাথরে আছড়ে মারতে যায় তখন কস্তার আত্মা দেহকোষ ছেড়ে কলে চিল হয়ে আকাশে উড়ে বান এবং স্বর্গে গিয়ে ইন্দ্রের পূজা পান অসম্ভাবী মহাদেবীরূপে। এই রূপে তাঁর যে carrier আরম্ভ হল স্বর্গে তা পরে মর্ত্যেও প্রচলিত হল। দেবী কুমারীই রয়ে গেলেন।

কৃষ্ণ-ভগিনীর যে বর্ত খোলস পড়ে রইল তার উল্লেখ পাচ্ছি একেবারে মহাভারতের ঘটনায়। তাঁর নাম হুভদ্রা। ( মহাদেবীর দুটিরূপ ছিল, এক চণ্ডী, কালী, ভৈরবী—বৈদিকে নন্দ, রাজী আর এক ভদ্রা, অস্ত্র বৈদিকে উবা হুভদ্রা নামেই দেবীর প্রদরূপ বোঝাচ্ছে। ) হুভদ্রা কিন্তু কুমারী রইলেন না। তাঁর বিয়ে হল অর্জুনের সঙ্গে। এখানে একটু ডাববার কথা আছে। বলদেবের



খুব আপত্তি ছিল এই বিয়েতে, তিনি হুজুরকে কাছ ছাড়া করতে চান নি। তিনি যে নাসত্য। আর অর্জুনের সঙ্গে বিয়ে ব্যাপারটাও ধানিকটা বেন কারচুপির মতো। অর্জুন হলেন ইজের পুত্র ইজের স্বরূপ। তাঁর সঙ্গে বিয়ে মানে ইজের দ্বারা দেবীর পূজারই ভাবাত্মক। এইভাবে দেখলে হুজুর বেলারও দেবীর কুমারীও ঠিক ঘোচে না। হু'গকেই যে ইজ।

উষা মত ও নাসত্য প্রাচীন বৈদিক দেবতা সম্বন্ধে নেই। তবে এঁদের নিয়ে প্রাচীন বৈদিক সমাজে কিছু দলাদলি ঘটেছিল। ইন্দ্র-উপাসক উচ্চতর পুরোহিত সমাজে এঁরা পূজা হিসাবে তেমন পাতা পেতেন না।

উষার নামে অনেক স্তব আছে ঋগ্বেদে। কিন্তু কোন বজ্র কার্বে উষাকে হব্য দেওয়া হত না। উষা যেন অন্তঃপুরিকা ছিলেন। আর মত ও নাসত্য ঋগ্বেদে “অশিষ্য অশিনৌ” অর্থাৎ ঘোড়সওয়ারস্বরূপে বর্ণিত - বজ্রকাণ্ডে হব্যলাভের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে, বহিচ এঁরাও খুব প্রাচীন ছিলেন। আসল কথা হল এই যে, এই তিন দেবতা—যা পরবর্তীকালে তিন ‘মাধব’ দেবতার রূপ নিয়েছেন—তাঁরা ছিলেন ঘরোয়া দেবতা। তাঁদের পূজা করত গৃহস্থ অথবা আর্ত, বিপন্ন ব্যক্তি সাংসারিক মঙ্গলের ভণ্ডে, বিপন্ন-উদ্ধারের জন্তে। এই কারণে বাইরের ব্যাপার বজ্রকাণ্ডগুলিতে এঁদের আহ্বান করে হব্য দেওয়া হত না। উষা ও মত-নাসত্য ঘরোয়া দেবতা বলেই বিবাহের অনুষ্ঠানে তাঁদের বিশেষ গুরুত্ব ছিল বৈদিক সময়ে এবং তারও অনেক আগে থেকে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে বিবাহ উৎসব ঘটিত যে যুক্তি আছে (৮৫) তাতে এই ত্রিদেবের ঘরোয়া রূপের বেশ একটু পরিচয় রয়েছে। এই পরিচয়ের কথা পুরীর রথযাত্রার প্রসঙ্গেও বলব।

পুরীর মন্দির দেব-আরাধনার আয়তন নয়, রাজাধিরাজ দেবতার নিয়ম প্রাসাদ। এখানে যা হয়ে আসছে তা স্মৃতিস্রুতি শাস্ত্রোক্ত আরাধনা বা বজ্রকাণ্ড নয়। এ হল দেবতার প্রাত্যহিক আবরণ-উৎসব। সাগাদিন দেবতার মেহচর্চা ও ভোজন পান নৃত্যগীত বিলাস। বৈদিক ত্রিদেবের দ্বারাই বেন অনুসৃত হয়েছে পুরীর ত্রিদেবের চর্চাবিধিতে। এখানে দেবতা যেমন স্বতন্ত্র তার পরিচর্চাবিধিও তেমনি পৃথক্। পুরীর দেবপূজা ব্রত বা বজ্রকাণ্ড নয়। তা বেন সজ্জ-উৎসব। এখানে জনবোধে তাই “অন্নং ব্রহ্ম”। পুরীর দেবতার কোন পুরোহিত নেই। আছে সেবক, প্রতীক্ষক (পড়িহা)—বেজধারী রাজার কক্ষকী, প্রতিহাতকের মতো।

প্রধানতম উৎসব হল রথবাজা। বলতে গেলে এইটাই সবগ্র ভারতবর্ষে হিন্দুদের একমাত্র সর্বসাধারণ্য ধর্ম-উৎসব (— অকুষ্ঠান নয়, বাজা দেখা।) আবার মাসের নির্দিষ্ট তিথি মিনে অগরাথ (কুক) হুজুরা ও বলভহ তিনটি রথে চড়ে মূল মন্দির থেকে কিছুদূরে গুণ্ডিচার—অর্থাৎ বাগানবাড়িতে যান। সেখানে সাতদিন থেকে আটদিনের দিন আবার মূল মন্দিরে করে আসেন। এই বাওয়া আসাই হল রথবাজা উৎসব। এ ব্যাপারকে চাতুর্দ্বার্তার সংক্ষিপ্তরূপ বলতে পারি। বর্ষা চার মাসের বললে সপ্তাহ খানেক নিশ্চিন্তে কাটিয়ে আসা। কিংবা বিবাহ বাজার পূর্ণরূপও ধরতে পারি। প্রথমদিন বিবাহসভার গমন, আট-দিনের দিন অষ্টমকলা, প্রত্যাবর্তন।

এইখানে অগ্বেদের সূক্তটি স্মরণ করা যায়। সেখানে বলা হয়েছে, অশ্বিষর সূর্যকন্তার “বর” অর্থাৎ প্রধান কন্তাবাজী (৮.২) এবং সূর্যকন্তার তিনচাকার রথে অশ্বিরা সজী ছিলেন (১০)। এখানে অগরাথ ও বলরাম হুজুরার সজী। তবে বাজা একটিমাত্র তিনচাকার শকটে নয়, তিনটি চার চাকার রথে।

এই সব নানানিক বিবেচনা করে মনে হয় হুজুরাই ছিলেন নীলাচলের একদা মুখ্য দেবতা। তিনি বৈদিক উবার প্রতিরূপ। উবা পূর্ব শৈলে উদ্ভিত হন।

## সিদ্ধিদাতা দেবতা

এখনকার দিনে হিন্দুসমাজের পূজার ব্যাপারে যে বিবিধ দেবদেবীর পূজার কম বেশি ঐক্যমতকে অহুতান প্রচলিত আগে হয়েছে অথবা হচ্ছে তার মধ্যে গণেশকে ধরা যায় না। অথচ গণেশের উঠতির অনেক স্বেপন ছিল এখনকার দিনে ধনপতিদের সর্বাধিকারিণে। কিন্তু হার প্রাচীন গণদেবতার যে নবীন প্রতিদ্বন্দ্বী জুটেছে তাতেই সেকলে অপদেবতা-দেবতার অধিকার প্রসারের সমস্ত সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়ে গেছে (মহারাত্রের নবীর সঙ্গেও)।

এখনকার পাঠক প্রবন্ধের মধ্যেও রস পেতে চান, কিন্তু আমার প্রবন্ধ আলার নয়। সারে কিছু কঠিন পদার্থ অব্যক্তই থাকে। সেটুকু বখালভব বান মিচ্ছি। পণ্ডিতরা বেন হোব না ধরেন।

গণদেবতার সূত্রপাত ঋগ্বেদে। এঁরা ঠিক এক নম্বর দেবতা নন, দুয়ের নম্বরও নন। তাদের নম্বর বটে কিন্তু মধ্যমার—যদি ঋগ্বেদে মরুৎ-সূক্তের সংখ্যা তাঁদের মধ্যমার মোটক হয়—তবে অনেক প্রথম শ্রেণীর দেবতারও উপরে।

ঋগ্বেদে মরুৎ কোন একটি দেবতাকে নির্দেশ করে না। মরুৎ বলতে বোকার এক সমগোত্র দেবতাসমষ্টি (গণ)। সংখ্যার তাঁরা একশ বিশ অথবা একশ। এঁরা সবাই তাই। পিতা রুদ্র, মাতা পৃথ্বী। এঁরা ভীষণ মূর্তি, বীর, শোভন বেশ, নানা অস্ত্রধারী। মরুৎরাই দেবতাদের সৈন্যবাহিনী। এঁদের সেনাপতি ইন্দ্র অথবা বায়ু (বেদে এঁদের বায়ুর সন্তান বলেও উল্লেখ করা হয়েছে)। এই কারণে ঋগ্বেদে ইন্দ্র (এবং বৃহস্পতি) “গণপতি” বলে উল্লিখিত হয়েছেন।

বৈদিক সালের পরে মরুৎ নামটি লুপ্ত হয়ে গেল। তবে পূর্বতন মরুৎগণ বৃত্ত হয়ে রইল রুদ্র-শিবের সঙ্গে। কিন্তু পরম্পর জাতীয় প্রারম্ভে গেল। তাঁরা আর শোভনবেশধারী বোকা রইলেন ন—বোধ করি এক বীরভদ্র ছাড়া—এবং তাঁরা সবাই বিকৃত বৃত্ত ভূত-শিশাতের আকার নিলেন। (এইখানে মনে হয় ঋগ্বেদে মরুৎগণের উৎপত্তি লব্ধে যে দ্বিতীয় ধারণা ছিল, বায়ুর থেকে—সেই ধারণারই স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। রুদ্রপুত্র মরুৎগণ আর বায়ুপুত্র মরুৎগণ ঋগ্বেদে এক হয়ে গিয়ে বায়ুপুত্রদের ঢাকা দিয়ে রেখেছিল, বৈদিক পরবর্তী-কালে বায়ুপুত্ররাই রুদ্রপুত্রদের লোপসাধন করলে)।

কল্পের পণের আঁধার নবী হুঁককে জানি। নবী হচ্ছে সোমুখ, অর্থাৎ গো-হুত, আর হুঁকী ভোঁদরা হুত। এক সঙ্গে বিচার করলে গণেশ হাতিমুখো হুত। নাম থেকেই বোকা বার যে হাতিমুখো হুতই কল্প-শিবের অল্পচয়পণের প্রধান ছিল।

তারপরে—অনেককাল পরে, যখন প্রধান প্রধান পুরাণগুলির রচনার পাট চুকে গেছে তখন দেখা দিলেন নবীন দেবতা, লেখক গণেশ। মহাত্মারত্নের শেষ সংস্করণ তৈরি হবার আগেই ইনি দেখা দিয়েছেন মহাত্মারত্ন রচনার সময়ে কবি কৃষ্ণ বৈশ্যারন বেদব্যাসের উক্তির প্রতিলেখক—অর্থাৎ এখনকার টেনোগ্রাকার—ডিক্টেশন লেখক রূপে। গল্প বলবে যে গণেশ এত তাড়াতাড়ি লিখে যেতেন যে ব্যাসদেব সব সময় কথা হুঁগিয়ে দিতে পারতেন না। তিনি গণেশের দ্রুত লেখন গ্রহণ করার জন্তে মাঝে মাঝে শক্ত কথা ব্যবহার করতেন। এ সব কথার মানে বুঝে নিতে গণেশের একটু ঘেরি হত, আর সেই অবসরে বেদব্যাস তাঁর বক্তব্য ভেবে শুছিয়ে নিতেন। বলতে কুলে গেছি যে লিখতে বসবার আগে গণেশ বেদব্যাসকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন যে বলতে বলতে থামা চলবে না। বেশিক্ষণ থামলেই তিনি আর লিখবেন না। বেদব্যাস চতুর লোক, তিনি গণেশের বিদ্যার দোঁড় জানতেন। তিনিও গণেশকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে নিয়েছিলেন যে অর্থ না বুঝে গণেশ কিছু লিখতে পারবেন না। এই কারণে মাঝে মাঝে অপরিচিত শব্দ ছেড়ে দিয়ে গণেশকে খামিয়ে রাখতেন নিজের সুবিধার জন্তে।

এই হল গণেশের সিদ্ধিহাস্য। মাহাত্ম্যের সূত্রপাত। এখন দেখা যাক, গণেশের এই মাহাত্ম্য আমদানি করেছিল কোন্ পথে।

হতিমুখ দেবতা গণেশ একদা যে হতিস্বরূপ দেবকল্প ভাবনা ছিল সে অল্পমান করার পথ আছে। খুব প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের দেশের হাসপাত্যে গজলক্ষীর মূর্তি মিলেছে। পদ্মের উপর আলীন দেবী, হুঁটি হাতি হুঁকি থেকে তাঁর মাথার জল চালছে। এই ছবি ছিল তখনকার দিনের শক্তিসম্বলিত দেবতার প্রতীক। এই ছবির হুঁটি অংশ একদা স্বাধীন ছিল—হাতি ও দেবী—সে কথা ভাবা চলে। হাতি ছিল এক মহাজের মান্য রূপক, পদ্মাসনা দেবীমূর্তি অল্প মহাজের। কল্পেবে 'ইত্য' শব্দটি আছে, যানে লক্ষ্য, ধনী। শব্দটি অশোকের সময় পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। শব্দটি উপর হয়েছে 'ইত' শব্দ থেকে, যানে হাতি। বারা হাতি পুণ্ড শব্দবা বারা হাতির পাতে

কতলা করত এমন ধনী বণিকরাই ইঁদুর নাম পেয়েছিল। বণিকদের সম্পত্তি বলতে হুবহু—এক সোনারপোর তাঁড়ার—বার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সমুদ্রবাগিনী সী, দুই হিসেনের খাতাপত্র—বার রক্ষণকারী হল হাতি। (এখানে আরও একটু বলা যায়। হাতি, নাগ—একটা কুবেরের অঙ্গুর বলে খাত ছিল। হুতরাং এখানে হাতি কুবেরের প্রতিনিধিও হতে পারে।) অহুমান করি, এই দুজেরই আমাদের দেশে বিশিষ্ট লেখবার রীতি চালু হয়েছিল বিশেষ থেকে এবং বণিকদের দ্বারা। তাই গণেশই লেখক দেবতারূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।

বণিকদের লাভই সিদ্ধি। তাই গণেশ হলেন সিদ্ধিদাতা। তাঁর মূর্তিতে এক হাতে যে নাড়ু অথবা জাঘির (নেবু) দেখা যায় তা হল সিদ্ধির অর্থাৎ টাকার ধলির প্রতীক। কোন কোন প্রাচীন মূর্তিতে ধলি দেখা যায়। সে টাকার ধলি। ('সিদ্ধি' কথাটির আসল মানে নষ্ট হওয়ার ভাঙ অর্থ এলে গেছে।)

একটু শিষ্ট ফেরা বাক। রত্ন-শিবের মূখ্য অঙ্গুর গণেশের যে ভয়ঙ্কর রূপ তাতে তিনি কোন কোন সমাজে ভীষণ ভয়ের প্রচণ্ড বিষের অপদেবতা বলে গণ্য ছিলেন। এই দৃষ্টিতে তিনি পূজা পেয়েছিলেন তাত্ত্বিক বৌদ্ধ সমাজে, জড়ল নামে। এই নামের যে মূর্তি মিলেছে তাতে গণেশের সঙ্গে বখানসম্ব মিল আছে। তবে মুখ সবলময় হাতির মতো নয়। তবে সর্বদা ভূড়ো পেট। বিষরাজকে পূজা করতে হত বিষ অশ্রুপের জন্তে। তাত্ত্বিক বৌদ্ধ আচার থেকে হিন্দু অহুষ্ঠানেও সবার আগে বিষবিনাশন গণেশের পূজার চলন হয়েছে।

গণেশের বাহন ইঁদুর, কেননা কুবজীবী বাঙালীর কাছে ইঁদুর সবচেয়ে অনিষ্টকারী জীব। তার মতো কসলের ও সজিত মূল্যবান ত্রবোর কতি আর কোন প্রাণী করে না।

এখন গণেশ সম্পর্কে একটু অবাস্তব কথা বলতে হয়। আমাদের দেশে প্রচলিত ধারণা হল যে গণেশ দেবী দুর্গার (এবং শিবের) পুত্র। শিবের পুত্র গণেশকে বলা যায়, যেহেতু তিনি গৌড়ার এক স্বরূপে ছিলেন রত্নপুত্র মরুৎ। কিন্তু তাঁকে দেবীপুত্র বলবার কোন বৈদিক অথবা পৌরাণিক সূত্র নেই। এ সম্বন্ধে যে পুরানো গল্প আছে তা প্রথম বলে গেছেন কবিকরন মুহুর্ন। ঐর মতে গণেশ হল গড়া দেবতা। পার্বতীর গায়ের ময়লা জড় করে তাঁর নবী তাঁর জন্তে খেলার পুতুল পড়ে বিয়েছিল। ময়লা ছুরিয়ে বাঙার মাথাটি গড়া হয় নি। শিব এলে তা দেখে হাতির মাথা কাটিয়ে এনে লোকা তা

তোড়া দিয়ে পুতুলকে লবীবিভ করে দেন এবং দেবীকে বলেন এই বাঙালী তোমার ছেলে। এ কাহিনীর সঙ্গে গণেশের দেবত্বের বা পূজাপালার কোন সম্পর্ক নেই। শুধু আছে দুর্গা প্রতিহার অস্তিত্বের কারণে।

এখন আসা যাক মূল বক্তব্যে। ব্যবসায়ীদের নববর্ষে—পয়লা বৈশাখই হোক আর অন্যর তৃতীয়াই হোক—কেন গণেশ পূজা করে হালখাতা করা হয়।

যে আলোচনা করা হল তার মধ্যে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া মোটেই কঠিন নয়। প্রাচীনকালে গজলক্ষ্মী বণিকদের উপাঙ্গ দেবতার প্রতীক ছিল। এই প্রতীকের দুটি অংশ গজ (পুরুষ) ও লক্ষ্মী পরে পৃথকদের দেবতার পরিণত হয়। লক্ষ্মীরূপে দেবী বণিক-অবণিক নির্বিশেষে সকলেরই গৃহলক্ষ্মীর আরাধ্যা দেবী। আর গজ গণেশে পরিণত হয়ে ক্রমশ ব্যবসায়ীদের হিলাবের খাতা লেখা দেবতার পরিণত হয়েছেন। সিদ্ধিদাতা দেবতা, যিনি একদা বিদ্যরাজ ছিলেন, তাঁর এই পরিণতি অপ্রত্যাশিত নয়। মহাভারতের লেখক দেবতা ব্যবসায়ীদের মহাখতিয়ান দেবতার প্রতিষ্ঠা লাভ করা আমাদের দেশের জলবায়ুর খাতে খুবই প্রত্যাশিত।

কেউ কেউ এখানে মারাঠাদের প্রভাব কল্পনা করতে পারেন। মারাঠা দেশে গণেশ পূজার প্রচলন সবচেয়ে বেশি। এর থেকে কেউ কেউ ভাবতে পারেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে মারাঠারা উড়িষ্যার থেকে খুব প্রভাব বিস্তার করেছিল বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর, এবং ব্যবসায়ীদের গণেশ পূজা করতে সেই সূত্রেই এসে থাকবে। এ কথা ভাববার প্রয়োজন নেই। বাংলাদেশের ব্যবসার কেন্দ্র কিছু কিছু উড়িষ্যার ছিল কিন্তু তাই থেকে গণেশ পূজা প্রচলনের কল্পনা অসম্ভব। আসলে মারাঠার এবং বাংলাদেশে এগেছে একই পৌরাণিক সূত্র থেকে। বরঞ্চ এমন কথা মনে করা যেতে পারে যে, ব্যবসার সূত্রে উড়িষ্যা দেশে বাঙালি বণিকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসে মারাঠাদের গণেশ পূজার প্রকৃতি উদ্ভুদ্ধিত হয়েছিল। বাঙালি গণেশ পূজা করত দুর্গা পূজার মধ্য দিয়ে আজ অন্তত হাজার খানেক বছর। এ পূজা মারাঠাদের মধ্যেও প্রচলিত আছে। এবং তা যে বাংলাদেশের প্রভাবে নয় তা কে বলবে।

## ভারতচন্দ্রের অন্নদা

মুকুন্দরায় চক্রবর্তী, রামেশ্বর ভট্টাচার্য আর ভারতচন্দ্র রায় দেবীমাহার্ম্য কাব্যের বড় কবি এই তিনজন। এঁরা একই সকলের লোক,—জন্ম অথবা কর্ম, কিংবা জন্ম ও কর্ম মূজে। মুকুন্দরায়ের চণ্ডীমঙ্গলের কৃত্তিকা রূপে যে শিব-গৌরীর কাহিনী আছে তা রামেশ্বরের শিবলংকীর্তনে যথাসম্ভব কালোপযোগী রূপ নিয়েছে। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের প্রথম উপাখ্যান সে কাহিনীর উলানবাহী রূপান্তর হলেও তাতে স্থানকালোপযুক্ত বাতাবিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত আছে।

চণ্ডী ও দুর্গা আসলে একই দেবী। চণ্ডী বিদ্যাবালিনী, আরণ্যক-উপাস্তা। দুর্গা দুর্গমরেশাধিষ্ঠাত্রী। শিবের ভাৰ্গৱী গৌরী হলেন হিমবৎসভা উমা। উপনিষদে ইনি ব্রহ্মজ্ঞা উমা হৈমবতী। শিব-কৃত্তের সঙ্গে এঁর সম্পর্কের কোনই ইঙ্গিত নেই সেখানে।

দুর্গা মঙ্গলচণ্ডী, অর্থাৎ প্রচণ্ডা ত্রীদেবতার মঙ্গলময়ী মূর্তি। ইনিই ঋগ্-বেদের অরণ্যদেবতা—অরণ্যানী—বিনি যুগমাতা এবং অনার্যাস-অন্নদারিনি। তাঁর প্রতীক গোখা। কালকেতুকে ভুলেছিলেন তিনি গোখা রূপে, আর অল্পগ্রহ করেছিলেন বোড়শী মূর্তিতে। এই মূর্তি উপনিষদের উমা হৈমবতীর মত “বহু-শোভমানা”। এইখানে দুর্গা-উমার মিল হয়েছে।

মুকুন্দরায়ের কাহিনীতে শিব-গৌরীর সংসারের যে চিত্র আছে তাতে সাময়িক অনচ্ছলতার ইঙ্গিত আছে, বারোমাসে দৈন্তের চিহ্ন নেই। শিব বোগী আত্মবিক, হুতরাং ভিক্ষা তাঁর উপজীবিকা। ভিক্ষার বেয়ালে তিনি ভিক্ষা পান গ্রাহুর আর সঙ্গরথে। সংসারে অনটন ভিক্ষার অগ্রাচুর্ভেদু নয়, তা শিবেরই আলম্ভের জন্তে। হুতরাং দেবী প্রতিকার পুঙ্খতে বাধ্য হলেন দ্বারী বন্দোবস্তে। তিনি মর্ত্যে পূজা নিলেন বস্ত্রভূষি কলিঙ্গে, প্রথমে রাজা বিক্রমাদিত্যের কাছ থেকে, তারপরে গ্রাম্য কালকেতু ও যুগনার কাছ থেকে। আব তাঁর অন্নভিক্ষা রইল না।

মুকুন্দরায়ের আর আড়াইশ বছর পরে রামেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁর শিবলংকীর্তন কাব্য (বা এখন শিবায়ন নামে পরিচিত) রচনা করেন। এই আড়াইশ বছরের মধ্যে বেশে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সেসবের মধ্যে চারী পৃথক

আর্থিক দুর্গতি সর্বাধিক শোচনীয়। এখন ধনপতিরা আর সিংহল পার্টনে বাণিজ্য রাজ্য করে না, তারা মূনির ঘিরে চাষ করার। মোটা ভাতকাপড়ের হরত অভাব সর্বদা ছিল না, কিন্তু সাধারণ দূহের উচ্চাকাঙ্ক্ষার নীচা ঐ “পেট ভরি অন্ন” আর “চাঁটু ভরি বস্ত্র” পর্যন্ত। বানবের এই দুর্গতি দেবতাকেও কারু করেছে। রামেশ্বরের শিব এক-হেলে চাবী আর গৌরী তাঁর সেই মরিচ একমাত্র সঙ্গারের কর্ণধার গৃহিণী। মরিচ, তবে ভয় এবং দেবতা।

ভারতচন্দ্র কাব্য লিখলেন রামেশ্বরের প্রায় বছর পকাশ পরে। ইতিমধ্যে দেশের আর্থিক অবস্থা কোন কোন অকলে খানিকটা উন্নতি হয়েছে। কিন্তু মান লব প্রগতি বিশেষ হয়নি। কিছু পরাগতিই হয়েছে বলতে হয়। রামেশ্বরের ভুলনার ভারতচন্দ্র অনেক বিধান ও বিবন্ধ কবি। কিন্তু ভক্তি-প্রণোদিত সঙ্কল্পতার ভারতচন্দ্র রামেশ্বরের কাছে অবশ্যই খাটো। দেবতা-ভক্তি ভারতচন্দ্রের ছিল নিশ্চয়ই কিন্তু আস্থা তেমনি ছিল কি। গুণাকর কবি বহুদর্শী। ফালিগড়া আর চাঁটু পটু ভারী। তাই তিনি দেবতাকে মনের মাছুর, ঘরের ঠাকুর করে নিতে পারেন নি। তাঁকে পূজা করেছেন অন্নদাতার ভাগ্যদেবী রূপে।

ভারতচন্দ্রের অন্নদা ( বা অন্নপূর্ণা ) মুকুন্দরামের মঙ্গলচণ্ডীরই আবৃত্তিকারূপ সংস্করণ। তবে অবোলা পত্তর সঙ্গে, অবোধ আরণ্যকের সঙ্গে, অবলা নারীর সঙ্গে তাঁর আর সাক্ষাৎ সম্পর্ক নেই। তিনি এখন ধনীরা পালিকা। শিবের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ঘেন পাল্টে গেল। শিবরত্নের সঙ্গে চণ্ডীর একদা বিরোধ ছিল। যে বিরোধের ইতিহাস মনলামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলে অস্পষ্টভাবে আছে এবং যে বিরোধের জড় পৌছুর আর্থ-অনার্থের সংঘর্ষে। আর্থের দেবতা রত্ন পত্তপতি পত্তর পালক অর্থের নয়, পত্তর রাজা পত্তর শালক অর্থের। রত্নের কোপ থেকে পত্তরের বাঁচাবার জন্তে বৈদিক ঋষিরা রত্নের স্তব করতেন। বৈদিক রত্ন ছিলেন পত্তব্যাধ। ( কালকেতুর মধ্যে তারই কিছু আভাস। কালকেতুর মত রত্নও বে-পরোয়া পত্তব্যাতী ছিলেন,—“বৃগং ন ভীমম্ উপহৃদুঃসুগ্রম্”। ) আর অরণ্যানী মঙ্গলচণ্ডী হলেন পত্তব্যাতা পত্তপালিকা। শিব-দুর্গার কাহিনীতে এই মৈত্র বিরোধ দাম্পত্য কলহে রূপান্তরিত। ভারতচন্দ্র সে দাম্পত্য কলহকে লতাকার বিরোধের সর্বাঙ্গিক দৃষ্টে ঘুরিয়ে এনেছেন। রত্ন পত্তিকে বাধ্য করেছেন চণ্ডী পত্তীর কাছে অরুতিকা করতে। মুকুন্দরামের গৌরী স্বামীকে বার বার ক্রেশ না দিয়ে নিজের ব্যবস্থা নিজেই নিয়েছিলেন। ভারতচন্দ্রের



এখন বৈদিক রক্ত ও অ-বৈদিক শিবের মধ্যে মিল ও গরমিল দেখাচ্ছি। আত্মত্বিতে রক্ত স্বর্ণোজ্জলকান্তি হুবা পুরুষ, শিব ধবলকার প্রোঢ় অথবা বৃদ্ধ। বলনকুণ্ঠে রক্ত বিচিত্র অলঙ্কারধারী। তাঁর মাথার বিহ্বলিকরা ধোঁপা (“কপর্ধ”, শিবের বিকৃতিমণ্ডন, সর্পকুণ্ঠ ও জটীভার, পরিধানে গজচর্ম অথবা বাঘছাল। আত্ম রক্তের ধলুর্বাণ ও বজ্র, শিবের জিম্বুল। বাহনে রক্তের রথ, শিবের ঘুর। বৃত্তিতে রক্ত রাজা (“ঈশান”, শিব তিথারী। চারিত্র্যে রক্ত পানের প্রতি কবাহীন, কোপন আর শিব শান্ত, ভালোমাত্র—ভোলানাম। পানে রক্তের গোম, শিবের তাত। কলজ রক্তের গাভী (“গুরি”), শিবের নাতী।

আসলে রক্ত ও শিব স্বতন্ত্র দেবতাবনা থেকে উদ্ভূত, তাদের দেবসত্তা সম্পূর্ণ পৃথক। রক্ত হলেন দুর্ধ্ব কোপন স্তম্ভনায়ক, শিব হলেন উদারীন অধ্যাত্মচিন্তক যোগী। তবে রক্তের অনেক বিশেষত্ব শিবের উপর ধীরে ধীরে আরোপিত হয়েছে, অথবা দুই দেবতাবনার সংযোগ ঘটেছে। তা যদি ঘটে থাকে তাহলে বলব যে, শিবসত্তারই প্রাধান্য রয়ে গেছে।

রক্ত নামটির বৌলিক অর্থ হল অদান্ত প্রকৃতি, বস্তৃত্বভাব। শিব নামের অর্থ হল কলাপকারী, রক্তের যে সৌম্য রূপ (“দক্ষিণ মুখ”) তাই-ই শিব। বেদে রক্ত দুর্ধ্ব বোদ্ধা, পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনীতে শিব মোটেই বোদ্ধা দেবতা নন, তবে তাঁর প্রাক্তন—অর্থাৎ বৈদিক—বোদ্ধত্বের স্মৃতি রয়ে গেছে ‘পিনাকপাণি’ নামে আর জনকের সত্যায় গচ্ছিত হরধনুতে। বস্তুত বৈদিক রক্ত ও অ-বৈদিক শিব সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের ও ভিন্ন ধাতের। একজন হলেন ভীষণ রাজা আর একজন হলেন যোগী তিথারী। রক্তের মতো শিব কোপন স্বভাব নন। তাঁর নিদারুণ ক্রোধের যে দুটি একটি গল্প আছে—বেদন দক্ষবজ্র ভঙ্গে এবং মদন ভঙ্গে—তা বৈদিক রক্ত-কাহিনীরই ভেতর টেনেছে।

নাথ-পত্নী যোগীদের ঐতিহ্য বেশ পুরাতন। এঁদের আখ্যানে শিব হলেন যোগীশ্রেষ্ঠ। মন্ত্ৰেজ্ঞানাথ, গৌরবনাথ, জালদারি—এঁরা সব তাঁর অল্পজ এবং শিষ্টকল্প অল্পচর ছিলেন। শিব পত্নী গ্রহণ করে সংসারী হয়েছিলেন, মন্ত্ৰেজ্ঞানাথেরা তা না করে ভিন্ন পথে চলেছিলেন।

যেদের পত্নাত্মী রক্তের প্রতিকলন হয়েছে শিবের কিরাত বা ব্যাধ রূপে। মহাত্মারতের কিরাতার্চন কাহিনীতে তাঁর প্রমাণ পাই। বাংলা আখ্যায়িকার তিনি ব্যাধ নছেন তবে ব্যাধের প্রতি তাঁর অল্পকল্পতার গল্প আছে।

পৌরাণিক ও লৌকিক আখ্যানে চণ্ডী দুর্গা ও উমা (পার্বতী) একই দেবী শিব-ভাৰ্য্যার তিন নাম। আসলে কিন্তু তিনটি পৃথক দেবী-ভাবনা। ‘চণ্ডী’ মানে চণ্ড-প্রকৃতির অৰ্থাৎ দুৰ্গাত নারী। শব্দটির পুংলিঙ্গ প্রতিরূপ ‘চণ্ড’ সংস্কৃত অভিধানে শিবের নামমালার স্থান পেলেও এটি শিবানুচর একটি ভৈরবের এবং চণ্ডী কতৃক বিনষ্ট একটি অস্ত্রের নাম। চণ্ডী আসলে তাহলে ভৈরবী। লৌকিক ভাবনার ভৈরব হল কল্পমূর্তি শিবের এক বিশেষ প্রমাণ। ভৈরবী যে পার্বতী নয় এবং ভৈরবীর স্বামী ভৈরব যে শিব নয় সে স্বীকৃতি লৌকিক আখ্যানে পাওয়া যায়। চণ্ডীর সঙ্গে বিবাদে গঙ্গা তাঁকে “অস্ত্র-ভাতারী” বলে তিরস্কার করেছিলেন।

কালিদাস প্রমুখ সংস্কৃত কবিরা কোণবতী বা মানিনী অর্থে চণ্ডী শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এই অর্থ গ্রহণ করলে শিবের প্রথম পত্নীকে চণ্ডী বলতে পারি তবে মানে আরও হালকা করে নিরে। শিবের সঙ্গে উমা-পার্বতীর দাম্পত্য কলহ হত কিন্তু সে কলহে দেবী কখনো প্রচণ্ড হননি।

মনে হয় শিবের শক্তি চণ্ডী কল্পনার বৈদিক কল্প-ভাবনার কিছু ছোপ লেগেছে। কল্পের কোণ ভয়াবহ, তা এড়াবার জন্যে স্তবস্ততি করা হত এবং রোগ-অনাময়ের জন্যেও আরোষিত হতেন তিনি, ধনজনলাভের জন্যে নয়। বৈদিক কবির কল্পনার কল্পের কল্প অৰ্থাৎ কোপনবৃত্তাব স্বভাব, তবে অপরিণত দেবমত্তা রূপে প্রতিভাত হয়েছিল। এঁকে বৈদিক কবি বলেছেন ‘মনা’। তাঁদের কাতর প্রার্থনা ছিল,—আমাদের ঘেন মনার কবলে কেলে দিয়োন। (“মা নো অল্যে……রীরথন্ মনারৈ”)। মনে হচ্ছে চণ্ডী-ভাবনার এই মনা-ভাবনার মানবীকরণ (বা মূর্তি-নির্মাণ) ঘটেছে। এখানে মনে করব মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীর কাহিনী। সেখানে চণ্ডী সর্বদেবতার সম্মিলিত ‘মনা’।

বেদে কল্পের মতো লৌকিক কাহিনীতে চণ্ডীর দুটি রূপ। এক রূপে তিনি ভয়ঙ্করী চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী, অল্পরূপে তিনি সর্বদেবতার সম্মিলিত ‘মনা’

দুর্গা নামের মানে হল দুর্গমস্থানের অধিষ্ঠাত্রী ও দুর্গম পথক্লিষ্ট ব্যক্তির রক্ষয়িত্রী, লঙ্ঘ্যে পরিচরিত্রী। বৈদিক দেব-ভাবনার বিনি অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অরণ্যানী, অনেক কাল পরে তিনিই পূজিত হয়েছেন ‘কাতার দুর্গা’ বলে। অরণ্যানী অরণ্যের পঙ্কজের পালন করেন, অরণ্যে বিপর বাহুবীর জীবন তিনি রক্ষা করেন কলহুল দিয়ে। প্রায় হাজার বছর আগে লেখা একটি সংস্কৃত স্লোকে কাতার দুর্গার ( অৰ্থাৎ বনদুর্গার ) পূজার উল্লেখ পাওয়া যায় এইভাবে—

“গিরিগুহার শিলাখণ্ডরূপিণী কান্তার-দুর্গাকে দ্বার লোকের। জীববলি দিয়ে পূজা করে দিনাবসানে বেলের খোলায় পুরানো মদ খেবে সহচরীদের নিয়ে নৃত্যপীত করে থাকে।” চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু উপাখ্যানের দেবী হলেন এই অরণ্য-চণ্ডী। পশুদের মাতা তিনি, কালকেতুর হাত থেকে বাঁচবার জন্তেই তিনি ব্যাধের সন্তানকে ঝাঁকা করে দিয়েছিলেন। ধনপতি উপাখ্যানে এই দেবীই তাঁর অসু-চরীদের পাঠিয়ে খুলনাকে হারা-পশু পাইয়ে দিয়ে সৌভাগ্যশালিনী করেছিলেন।

শিবের পত্নী উমা-হৈমবতীর দেখা পাওয়া গেল প্রথম তলবকার উপনিষদে। সেখানে ইনি “বহুশোভমানা”, ব্রহ্মজ্ঞা। শিবের উল্লেখ নেই, তবে তিনিই যে বক্ষস্পী ব্রহ্ম তাতে সন্দেহ নেই। লৌকিক কাহিনীর উমা-পার্বতীর সঙ্গে উপনিষদের উমা-হৈমবতীর মিল শুধু নামেই নয়। দু'জনেই স্বরূপ ও স্ববেশ। লৌকিক-কাহিনীর শিব বক্ষ নন, তবে বক্ষদের নেতা। তাঁর নিবাস কৈলাস বক্ষদেরই দেশে।

মনসা সম্পূর্ণভাবে লৌকিক দেবতা ( অর্ধপৌরাণিকও বলা যায়, মহাভাবতে তাঁর কিছু কাহিনী আছে ), তবে তাঁর নামটি শৌঁড়য় সেই বৈদিক কুস্ত্রের ‘মনা’-য়। ‘মনসা’ নাম অ বৈদিক হলেও অ-সংস্কৃত নয়, নামটি ব্যাকরণসিদ্ধ কংবার জন্যে পাণিনির একটি বিশেষ সূত্র আছে। মনসার কাহিনী শিক্ষিত বাঙালীর অপরিচিত নয়। এ কাহিনীর নিকর হল—মনসা শিবের কন্যা। তবে অধোনিজা এবং জলমধ্যে পদ্মাগর্ভে জাতা। তাঁকে আকৃতি দিয়েছিলেন দেবকাক বাহুকি। মনসাকে জলকৌড়ারত দেখে শিব না ভেদে তাঁর প্রতি প্রেমামস্ক হয়েছিলেন। মনসা আত্মপরিচয় দিয়ে পিতৃগৃহে গমনের দৃঢ় ইচ্ছা প্রকাশ করলে শিব তাঁকে গোপনে ঘরে নিয়ে যান। জানতে পেরে চণ্ডী ( দুর্গা পার্বতী ) ক্রোধে হন। মনসার সঙ্গে চণ্ডীর প্রথমে মালাগালি, শেষে হাতাহাতি পর্যন্ত হয়। তাতে মনসার একটি চোখ যায়। পরিত্যক্ত মনসা পরে আপনার ভক্তরাজা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা করেন মর্ত্যলোকে। তারই কাহিনী মনসামঙ্গলে বর্ণিত।

মনসার উৎপত্তি জলমধ্যে পদ্মনালে, তাই তাঁর এক নাম পদ্মা। আবার লক্ষ্মীর উৎপত্তি সাগরে অখিতান পশুর উপরে, তাই তাঁরও নামান্তর পদ্মা। চণ্ডীমঙ্গলে দেবীর দক্ষিণ হস্ত সহচরী ‘পদ্মা’। এ পদ্মা ছুয়েরই সমাহার হতে পারে, তবে কর্তব্যপন্থার দিক দিয়ে তাঁর সঙ্গে মনসার সম্পর্কই বেশি।

মনসা জলদেবী এবং বিষনাশিনী। সংস্কৃত এবং লৌকিক পুরাণে তাই তাঁর প্রসিদ্ধ নাম ‘বিষহরি’। সাপের বিষের মতো তীব্র নাশক শক্তির প্রতিকার বহুমান জলধারার সাহায্যে হত। এ বিশ্বাস বৈদিক কবিদের ছিল কিনা বলা যায় না, তবে তাঁরা বিশ্বাস করতেন জলধারার সব অনিষ্ট ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে হৃদয় মককুম্বি ওপারে। মনে হয় সর্পদষ্ট মৃতদেহকে জলে ভাসিয়ে দেওয়া রীতির মূল কথাই তাই।

রুদ্র-শিবের সঙ্গে মনসার একটি বাহ্যিক যোগসূত্র হল সাপের ব্যাপার। লৌকিক কাহিনীতে শিব হলেন সর্প-বিকৃষণ, মনসাও তাই। উপরন্তু মনসা সর্পগোষ্ঠিত ও সর্পবাহন। কিন্তু মনসার এমন মূর্তিও পাওয়া গেছে যাতে সাপের কোন চিহ্ন নেই, দেবী হস্তী-আকৃতা। সেখানে হস্তী = নাগ = সাপ। আগেই বলেছি জন্মসূত্রে জলদেবদয় লক্ষ্মী ও মনসা ( অর্থাৎ অ-লক্ষ্মী ) প্রায় এক। দু’জনেই নাগ-সেবিতা। লক্ষ্মীকে হস্তী অভিষেক করছে, তাই তিনি গজলক্ষ্মী। মনসাকে সাপ মাথায় ছাতা ধরছে, তাই তিনি সর্পদেবী। মনসা যে অলক্ষ্মী তা বোঝা যায় মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগরের কাহিনীতে আর চণ্ডী-মঙ্গলে ধনপতির কাহিনীতে। উভয়ই দেবী ধনী বণিকের—ধারা লক্ষ্মীমন্ত গজলক্ষ্মীর সেবক—অকলাপকারিণী। কমলে-কামিনী দৃশ্যে দেবী স্পষ্টতই অ-গজলক্ষ্মী, তিনি গজের দ্বারা অভিনন্দিত নয়, গজের বিনাশকারিণী।

সাপের সূত্র ধরে বিচার করলে রুদ্র, শিব ও মনসার মধ্যে আরও একটি মিল পাওয়া যায়। বেদের রুদ্র চিকিৎসকদের মধ্যে প্রোষ্ঠ চিকিৎসক ( “ভিবজাং ভিবকৃতমঃ” )। লৌকিক শিবও যেন ধনুস্তরির গুরু, তাঁর অসাধ্য রোগ নেই। এ বিষয়ে বিশেষ কোন কাহিনী নেই বটে তবে প্রসিদ্ধ শিবপীঠে দৈব ঔষধের জন্য ধরনা দেওয়া এখনকার দিনেও অজানা নয়। মনসার নামান্তর ‘বিষহরি’ থেকেই জানা যায় যে, তিনি বিষহারিণী বিদ্যা মূর্তিমতী। তবে সেই সঙ্গে বিষধারিণীও বটে। তাঁর বাম চক্ষে বিষদৃষ্টি, তাই তাঁর এক প্রসিদ্ধ নাম ‘বিষালাক্ষী’। এই নামটি পরে “বিশালাক্ষী” হয়েছে, এবং সেই অন্তসারে দেবীও স্বরূপ পরিবর্তন করেছেন। সে কথা পরে বলছি। মনসার বিষ লোচনে, আর শিবের বিষ কণ্ঠে।

মনসামঙ্গল আখ্যায়িকার মনসার সবচেয়ে বিশিষ্ট নামান্তর পাওয়া যায় কেতকা ( বা কেতুকা )। এই নামের অর্থ এবং হেতু মনসার কাহিনী থেকে জানা যায় না। তবে একটু হৃদয় পাওয়া যায় ধর্মঠাকুরের পুরাণকাহিনী থেকে।

এ কাহিনীতে বলে, সৃষ্টির সূচনা কালে কারণ সমূহে একটি ভিন্ন ভেদে উঠেছিল। সেই ব্রহ্ম-অণু ভেদ করে আদিদেব ধর্মের উৎপত্তি হয়। ভিমের ভলে ভাসতে ভাসতে তিনি ক্লান্ত হয়ে হাই তুললেন, তাতে জন্ম হল পক্ষীর অথবা পর্বনের। (কাহিনীতে আছে “উলুক”, এ শব্দটির দুটি অর্থ—(১) পেঁচা, (২) রান্নার, পকাননি। ধর্মের কাহিনীতে শব্দটি উভয় অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে। গল্পের প্রথম দিকে পেঁচক অর্থ লক্ষ্য, শেষের দিকে বানর।) উলুকের উপর চড়ে ধর্ম জল থেকে উদ্ধার পেলেন বটে তবে আকাশে অস্থির ভাবে ঘুরে কিরে ক্লান্ত হয়ে তিনি মাটিতে ঠাঁই খুঁজলেন। এক তিল গায়ের ময়লা তিনি জলে ধোলে মিলেন। তাতে পৃথিবী সৃষ্টি হল। তখন আদিদেব মাটিতে নামলেন। তার কিছুকাল পরে তাঁর সঙ্গিনী লাভের ইচ্ছা হল। (এখানে তুলনা কর। বায় উপনিষদের উক্তি,—একলা আমি দোকলা চাই।) এই কামনার ফলে তাঁর অঙ্গ থেকে জন্মাল তাঁর অর্ধাঙ্গিনী সঙ্গিনী। আদিদেবী ‘কেতকা’ বা ‘কেতুকা’। (মনে হয় এইরকম আইডিয়াই পরে শিবের অর্ধনারীশ্বর মূর্তি-ভাবনার মূলে ছিল।) নামটির অর্থ হল ‘কামনা’ বা ‘বাগনা’, হস্তরাং ‘মনসা’ নামের প্রতিশব্দ। (এখানে মনে পড়ছে হাজার বছর আগে এক স্থানীয় ভাস্কর বৌদ্ধ উপাসিত দেবীর নাম, ‘ইচ্ছা মহাওয়ারী’, অর্থাৎ ইচ্ছাঠাকুরাণী। ইচ্ছাই-বোম নামটিতেও ইচ্ছাই হল দেবী ইচ্ছারী বা ইচ্ছারিকা।)

কিছুদিন পরে কেতকার সঙ্গ ছেড়ে ধর্মঠাকুর তপস্তায় চলে গেলেন। ইতিমধ্যে কেতকা গর্ভবতী হয়েছেন। যথাকালে জন্মিষ্ঠ হল তাঁর তিন পুত্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। তিন ভাই বড় হয়ে বাপের খোঁজ করতে বার হলেন মায়ের অঙ্গমন্ডি নিয়ে। ধর্মের তপস্তাস্থানে, বজ্রুকা নদীর তটে গিয়ে তাঁরা পিতাকে না পেয়ে নদীতীরে তপস্তায় বসে গেলেন। তখন ধর্ম দেহভ্যাগ করেছেন। কিছুকাল পরে ধর্ম পুত্রদের বিচক্ষণতার পরীক্ষা নিতে যুতদেহরূপে নদীর জলে ভেসে এলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তা সাধারণ যুতদেহ মনে করে উপেক্ষা করলেন, শিব কিন্তু জানতে পারলেন যে এ তাঁদেরই পিতার দেহ। শিবের এই সূক্ষ্মচর্চিতার খুশি হয়ে ধর্মঠাকুর দৈববাণী করলেন শিব যেন কেতকাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। শিব কিন্তু কেতকাকে সরাসরি গ্রহণ করলেন না। কেতকাকে পর পর কয়েক জন্ম নিতে হয়েছিল, তারপর তিনি কেতকাকে বিবাহ করেন, তখন দেবীর নাম হয়েছে

চণ্ডী। কেতকার জন্মান্তর গ্রহণের কোন বিবরণই নেই, শুধু এইটুকু ইঙ্গিত আছে যে কেতকার প্রত্যেক জন্মের এক একটি হাড় নিয়ে মালা গাঁথেন শিব কণ্ঠে ধারণ করতেন। শিবের হাড়মালায় অন্ত বাধ্যা আছে, মতীর অস্থি।)

ধর্ম-ঠাকুরের ও নাথ-যোগপন্থার ভাবনার উৎপত্তি-স্থল এই, পরে দুটি মতে পার্থক্য এসে পড়েছিল। নাথপন্থীরা ঈশ্বর মানেন না, ধর্ম-ঠাকুরের ঐতিহ্যে এক স্মটিকর্তাকে স্বীকার করে নিয়েও তাঁকে ছোট্টো ফেলা হয়েছে। নাথ-পন্থীদের ঐতিহ্যেও ধর্ম আছেন 'নরঞ্জন' নামে, আর কেতকাও আছেন তবে তাঁর নাম কেতকা নয় 'মনসা'। মনসার পূর্ণ নাম 'মনসাদেবী' অথবা 'মনসাকুমারী'।

লক্ষ্মী আর মনসার মধ্যে আরও একটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। লক্ষ্মী হলেন স্থিরজলদেবী, মনসা অস্থির (বা ধারাবাহিত) জলদেবী। বৈদিক সাহিত্যে ধারা জলদেবীই লক্ষ্মীর স্থানীয় ছিলেন। সরস্বতী নদী ছিল ঐর প্রতীক এবং বিশিষ্ট ন ম ছিল 'ইলা' (পুষ্টি)। ইলার বিপরীতে ছিল 'নিষ্কৃতি', বৈদিক অলক্ষ্মী। ইনিই অ-বৈদিক ভাবনা আবর্ত দিয়ে এসে বিবালাকী মনসা হয়েছে।

তারপর গঙ্গার কথা। সংস্কৃত পুরাণকথায় গঙ্গা হলেন বিষ্ণুর স্রবীভূত রূপ। শিবের গান শুনে বিষ্ণু গলে গিয়েছিলেন। স্রষ্টা তাঁকে কমণ্ডলুতে ভরে রাখতে পারেন নি, শিব তাঁকে মাথায় ধরে রাখলেন। গঙ্গার মাহাত্ম্য তাই বিষ্ণুর মাহাত্ম্যের তুল্য। বাংলা দেশে প্রচলিত লৌকিক আখ্যানে মনসা কাহিনীর মুখবন্ধে গঙ্গা ও শিব সম্পর্কে অভিনব গল্প আছে। দেবতাদের একবার বড় সমাশ (অর্থাৎ বাঁওন-দাঁওন) হয়েছিল। তাতে রাখার জন্যে গঙ্গার ডাক পড়ে। গঙ্গা শাস্ত্র মুনির পত্নী। শিব শাস্ত্রজ্ঞর ঘরে বান মুনির অত্মমতি নিয়ে গঙ্গাকে আহ্বান করে আনতে। শাস্ত্র মুনি গঙ্গাকে যেতে দিতে রাজি হলেন এই শর্তে যে গঙ্গা যেন সূর্যাস্ত হবার আগেই ঘরে ফেরেন। শিব এই শর্তে রাজি হয়ে গঙ্গাকে নিয়ে গেলেন। রাখাবাড়ী শেষ করতে করতে লক্ষ্য হয়ে গেল। তার পর শিব গঙ্গাকে বাড়ি নিয়ে গেলে শাস্ত্র মুনি পত্নীকে ঘরে ঠাই দিতে রাজি হলেন না। গঙ্গা তখন বান কোথায়। অগত্যা শিব তাঁকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। এই সূত্রে গঙ্গা হল চণ্ডীর মপত্নী।

অপরদিকে বৈদিক রূত্রেয় লক্ষ্যেও গঙ্গার কিছু যোগ টানা যায়। বৈদিক রূত্রেয় সবচেয়ে বিশিষ্ট গুণ ছিল এই যে, তিনি "জলায়" এবং "জলাবভবজ"

অর্থাৎ তিনি ভলের মতো শীতল এবং জলের মতো শীতল তাঁর ঔষধ। অর্বাচীন বৈদিক ভাবনার সরস্বতী-প্রবাহে এমনি গুণ আরোপিত হয়েছিল। আবণ্ড পরবর্তী কালে সে গুণ অনেক বর্ধিত হয়ে বর্তেছে গঙ্গাধারার।

বেদ-পুরাণ ও লৌকিক কাহিনী ইত্যাদি বাদ দিয়ে যদি পশ্চিমবঙ্গে পুরানো গ্রামগুলিতে সুপ্রাচীন গ্রাম-দেবতার বিচার করি তাহলে দেখি যে, লোক-ভাবনার গ্রামের রাজা ( অর্থাৎ পালনকারী ) হলেন এক পুরুষ দেবতা এবং এক নারী দেবতা। এ পুরুষ দেবতা ছিলেন ধর্ম। সে ধর্মঠাকুর এখন অনেক গ্রামেই শিবঠাকুর বলে পূজিত হচ্ছেন। এমনি ধর্ম-শিব ঠাকুরের প্রাচীন মূর্তি অর্থাৎ প্রতীকগুলি হল অল্পবিস্তর দীর্ঘাকার শিলাখণ্ড, যেমন বিষ্ণুর প্রতীক হয়েছে গোল শিলাখণ্ড অর্থাৎ শালগ্রাম। তেমনি নারী দেবতার প্রতীক হল চেপটা শিলাখণ্ড অথবা জলপূর্ণ ঘট। এমন প্রাচীন গ্রাম-নারী দেবতা এখন অল্প কয়েকটি গ্রামে মনসা বলে পূজিত হন, তবে অধিকাংশ গ্রামে তিনি বিশালাক্ষী চণ্ডী হিসাবে পূজা পান। আসলে বিশালাক্ষী চণ্ডীর বিশেষণ বা নামান্তর বলে মনে হয় ন', কেননা চণ্ডীর বর্ণনায় (বা আচরণে) আরতলোচনা বিশেষণের কোনই সাধকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। আগেই বলেছি যে, মনসার এক বিশেষ অঙ্গ-লক্ষণ ছিল এই যে, তাঁর বাম অঙ্গি বিষপূর্ণ। বিষপূর্ণ বলেই মনসা বী চোখ বুজে থাকতেন, ক্রুদ্ধ হলে খুলে বিষদৃষ্টি দিয়ে শত্রু নিশািত করতেন। ( এই জন্তেই তাঁকে 'কানী' বলা হয়েছে। ) সুতরাং প্রাচীন গ্রাম-দেবী আসলে ছিলেন বিশালাক্ষী, মনসা।

পুরানো গ্রাম-দেবীর শিলাময় ও জলময় এই দ্বিবিধ রূপের একটু তাত্পর্য আছে। আসলে এখানে দুটি দেবী, একজন স্থলদেবী চণ্ডী-দুর্গা, অল্পজন জলদেবী মনসা-গঙ্গা। হয়ত এই দ্বিধা-ভাবনার মূলে একটা একটি দেবী-ভাবনা ছিল, যে দেবী জলস্থলের অধিকারিণী। এই দৃষ্টিতে বিচার করলে চণ্ডীমঙ্গলের বর্ষিক খণ্ডে বর্ণিত দেবী চরিত্রের সঙ্গতি হয়। এই আখ্যানে দেবী অরণ্যানী দুর্গা-চণ্ডীরূপে খুন্সার হারানো ছাগল এনে দিয়ে তাকে মৌভাগ্যবতী করেছিলেন। অপরদিকে জলদেবী গঙ্গা-মনসা হয়ে পিতা পুত্রকে বিভ্রান্ত করে অনর্থে কেল-ছিলেন। ধনপতি শ্রীপতি কাহিনীর দেবীর কুটিল চরিত্র অস্তথা দুর্বোধ্য।

## জৈন বৌদ্ধ ও সিদ্ধ সাধনার প্রাগিতিহাস

উপনিষদে ব্রাহ্মণ-শ্রমণের উল্লেখ থেকে বোঝায় যে অর্বাচীন বৈদিককালে ধর্মচর্চার ব্যাপারে দুটি শ্রেণী সর্বোচ্চ প্রভাব পাত্র ছিল। একটি ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানপরায়ণ এবং সংসারী। আর একটি শ্রমণ, অর্থাৎ সংসারজীবন প্রাস্ত এবং বৈরাগী। এখনকার ভাষায় ব্রাহ্মণ হল সংসারী সাধু, শ্রমণ বৈরাগী বাবাজি।

পরবর্তীকালে সংস্কৃত সাহিত্যে ব্রাহ্মণ শ্রমণে শ্রমণ শব্দটি মেলে না। মেলে জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যে উচ্চতর অধ্যাত্ম সাধক অর্থে। ব্রাহ্মণের অধ্যাত্ম সাধনার ( অর্থাৎ দেবারাধনায় ) কামনা ছিল ঐহিক হিতসুখের ও পারলৌকিক সংগতির। শ্রমণের তপস্তায় এবং ধ্যানধারণার উদ্দেশ্য ছিল মৃত্যুঞ্জয়তা। শ্রমণরা সংসারবিমুখ, বাস সমাজের বাইরে। স্ত্রীলব্ধ বর্জিত এবং আত্মভরণ চেষ্টা-বিমুখ। বলাবাহুল্য এঁরা দেবারাধনা করতেন না। শ্রমণেরা ছিলেন নিরীশ্বর।

জৈন ও বৌদ্ধ সাধনায় শ্রমণ হ'ল উচ্চতর সাধকের পরিচয়। স্তুরাং অনুমান করতে দোষ নেই যে এ দুটি সাধনার ধারা একই উৎসমূল থেকে উৎসারিত। দুটি সাধনার পদ্ধতিতে যথেষ্ট নিম্ন আছে। অমিলও আছে।

দুটি ধর্মই সমাজজীবনের বিরোধী। দায়পরিগ্রহ চলবে না, অর্থাৎ বংশসূত্র ছিন্ন করতে হবে। ঘর-দুয়ার সম্পত্তি থাকবে না। চাষবাস বাণিজ্য শিল্পকর্ম ও চাকরি—এসব চলবে না। বন্ধন করে খাওয়াও চলবে না। প্রাণ ধারণ করতে হবে অঘাচক ভিকারবৃত্তিতে। ভিকারবৃত্তি অবশ্য সমাজজীবন বিরুদ্ধতার সঙ্গে খাপ খায় না। মনে হয় একদা এঁদের বৃত্তি ছিল বনের কলমূল আহার। জৈন বৌদ্ধ দু সস্ত্রদায়ের সাধুরাই মাথা মুড়োতেন। তাঁদের কোন পূজা উপাসনা ছিল না—অন্ততঃ প্রথম দিকে, মোন ধ্যান-ধারণাই তাঁদের সাধনার পথ ছিল। তাঁরা অহিংসায় দৃঢ়নিষ্ঠ ছিলেন। তাঁদের ব্রত ছিল কঠোর ব্রহ্মচর্য। পরে নারী সাধিকার স্থান-ও এই দু-মতে হয়েছিল, তবে পুরুষ এবং নারী সাধক পরস্পর থেকে বিরত থাকতেন। জৈন মতে নারী সাধিকার স্থান দেরিতে হয়েছিল। দু সস্ত্রদায়ই সাধুদের জোট বেঁধে থাকার ব্যবস্থা ছিল। জৈন মতে সাধু-জোটকে বলত “গণ”, বৌদ্ধমতে “সংঘ”। জোট বেঁধে থাকার স্থানকে বলত ‘বিহার’।



জৈন মত প্রাচীনতর। এ মতের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর বর্ধমানস্বামী হলেও এঁদের পূর্বাচাৰ্ণপরম্পরা স্বীকৃত ছিল। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গৌতমপুত্র শাক্য সিদ্ধার্থের সম্প্রদায়ে তেমন কোন স্বীকৃত পূর্বাচাৰ্ণপরম্পরা ছিল না। তবুও এই মতের এক বড় সম্প্রদায়ে দেবপূজা বা গুরুপূজার মতো বুদ্ধের পূর্বরূপ অবলোকিতেশ্বরের পূজা প্রচলিত হয়। জৈন সম্প্রদায়ে মহাবীর সমেত সব পূর্বাচাৰ্ণেরই হয়েছিল। এই পূজাবিধির প্রবর্তন হয়েছিল শ্রব্তর প্রতিমা নির্মাণরীতি চালু হবার পরে। পূজাবিধির মধ্যে স্তবের ও গানের ব্যবস্থা ছিল। জৈন ও বৌদ্ধ সাধুরা অনেকেই শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন, এবং সাধু হয়েও অনেকে বিদ্যাচর্চা পরিচালনা করেননি। ভারতীয় সাহিত্যের অনেক ভালো কবিতা এরাই দিয়ে গেছেন। সমসাময়িক কথাতারার অল্পসীমানে এঁরাই সমধিক যত্নবান ছিলেন।

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের মূল কথা—বাসনা ত্যাগ, আত্মভরণচেষ্টা ত্যাগ, সংসার-বন্ধন সম্পূর্ণ ছেদ, দুঃখ প্রতিরোধের চেষ্টা পরিহার, অহিংসা ও ব্রহ্মচর্য ব্রত এবং ধ্যান-সাধনা—এক হলেও আচরণ দু'মতের মধ্যে গোড়া থেকেই কিছু পার্থক্য ছিল এবং এই পার্থক্য ক্রমশ বেড়েছিল। প্রথম থেকেই ছিল ত্যাগের ও ক্রেশ স্বীকারের কঠিনতায়। দু'সম্প্রদায়েরই প্রাণধারণ হত ভিক্ষা-বৃত্তিতে। তাঁরা কারো কাছে চাইতেন না, তবে আহার গ্রহণের কালে তাঁরা বাইরে বেড়াতেন, কেউ কিছু দিলে তা গ্রহণ করতেন। বৌদ্ধরা ভিক্ষাগমনের সময়ে হাতে পাত্র নিতেন, জৈনের তা করতেন না, তাঁরা অঙ্গুলিতে গ্রহণ করতেন। গৃহস্থেরা ভিক্ষা দিত নিজেদের জন্ত 'রাঁধা অন্ন থেকে'। যারা আমিষহারী তারা আমিষ অন্নও দিত। বৌদ্ধেরা তা গ্রহণ করতেন, কিন্তু জৈনেরা তা প্রত্যাখ্যান করতেন। বৌদ্ধদের তুলনায় জৈনেরা বেশী অহিংসাবাদী ছিলেন।

জৈন সাধুরা গোড়ার দিকে বস্ত্র-পরিধান করতেন না, সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকতেন। পরে কাপড় পরা চালু হয়, কিন্তু এক সম্প্রদায়ের সাধুরা আজকের দিনেও সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকেন। এঁদের সম্প্রদায়ের নাম 'দিগম্বর'। বৌদ্ধেরা গারে কাপড় জড়াতেন গেরুয়া রঙের। এককথায় জৈন সাধুদের আচরণ প্রকৃতি-ঘোঁষা, বৌদ্ধ সাধুদের আচরণ সমাজ-ঘোঁষা। জৈন সাধুর আচরণের এক বৈশিষ্ট্য কঠিন আত্মসংযম কঠোর ভোগত্যাগ, এক কথায় সংযমের তপস্বিতা। তাই তাঁদের পরিচয় ছিল 'যতী' বলে। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ভোগ খুঁজতেন না,

তবে নিজারণ উপোসও করতেন না। আত্মজীবকে বতীরা বতটা কষ্ট দিতেন ভিক্ষুরা ততটা দিতেন না।

সিদ্ধ মতকে বৌদ্ধী মত বলা যায় এবং আমি অন্তর্জ্ঞ তাই বলেছি। কিন্তু এখন নামটিকে খুব সজ্ঞত ব'লে মনে করি না; যেহেতু 'যোগ' ও 'বৌদ্ধী' শব্দ দুটির মানে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এখন 'যোগ' মানে চিত্তবৃত্তি নিরোধ বা ধ্যানধারণা। সে তো জৈন ও বৌদ্ধ মতেও আছে। 'হঠযোগ' অর্থ ধরলেও এখানে পূর্ণ সজ্ঞতি হয় না, কেননা কঠিন তপস্যা জৈন মতেও আছে। আমার মনে হয় গোড়ায় এবং এ মতের সাধনার প্রাতিষ্ঠাকালে 'যোগ' মানে ছিল এক চিত্তে প্রভুর আত্মগতা এবং 'বৌদ্ধী' মানে ছিল এক চিত্তে অল্পগত ভৃত্য। এ সাধনা এক হিসাবে নিরাকার ছিল, কেননা কোন জগৎ পরিচালক ঈশ্বর অথবা জগন্ময় ব্রহ্ম এমতে স্বীকৃত নয়। আর হিসাবে বলা যায় এমত ছিল সর্বোপর। অর্থাৎ সিদ্ধ মতে আচার্য অর্থাৎ শিষ্যগুরু স্বীকৃত কিন্তু আসল গুরু অর্থাৎ মন্ত্রদাতা ছিল সবাই ঈশ্বর, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে। জৈন ও বৌদ্ধ মতের সঙ্গে সিদ্ধ মতের একটা বড় বিভেদ লক্ষণ হ'ল গুরুবাদ নিয়ে। জৈন ও বৌদ্ধ মতে নীলা গুরু নেই। সিদ্ধ মতে তা আছে। সিদ্ধ গুরুকে নবীন শিষ্য পার্শ্বচর ভৃত্যের মতোই লেগে থেকে সেবা করত। সেই সেবাই 'যোগ' এবং সেই সেবাকারী শিষ্যই 'যোগী'।

সেকালে প্রভুরা মাথায় চুল রাখতেন, পার্শ্বচর অন্তরঙ্গ ভৃত্যের মাথা নেড়া থাকত। (ঘাতে কোন অবস্থায় প্রভু-ভৃত্যের পদের ও মৰ্যাদার ব্যতিক্রম সম্ভাবনা না ঘটে।) তাই নবীন যোগী-শিষ্য মাথা মুড়োতেন এবং প্রবীণ যোগী-গুরু সিদ্ধ আচার্য মাথায় চুল অথবা জটাভার রাখতেন। এইখানে জৈন ও বৌদ্ধ ভিক্ষুকের সঙ্গে যোগী গুরুর একটা বড় বাহ্য প্রভেদ। সিদ্ধ মতের প্রসঙ্গে এগোবার আগে এই মতের পূর্ব ইতিহাস সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা আলোচনা করি।

সিদ্ধ মতের ও সাধনার জড় গিয়ে পৌছয় অর্বাচীন বৈদিক কালে। ঋগ্বেদের অন্তর্গত একটি সূক্তে (১০.১৩৬; এটি অর্থব বেদেও আছে) এই সাধনার মূল গুরুদের ও সে সাধনায় বাহ্য রূপের কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত আছে। সূক্তটির দেবতা উল্লিখিত হয়েছেন "কেনী" বলে। মানে কেশধারী। ইনি মূল গুরু, স্ততরাং ইনিই সব—অগ্নি, বিব, সূর্য—আকাশকে ধারণ করে আছেন। এঁর অহুচরেরা হলেন "মুনি" (অর্থাৎ পরম জানী)। এঁদের মেথলা হাওয়ার,

পরন্তেন এঁরা গেক্সা ধুলা। এঁদের গতি ছিল হাওয়ার পিছনে পিছনে দেবতাদের আগমনে (?)। এঁরা চলতেন আকাশ মার্গে। এঁরা দেবতাদের ভালো কাজের সহায়ক হিতকারী বন্ধু। অশ্লরা গর্ভ ও যুগ চরে যেখানে সেখানে কেশীর বিচরণ। কেশী মনের কথা জানে, তিনি প্রিয়, প্রিয়তম সখা। বায়ু এঁর ভক্ত মখন করে, “কুনরম” বাটে; যে বিষ কেশী একই পাত্রে রক্তের সঙ্গে পান করেছিলেন।

এই নিরুপদ থেকে অস্ত্রমান করা কঠিন হয় না যে কেশী এবং রক্ত সহচর—হরত উপাসক-উপাস্ত বা শিষ্য-গুরু ছিলেন এবং তাঁরা ভাঙ খেতেন। এর থেকে আরও বোঝা যায় যে বৈদিক দেবতা রক্ত কেমন করে পর-বৈদিককালে জটাধারী, দিগধর, বিকৃতিভূষণ, ভজাপ্রিয় শিবঠাকুরের সঙ্গে মিলিয়ে গিয়েছিলেন।

এই বৈদিক শৃঙ্খলে বর্ণিত কেশী-মুনিরা সংস্কৃত সাহিত্যে (এবং পুরাণে) ‘সিদ্ধ’ নামে উল্লিখিত হয়েছেন। বেদে ‘সিদ্ধ’ কথাটি নেই। অত্যন্ত অবাচীন একটি শৃঙ্খলে (পুরুষ শৃঙ্খল : ১০.১০) ‘সাধা’ নামে একশ্রেণীর দেবতার উল্লেখ আছে যারা মনে হয় সিদ্ধ মতের গুরু স্থানীয়। এঁরা যজ্ঞ সাধনা করে নিজস্ব স্বর্গলোকে অধিষ্ঠিত আছেন, যে স্বর্গলোকে পুরুষমেধী সাধক পেয়ে থাকেন (১৬)।

যজ্ঞেন যজ্ঞম্ অবজন্ত দেবাস্ তানি ধর্ম্যণি প্রথমানি আসন্।

তে হ নাকং মহিমানং সচন্ত যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্নি দেবাঃ ॥

‘যজ্ঞের দ্বারা দেবতারা যজ্ঞকে যজন করেছিলেন। সেই হ’ল প্রথম ধর্ম্যস্থান-বিধি। সেই শক্তিসমূহ (অর্থাৎ এমন সার্থক অস্ত্রুষ্ঠানের ফল) স্বর্গে পৌছেছিল (অর্থাৎ সাধককে সেই স্থানে উত্তীর্ণ করেছিল) যেখানে আগেকার সাধা দেবতারা বিরাজ করেন ॥’

এই সাধা দেবতাদের নন। এঁদের অস্ত্রুচর বা সহচর হলেন ঋষি (৭)।

তেন দেবা অবজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্ চ যে ॥

‘সেই (অস্ত্রুষ্ঠানের) দ্বারা দেবতারা—সাধ্যারা—, এবং ঋষিরা যজন করেছিলেন ॥’

সাধ্যাদের স্থান ছিল অখন্তন স্বর্গলোক (“ভুবস”), সেখানে থাকত অশ্লরারা এবং গর্ভব (সোম রনের ভাঙারী)। হস্তরাং সেখানে ভোপের আরোহনে অশ্লুগতা ছিল না।

পরবর্তীকালে এই সাধনদের সাধনার উত্তীর্ণ শিষ্যরাই হয়েছেন 'সিদ্ধ'। সিদ্ধেরা যে নারীসকল বজ্রিত ছিলেন না, তাঁদের যে সঙ্গীতচর্চা নিষিদ্ধ ছিল না এবং তাঁরা যে শিবের ভক্ত ছিলেন তার প্রমাণ মেঘবৃতে কালিদাসের উক্তি :

সিদ্ধবৈশ্ণব, জলকণ্ডরাদ্ বীণিভব্ মুক্তমার্গঃ

বীণাহন্তে 'সিদ্ধযুগলেরা পাছে (থতে) ভালো হাওয়া লাগে সেই ভয়ে পথ ছেড়ে দেবে।'

শব্দং সিদ্ধৈর্ উপচিতবলিং ভক্তিনম্রঃ পরীয়াঃ ।

'ভক্তিভরে নত হ'য়ে (তুমি শিবের চরণচিহ্ন) প্রদক্ষিণ ক'রে', যেখানে সিদ্ধেরা সর্বদা নৈবেদ্য যোগাচ্ছেন।'

( কালিদাসের এই শব্দের কথাটিতেই 'যোগ' ও 'যোগিন্' শব্দের প্রাসঙ্গিক মূল অর্থটি দরা পড়েছে। এই সিদ্ধ সাধকেরা ছিলেন গুরু বা উপাস্ত্রের অনবরত যোগানদার। অনবরত নৈবেদ্য ইত্যাদি যোগান দেওয়াই ছিল 'যোগ'। )

সিদ্ধ মতের সাধনার কথা পুরানো গ্রন্থে পাওয়া যায় না। ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর লোকগীতিতে এবং এ সাধনার ছবি এবং যোগীপন্থের কড়চানিবন্ধে এ সাধকদের উপদেশ কথা ছড়ার আকারে মিলেছে। আর্ঘ-ভাষী ভারতের সর্বত্রই যোগীদের গান ও ছড়া একদা প্রচলিত ছিল এবং এখনো আছে আরও কীণভাবে। এইসব রচনার মূল ভাষা যে বাংলা ছিল তা বোঝা দুর্ব্বন্দ নয়। 'সুতরাং বাংলা ও নিকটবর্তী প্রাচ্য ভারতীয় অঞ্চল যে এই সাধনার একদা মূখ্য পীঠস্থান ছিল সে কল্পনা কষ্টসাধ্য নয়। যোগী সাধনার উদ্দেশ্য ছিল 'সিদ্ধ' হওয়া, অর্থাৎ অনিমা লম্বিমা ব্যাপ্তি ইত্যাদি অষ্ট ঐশ্বরিক শক্তি লাভ ক'রে অমর হওয়া। এই উদ্দেশ্যে এবং দেহ ভোগ অপরিমিত করবার উদ্দেশ্যে জড়িবড়ি ঔষধের ব্যবহার করতেন। তাঁরা সঙ্গীত চর্চা করতেন এবং ছবি আঁকা ও কাপড় বোনার মতো শিল্পচর্চাও করতেন। বৌদ্ধ পরিব্রাজকদের মতো যোগী পরিব্রাজকেরাও ভারতবর্ষের বাইরে যেতেন। ষাদশ শতাব্দীতে এইরকম পরিব্রাজক ভারতীয় যোগীর চীনদেশে উপস্থিতি একটি পুরানো চীনের উপন্যাসে (রচনাকাল পঞ্চদশ শতাব্দীতে) বর্ণিত আছে। যোগীর অমাতুল্যিক শক্তি এবং বুঝা ঔষধ বিতরণের উল্লেখ এতে আছে।

গোড়ার দিকে শিব শুধু প্রধান যোগী ছিলেন। অর্বাচীন বৈদিক সাহিত্যের

সংজ্ঞায় মধ্যে তিনি ছিলেন একজন ‘সাধ্য দেব’ অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর দেবতা। ব্রাহ্মণ্য মতে উপস্থিত শিবের বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না কৃত্তের সঙ্গে। আগে যে বৈদিক স্তোত্রের উল্লেখ করেছি তাতে কেবলকে দেখি কৃত্তের সঙ্গে এক পায়ে “বিষ” পান করছেন। স্তোত্রায় কেবলী (পরবর্তীকালের শিব) কৃত্তের গণের অন্তর্গত গণ্য হ’তেন। যোগী-পন্থের বাংলা কাহিনীতে মীননাথ গোরক্ষনাথের এবং ময়নামতী-গোপীচন্দ্র-জালন্ধরির গল্পে—শিব ছিলেন সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় গুরু এবং মীননাথ (মন্ত্ৰেশ্বরনাথ), গোরক্ষনাথ, জালন্ধরিপাণ্ডু ও কারুপাণ্ডু ছিলেন তাঁর সহযোগী সাধক। শিবের সঙ্গে বাকি চার জনের মনান্তর ও বিচ্ছেদ ঘটল শিবের বিবাহের ফলে। জগৎমাতা (“জগতের আই”, ক্রিষ্ণির “গদান্ মা”, রোমান মতেবু মাগ্না’) গৌরী চেয়েছিল শিবের মতো অপর যোগীরাও বিবাহ করে ঘরবাসী হোক। তাঁরা তা চাননি। তাঁর যোগস্থান কৈলাশ ছেড়ে চলে যান। এই প্রয়াণের পরে তাঁদের ইতিহাসই লোকনৈতিগুলিতে বর্ণিত।

শৈব মতের এই স্বতন্ত্রতা ঘটেছিল খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর গোড়ার দিকে। কলিঙ্গের রাজা ধারবেল (খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী) তাঁর অস্থাননে বন্দনা করেছেন অর্হৎদের এবং সিদ্ধদের এবং নিজেকে বলেছেন “ঐর”। এই কথাটির মানে নিয়ে পণ্ডিত সমাজে বিভ্রান্তি আছে। শব্দটির মূল আছে ‘ইরা’—মানে স্বাদু ও বলবর্ধক পেষ, পুষ্টিকর খাদ্য, পুষ্টি। কোন ধর্মমতের সঙ্গে মেলাতে গেলে শৈব ধর্মেরই সঙ্গে মিল হয়। শিবের উপাসনাতেই সর্ববিধ ভোগৈশ্বর্যের বাহুলা প্রথম দেখা গিয়েছিল। এই জাঁকজমকে পূজা-উৎসবকাণ্ড অধর্ববেদে ব্রাত্য নৃপুতুলিতে তির্যকভাবে কিন্তু উজ্জলরূপে আছে। সেখানে পূজা পেয়েছেন ব্রাত্য, তিনি কোন দেবতার মতো নন, যেন রাজা, এবং বৈদিক স্তোত্রের কেবলীর সঙ্গে যেন মিল আছে মনে হয়। এই ব্রাত্য যে শিব—যাঁর পক্ষে ‘ঈশ্বর’ নাম সবচেয়ে বেশী প্রযুক্ত এবং খাটেও সে অহুমান করা খুব দুর্বল নয়।

জৈন ও বৌদ্ধ মত যখন উদ্ভূত হয় তখন ঐর (অর্থাৎ ঈশ্বর মত অজ্ঞাত ছিল না। পানিনি স্বল্প, বিশাখ প্রভৃতি শৈব দেবতার পূজার উল্লেখ করেছেন। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে শৈব সাধুরাই অশোকের সময়ে, এবং পরেও আত্মবিক বলে অভিহিত ছিলেন। কিন্তু আত্মবিক নামটিকে শৈব সন্ন্যাসীদেরই একচেটে অভিধা বলে নেওয়া যায় না। শব্দটির ব্যুৎপত্তিসংগত অর্থ

হ'ল 'ষাদের কোন প্রাণধারণের জন্ত বৃত্তি বা প্রচেষ্টা নেই (অজীবিকা+ইক, আদিষরের বৃত্তি)। তাহলে শব্দটি জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতি যে কোন সাধু সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হতে পারে যারা অষাচক বৃত্তি ভিক্ষাজীবী ছিলেন। 'ভিক্ষু' কথাটিরও এই অর্থ মৌলিক, কিন্তু তাতে অল্প অর্থ এসে যাওয়ার 'আজীবিক' শব্দটি গড়তে হয়েছিল। অশোকের নাতি দশরথ আজীবিকদের বর্ষাবাসের জন্ত বরাবর পাহাড়ে গুহা নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

লিঙ্গ মত হুভাগে বিভক্ত হবার পর বিভক্ত দু সম্প্রদায়ে জীবন ধারণের উশার সম্বন্ধে ভিন্ন পথ অবলম্বিত হয়েছিল। শৈব মত—'ঐর'—ঐশ্বরের পথ নিয়েছিলেন। ধনীর গুরুগিরি করে মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়ে পূজা আড়ম্বরের মধ্য দিয়ে ভোগের আয়োজন চালিয়েছিলেন, সন্ন্যাসী হ'লেও। আর বোগীরা ভিক্ষাবৃত্তি আঁকড়ে রইলেন। এই দু সম্প্রদায়ের আচরণ সম্বন্ধে মূল্যবান ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই সহস্রাব্দীর গোড়ার দিকে তথাকথিত "বৌদ্ধ তান্ত্রিক সহজিয়া সম্প্রদায়ে অকাট্ট ছড়া এবং বাংলা গান ("চর্চাপীতি") থেকে। 'অইরিরদের সম্বন্ধে অকাট্ট ছড়ায় বলা হয়েছে যে, তাঁরা গায়ে ছাই মাখেন, মাথায় জটাভার বহন করেন, কোণে ব'সে ঘণ্টা নাড়েন, লোককে 'ধাধা' দিয়ে কানে ফুসফুস মস্ত্র দেন। বাংলা গানে বোগীদের সম্বন্ধে বর্ণনা কিছু বিস্তৃততর। তাঁরা কেউ কেউ গায়ে ছাই মেখে উলঙ্গ থাকতেন, কেউ কেউ হাতে, পায়ে, গলায় কানে গয়না পরে নট সজ্জা করতেন। (নটসাজ একদা তাদের শিব-পূজার সজ্জা ছিল বলে কি? রুদ্রের গণেরা নট সাজ করত।) হাড়ের মালাও নিতেন। নারী-সজ্জা বর্জিত ছিল না। পারা-ঘটিত রসায়ন ঔষধেরও চর্চা করতেন। তাঁরা অষাচক ভিক্ষায় বেঁচেতেন। পাত্র শব্দ লাউখোলা ("লাউয়া", অথর্ব বেদের ত্রাত্য সূক্তে "অলাবু পাত্র")।

বাংলাদেশের ইতিহাস বস্তুতঃ জানা যায় তাতে স্বচ্ছন্দে কল্পনা করতে পারি যে এদেশে শৈব মত ব্রাহ্মণ্য জৈন ও বৌদ্ধ মতের অনেক পরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। প্রতুলিগিতে শৈব বিহার বা মঠের প্রতিষ্ঠার উল্লেখ পাওয়া যায় দশম শতাব্দী থেকে। বাংলাদেশের প্রত্যন্তে বিহারে ও আসামে শৈব মতের প্রচার বিস্তৃততর ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম জৈন ধর্ম এবং বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে যেমন ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগল অমনি শৈব ধর্মের মহিমা জাগতে লাগল। মনে এর জন্তে বাইরের প্রভাবও কিছু দায়ী। এককালে ধনী বণিকেরা অনেকেই শৈব ছিলেন। (দ্বয়পীঠ কবিকঙ্কণের উক্তি "বে জন শবর

পূজে নহে ধনহীন”।) মনে রাখতে হবে শিবের ধনৈর্ঘ্যের ভাগ্যবানী ছিলেন সুবের।

এই আলোচনার সিদ্ধ সাধনার কথায় গোড়া ছাড়িয়ে অনেক দূর এসেছি। তার কারণ এ সম্বন্ধে বেশী কথা কেউই বলেন নি। জৈন ও বৌদ্ধ সাধনার ইতিহাস বহু প্রামাণিক গ্রন্থে সহজলভ্য।

## নাথ-পন্থের সাহিত্যিক ঐতিহ্য

সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে আশ্রয় করিয়া একাধিক বাগসাধনার ধারা একসা পূর্বভারতে যে বিশিষ্ট রূপ লাভ করিয়াছিল তাহা এখন নাথপন্থ নামে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই নামকরণের হেতু হইতেছে এষ্ট সাধনমার্গে সিদ্ধ ও সাধকদিগের নামের শেষে “নাথ” শব্দের অস্তিত্ব। উত্তর বঙ্গ হইতে রাজপুতানা-গুজরাট-পাঞ্জাব পর্যন্ত সমগ্র উত্তরাংশে স্থানে স্থানে এখনো যে নিরঞ্জন-পন্থী যোগী সন্ন্যাসী-ভিক্ষুক সম্প্রদায় “কনকট”, “মচ্ছেন্দ্রী”, “লাকাহার”, “কানিশা” ইত্যাদি নামে পরিচিত আছেন তাহার নাথ-পন্থেরই পথিক। বাংলাদেশে নাথ-পন্থী সাধুরা এখন শৈবসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, পৃথ্বেশ্বরী একটি পৃথক্ জাতি বলিয়া পরিগণিত আছে।

নাথ-পন্থের উৎপত্তি ও বিকাশ যে বাংলা-কেন্দ্রিক পূর্বভারতে ঘটিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। ইহার প্রাচীন সাহিত্য বাংলাতেই পাওয়া যায় এবং তাহারই মধ্যে ইহার প্রাচীনতর রূপটি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। বাংলাদেশের বাহিরের যোগী সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যের ধারা যে বাংলাদেশ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল তাহারও প্রমাণ অবিরল নয়। তবু একথা বলা চলে না নাথ-ধর্ম বাংলা দেশেরই নিজস্ব জিনিস। বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন জাতির ভাব ও সাধনার ধারা মিলিত হইয়া বাংলাদেশে যে বিশিষ্ট ধর্মমতের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহারই এক অংশের প্রকাশ নাথ-পন্থে। বিভিন্ন দিগ্দেশ হইতে আগত এইরূপ যোগ-সাধনার ধারার ইকিত পাইতেছি গোখ-বিজয়ে :

হাড়িকা পূর্বেতে গেল দক্ষিণে-কানকাই

পশ্চিমেতে গোখ গেল উত্তরে বীনাই।

হাড়িপাথর কর্মক্ষেত্র পট্টকের আধুনিক উত্তর ত্রিপুরার অন্তর্গত। দক্ষিণে কাছপাথর প্রচেষ্টার কোন কিংবদন্তী বা কাহিনী রক্ষিত হয় নাই। তবে তিব্বত জনশ্রুতিতে বলে যে একজন সিদ্ধাচার্য কাছপাথর ছিলেন দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের কিংবা উড়িষ্যার লোক। গোৰ্খ-বিজয়ে কানফার সম্পর্কে যে ডাঙ্কার নগর ও তথাকার বহুদীর উল্লেখ আছে তাহার প্রতিধ্বনি শুনি মনসার পুরানো ছড়ায়—“ডাঙ্কার বোড়ী তারা ঘটে পানি ভরে।” দক্ষিণ রাঢ়ে বর্ধমান-বীহড়ী সীমান্তে “ডাউকো” গ্রাম হয়ত এই কিংবদন্তীর সঙ্গে অসংস্পৃক্ত নয়। গোৰ্খনাথের প্রভাব প্রধানতঃ পশ্চিমেই সীমাবদ্ধ। তাহার প্রমাণ পশ্চিম ভারতে গোরখ-পন্থীদের বাহুল্য। গোরখপুর শহর ও গোৰ্খা জাতি ইহারই স্মৃতি বহন করিতেছে। মীননাথ মংলোজ্ঞনাথের বিলাসক্ষেত্র কমলীরাজ্যের কল্পনা বোধ করি হিমালয়-পাদভূমি-আশ্রিত কোন প্রাচীন ভোট-মোক্ষল গল্পকাহিনী অবলম্বনে উদ্ভূত হইয়াছিল।<sup>১</sup> এখনও এই দেবারিত আদি বোগী-সিদ্ধের পূজা উত্তরে নেপাল রাজ্যেই প্রচলিত। নেপালের অন্ততর প্রধান পূজা-উৎসব হইতেছে মংলোজ্ঞনাথের রথযাত্রা।

নাথ-পন্থ শৈব-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। নাথযোগীদের মতে শিবও একজন সিদ্ধ যোগী। তিনিও মীননাথ-গোৰ্খনাথ-হাড়িপাথর কাছপাথর মতই ধর্ম-নিরঞ্জন পুত্র। তবে তিনি যোগী সিদ্ধদের অগ্রজ গুরু, এবং মীননাথ ও হাড়িপাথর তাহার অহুজ অহুচর।

আম্বে গুরু মহাদেব শিছে আর সব

সাধন্ত সকল সিধা তরিবারে ভব।

এবং

শিবের ডাহিনে বামে হাড়িকা মীনাই

পৃষ্ঠভাগে গোদী আছে জগতের মাই।

নাথ-পন্থ নিরীশ্বর। সৃষ্টিকর্তা ধর্ম-নিরঞ্জন জগৎসৃষ্টির সূত্রপাত করিয়াই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। সূত্রাং আদিনাথ ধর্ম-নিরঞ্জন ঠাকুরের সঙ্গে নাথপন্থী যোগ-সাধনার কোন সাফাৎ সম্পর্ক নাই।

১ কমলী রাজ্য হইতেছে শ্রীরাজ, আধুনিক মণিপুর ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল। কল্পনের মতে কান্দীরাজ্য ললিতাদিত্য প্রাগজ্যোতিষপুরের শ্রীরাজ জয় করিয়া সেখানে বৃষ্টি চুষক পাথরের বাথখানে অনেকদিন ললিতসুখি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

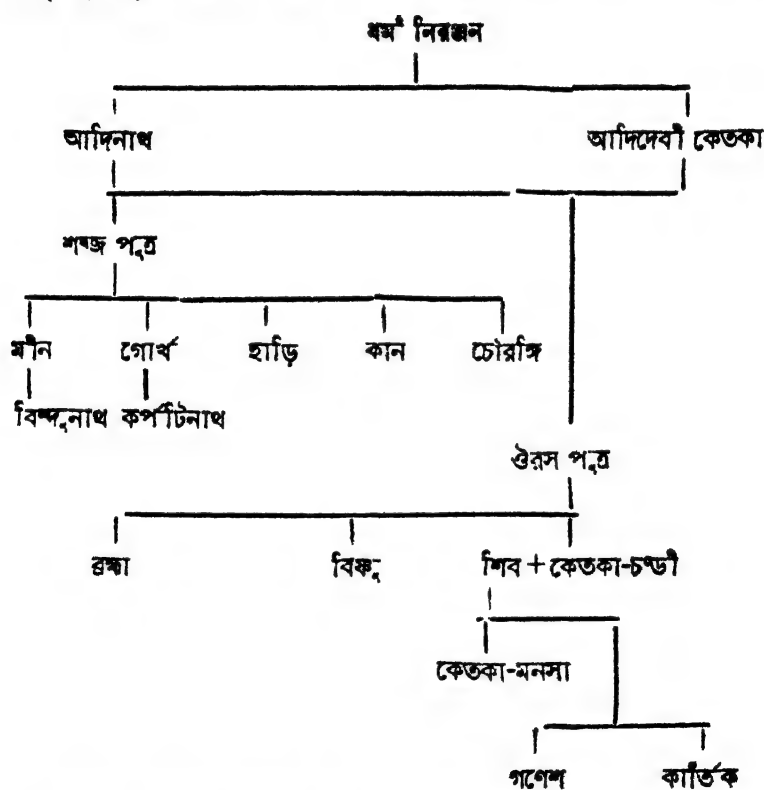


ধর্মমঙ্গল-শৃঙ্গারের ধর্মঠাকুর আর নাথ-ঐতিহ্যের নিরঞ্জন-আদিনিাথ অভিন্ন। ধর্মঠাকুরের পুরাণ-কথা আর নিরঞ্জনের সৃষ্টি-বর্ণনা একই। এই কাহিনীর জড় গিয়া পৌঁছায় একটিকে অঙ্গবেষের নাসদায় স্তম্ভে অপরদিকে পলিনেশীর জনপ্রতিভে। ইহার মূলে ভারতবর্ষের বাহির হইতে আগত কোন অনাথ জাতির ঐতিহ্য কল্পনা করিলে এই দুই ধারার ঐক্য হয়। ধর্ম-নিরঞ্জনের “আত্মকথা” সংক্ষেপে বলি।

জগৎসৃষ্টির পূর্বে বিশ্বের অবস্থা ছিল অবাচ্চ, কিছু ছিল এবং ছিল না— এই ভাব, “নাসদাসীৎ ন সনাসীৎ তদানীম্” এবং “অন্ধকার মধ্যে সকলি ধূস্রকার”, “তম আসীৎ তমসা গৃঢ়মগ্রে”। সেই ধূস্রকার মধ্যে সৃষ্টির সাড়া জাগিল, অবাচ্চে উঠিল বিপরীতমুখী দুই ঢেউ— “আদি ধনাদিরূপে কৈল নিরোক্ষণ”, “যথা অথস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ”। শূন্নে উঠিল বৃন্দবৃন্দ-ব্রহ্মাণ্ড। সেই অন্তে তাপ গিলেন নিরঞ্জন আদিনিাথ— “ভাবের অনলে ধর্ম ঘষিত তখন”, “তপসন্তন্ মহিনাজারৈতকম্”, এবং অন্তর্ভেদ করিয়া বাহির হইলেন নিরঞ্জন-অনাধিনিাথ আদিনিাথ রূপে। নিরঞ্জনের তপের তাপের ঘর্ম হইতে জন্ম হইল আদিশিব কেতকার (যাঁহার নামাস্তর মনসা)। তপোনিরত আদিশিব কেতকাকে স্মরণ করিয়া কামপ্রেরণা অম্লভব করিলেন— “মনসো রেতঃ প্রথমং যদানীৎ”। তাঁহার বীর্ষ পান করিয়া কেতকা হইলেন অন্তর্বর্তী এবং প্রসব করিলেন তিন পুত্র। ব্রহ্মা নির্গত হইলেন মুখ হইতে, বিষ্ণু বাহির হইলেন ললাট ভেদ করিয়া, আর শিব ভূমিষ্ঠ হইলেন ঘোনিপথে। জন্মিয়াই তিন ভাই পিতার লঙ্কানে বাহির হইয়া তাঁহার দেখা না পাইয়া তপস্যায় বসিয়া গেলেন বল্লকা নদীর ঘাটে। কিছুকাল পরে আদিনিাথ চাহিলেন পুত্রদের বোগাতার পরীক্ষা করিতে। গলিত শবের রূপ লইয়া তিনি নদীস্রোত বাহিয়া আসিলেন সেই ঘাটে যেখানে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব তিন ভাই তপোমগ্ন। জলে শবের পুতিগন্ধ দূর হইতে পাইয়াই ব্রহ্মা আসন ছাড়িয়া পলাইলেন। বিষ্ণুর কাছে আসিলে তিনি জল ঠেলিয়া দূরে সরাইয়া দিলেন। শিবের নিকটে আসিতেই তিনি বুদ্ধিতে পারিলেন পিতার যত্নমেহ বলিয়া। আদিনিাথ বুঝিলেন যে পুত্রদের মধ্যে শিবই পরমজ্ঞানী। ভাই দুইজনকে ডাকিয়া শিব বলিলেন পিতার শব সংকার করিতে। শিবের জাহ্নব উপর অনাধিনিাথের শব হাছ করা হইল। ব্রহ্মা হইলেন অঘি, বিষ্ণু হইলেন কাঠ। বহুমান শবের নাড়ি হইতে উদ্ধৃত হইলেন মীননাথ, ললাট (মতান্তরে জটা) হইতে

বাহির হইলেন গোৰ্ণনাথ, হাড় হইতে জন্মিলেন হাড়িপা, কান হইতে নির্গত হইলেন কানপা, এবং চরণ হইতে উঠিলেন চৌরঙ্গিনাথ। এইভাবে অন্যদির শব্দ হইতে পাঁচ আদি সিদ্ধার জন্ম হইল। তাহার পর বিদেহী নিরঞ্জনের ইচ্ছিতে শিব কেতককে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। অম্বাস্তরিত কেতকার নাম হইল গৌরী (চণ্ডী)।

ধর্ম-নিরঞ্জনের এই আন্তরিকতার যে পুরানো বাঙালা সাহিত্যের উপজীবা কয়েকটি বিশিষ্ট কাহিনীর প্রধান দেবদেবী-ভূমিকার জড় পৌছাইতেছে তাহা নিচে ছকে দেখানো গেল :



উপরে কথিত সৃষ্টিকাহিনীর পর হইতে ধর্মঠাকুরের কাহিনী এবং নাথ-পন্থের উপাখ্যান পৃথক পথ ধরিত্তাছে। ধর্ম-কাহিনীর বিষয় হইয়াছে ধর্ম-পূজার পূজা-অন্তর্ধান বর্ণনা ও ধর্মঠাকুরের বরপুত্র লাউসেনের কাহিনী, নাথ-কাহিনীতে বিবৃত হইয়াছে নাথ-সিদ্ধদেব বৃত্তান্ত। এই বৃত্তান্তের অনুলসরণ করি।

গৌরীকে লইয়া শিব গৃহস্থালি পাতিলেন, মীননাথ ও হাড়িপা তাঁহার:

প্রধান পার্শ্বচর হইলেন। শিঙ দুইজনের সেবক হইলেন যথাক্রমে গোবিন্দনাথ ও কাছপা। একলা গৌরীর বাসনা হইল শিবের কাছে “মহাজ্ঞান” লাভ করিতে। গৌরীকে লইয়া শিব গেলেন সমুদ্রের উপরে জলটুকিতে, যেখানে কোন ভৃত্যীয় ব্যক্তি মহাজ্ঞান-কথা শুনিতে পাইবে না। মীননাথের কাছে ইহা অগোচর রহিল না। তিনি বোয়াল মাছ লইয়া জলটুকীর তলায় রহিলেন এবং মহাজ্ঞান-সংকেত জানিয়া লইলেন। গৌরী ত্রীলোক, তাঁহাকে মহাজ্ঞান যেতারা বিবেচনার কাজ হইবে না বলিয়া নিরঞ্জন তাঁহার উপর নিত্রাবেগ দিয়াছিলেন, মীননাথ গৌরীর হইয়া “হঁ হঁ” করিয়া বাইতেছিলেন, তাহাতে শিব বুঝিতে পারেন নাই যে গৌরী নিমিত্ত। দ্বিজ লক্ষণের অনিলপুরাণে এই কাহিনীর বিস্তার-বর্ণনা আছে। তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :

কর জোড় করিয়া উল্লুক করি নিবেদন  
সৃষ্টিনাগ করিল শিব এ তিন ভুবন।  
যতেক জ্ঞান-কথা শিব দুর্গাকে কহিব  
সকল সংসার দুর্গা অমর করিব।  
উল্লুকের সংহতি ধর্ম যুক্তি করিয়া  
মায়ানিত্রা দুর্গার গায়ে দিল পেলাইয়া।  
নিত্রায় বিহ্বল দুর্গা হৈল অচেতন  
জ্ঞান-হকার জোগায় মীননন্দন।  
যুবক শিথিলে যোগ পালটিয়া বৈসে  
বুড় শিথিলে যোগ আসে কি না আসে।  
দেবীকে বলেন শিব যোগ-ব্রত জানি  
বাহিরের পবন ভিতরে ধরো আনি।  
টানিতে টানিতে কায় সশর ফোটে  
সহজে গত প্রাণ জিন ( ৭ ) কত টোটে।  
একগোটা আইল হাড়ি দশগোটা মুণ্ড  
ভদ্রকথা শুনিতে গৌরী পালটিয়া উঠ।  
সকল কথা মিছা গৌরী জ্ঞান-কথা মীচা  
শুনিঞা পরম সত্য পাকা চুল হৈল কাঁচা।  
না বুঝিল নটকি রবি আর শশী  
আহার কারণে শিঙ গলে নাই বসি।

আম্বে অনাঙ্কের ধন নারী ভরষ

তবে কেন শুক গোঁসাঞ্ঝি মরণ কেন হয় ।<sup>২</sup>

বার বৃদ্ধকালে না হইল জীবন উপায়

ভাঙ্গুর জানে ভাব না স্থজিল ( ১ ) কায় ।

অকুল যে হইল কি বলিব তার

তথির কারণে হংস উড়্য। উড়্য। যায় ।<sup>৩</sup>

উড়্য। যায় পরমহংস নাই যায় দূর

উড়িয়া ঘুরিয়া যায় নিরঞ্জনপুর ।

এড়িলে সে রহে গৌরী পেড়িলে সে বহে

মন পবন তারা পরিচয় নহে ।

সন্ডে গেল গৌরী বিসন্ডের পাশ

সন্ড বিসন্ড লইয়া একই ঘরে বাস ।

শিবের উদরে গৌরী স্থখে নিজা যায়

মংসের পেটে মীননাথ হকার ষোগায় ।...

বোল শত কোন নাথ পথালয়ে ধুবি

ধুবিতে কাপড় কাচেন আর যত যুগী ।

শক্তি কুড়ারি লয়া বাশী গেল ঝাড়ে

মায়ালাতা কাটিয়া করিল ছারে পারে ।

ছারে আর খারে তুলিয়া দিল জাল

অহনিশি ফোটে জাল বৈশে যত কাল ।

অস্ত্র ধুবি কাপড় কাচে চোন আর বানী

গোন্ধুবি কাপড় কাচে ঘেন কাচা সোন ।<sup>৪</sup>

চান্দাই খোটা হৈল যার স্জাই হৈল পাট

ধুবিতে কাপড় কাচে মনা নদীর ঘাট ।

খুটি বুড়িয়া গেল পাট পাট রহিয়া ভালে

মনা নদী পার হৈয়া ধুবি ভাল হাসে ।

২ এট ধরনের ছন্দ স্পষ্টতই গুরু শব্দের প্রয়োগে স্তম্ভ হইতে লগ্নয়ঃ হইয়াছে। গৌরী জাগিয়া  
নাই, স্তম্ভয়ঃ ইহা গৌরীর প্রসঙ্গ হইতে পারে না।

৩ এইখানে গোপনঃশের প্রযুক্ত প্রকাশ পাওয়াইছে।

মকম্বা লক্ষীর্ণ নালে ধরিছে উজান  
 অক্ষয় অমর দেখ পদ নির্বাণ ।  
 নিত্য নিত্য আসে চোরা ধন হরিবারে  
 জ্ঞান থাকিতে তারে নারে লক্ষ্যবারে ।  
 পাটি নাই শিলা নাই ঘাটে ঘাটে পিই  
 মুখানি পুণিয়ার চন্দ্র যুগে যুগে জীই ।  
 শনি মঙ্গলবার বড় পুণ্য স্নান  
 গিনি তৈলে জলে বাতি দেখ বিজ্ঞমান ।  
 ধর্মের চরণে পণ্ডিত রামে<sup>৪</sup> গায়  
 অনিলপুরাণ কথা শুন ধর্মরায় ।

গুরু কার বোলে কে না পাতিয়ায়  
 পুতকি হৃদয়ে সমুদ্র উথলিল  
 পর্বত ভাসিয়া যায় ।  
 আগের পাছের নৌকা বুড়া গেল  
 মধ্য নৌকায় উড়িল ধূলি  
 সরিষা বুড়িতে জল [ বিন্দু ] নাঞি  
 বুড়া গেল দেউলের চূড়া ।  
 হস্তীর গায়ে দু বীর সংগ্রাম  
 মেদিনী করে তোলপাড়  
 গাত্তরের উদরে জ্বী-পুরুষ বেশ  
 বোঝ এ আগমবিচার ।  
 মধ্য সমুদ্রে নৌকা রাখিছ  
 কাঁকড়া ধরিল কাছি  
 মশার লাথিতে দেউল ভাঙিল  
 পিপীড়ার মনে হাসি ।

<sup>৪</sup> কবি লক্ষ্মণ প্রায়ই রামকে পণ্ডিতের গমের আড়ালে অস্বগোপন করিয়াছেন । বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড ( দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৭৪ : স্রষ্টব্য ) ।

আমের কাছে      আম কলিল  
 তার কেনতে ( ? ) ভরিল ডাল  
 অন্ন বয়সে      নেবু গাছি কপি  
 সে যেন কলে কাঠাল ।  
 দূবার ডালে      ঘুঘু বাল্য  
 তার কেন কাকের ছা  
 পক্ষ পক্ষ তারে      আহা হা যোগায়  
 সে ডাকে সরেস রা ।  
 গাই বুড়াইল      বলদ বিয়াইল  
 চিহ্নিতা ঘন দেয় শুন  
 আকাট বাকার      পুত্র হইয়াছে  
 সে খাতো চায় পায়রার দুধ ।  
 ব্যাঘ্রের দুগধে      আউটিতে চাহিল  
 বি-াই বসিল তার আসে  
 লকুনি দুগধে      লাকড়ি স্বধিল  
 বিলাই পালায় তরাসে ।  
 মধ্য-সমুদ্রে      দুয়াড়ি আড়িহু  
 শালিকি পড়য়ে আঁকে কাঁকে  
 মৎস্ত বলিয়া      দোয়াড়ি গুণিতে বাই  
 হরিণী পালায় লাফে লাফে ।  
 বাঘে বলদে      হালখানি জুড়িলাও  
 মন পবন তাহার কৃষাণ  
 পাণির কুস্তীরে      ছড়া কাড়িয়া খান  
 মৃষায়ে বুনিঞা খান খান ।  
 মশার হাড়ে      কুড়াখানি দিল  
 কুমেরলক্ষের খর ছায়  
 বস্ত্রিকার পুত্র      খড় তুলিয়া দেন  
 আকলা গড়ি চিয়ায় ।  
 তালের কাছে      গালের পোনা  
 সয়চানে ধরি ধরি খায়

পর্বত শিখরে পাণি উজাইল  
 চৌরঙ্গি পলুই লম্বা ধার ।  
 বিশ্বের ভিতরে লোহার কার  
 নয় নয় পুণ্ডলা পাণি  
 অকুল সমুদ্রে নৌকায় দুকাইল  
 বোঝ পণ্ডিত আগমের বাণী ॥

পুষ্প পাইয়া ভ্রমর মধুভোলা  
 মন্ত্র নাঞি চেনে বক জল কৈল ঘোলা ।  
 চারি চৌদ্দ ভুবন চোরা করে চুরি  
 এমন শক্তি নাঞি চোরারে ভাড়া ধরি ।  
 মক্কা সতীর্ণ নালে ধরিছে উজান  
 অকস্ম অমর দেখ পদ নির্বাণ ।  
 ঘটের জীবন নিরঞ্জন মহাশয়  
 ঘটে ধরি নিরঞ্জন আছেন সর্বধার ।  
 জাগিয়া যুভতি দেখ যথা যুগী ভাগে  
 জাগিলে যমের দূত ঝট নাঞি লাগে ।  
 ঐক্সা ভুঞা নিকট নছে [ কড় ] দূর,  
 ঐক্সারে সেবিলে পুতা রহে ভরিপূর ।...

শিবের ব্যাখ্যান শেষ হইতেই গৌরীর তজ্জাবেগ ছুটিয়া গেল। তিনি শিবকে বলিলেন, মহাজ্ঞান বল শুনি। শিব মীননাথের চাতুরি বৃত্তিতে পারিয়া তখন শাপ দিলেন, “এককালে হউক বিশ্বরূপ”।

গৌরী গঙ্গা দুই পত্নী লইয়া শিব ঘর করিতেছেন আর তাঁহার অমৃতভক্ত সিদ্ধগণ গৃহবাসহীন হইয়া রহিয়াছেন ইহা গৌরীর ভাল লাগিল না। শিবকে একথা বলায় তিনি বলিলেন, উহার। সিদ্ধ, কাম ক্রোধ মোহ অতীত। গৌরী বলিলেন, তোমার আজ্ঞা হইলে আমি তাহাদের মন কটাক্ষে হরণ করিতে পারি। শিব বলিলেন, চেষ্টা করিয়া দেখ। গৌরী ঘোহিনী মায়া বিস্তার করিলেন। তাহাতে সব সিদ্ধই ভুলিলেন, গোর্ধনাথ

ছাড়। বোসজুটে প্রথমে দুই নিম্ন দেবীর পাশে ( বা ঘরে ) বসনোত্তাপ করিতে চলিলেন দুই দেশে। যীননাথ গেলেন কদলী—কামরূপে নারী-রাজ্যের রাম হইয়া। হাড়িপা গেলেন পাটিকা ( প্রাচীন পটিকের ) তুরনে নিম্নভাষিনী রানী ময়নামতীর বোড়াশালার হাড়ি-ঝাড়ুদারের কাছ করিতে। পৌরী ও শিব কৈলাসে রহিয়া গেলেন। গোৰ্ণনাথ ও কাছপা স্বতন্ত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন। শিব গোৰ্ণনাথকে তপস্বিনী পত্নীলাভের বর দিয়াছিলেন। শিবের বাস্তু বার্ষ হইবার নয়। এক তাপসী রাজকন্যা গোৰ্ণকে পতিত্বে বরণ করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন। গোৰ্ণনাথ পত্নীকে পুত্র বর দিয়া পলায়ন করিলেন। গোৰ্ণনাথের কৌশীন-খোয়া জল পান করিয়া রাজকন্যা গর্ভবতী হইয়াছিলেন বলিয়া পুত্রের নাম হইল কপটিনাথ। একদিন হঠাৎ গোৰ্ণনাথ-কাছপার সাক্ষাৎ হইল এবং দুইজনের মধ্যে ঝগড়া বাধিল। অবশেষে পরম্পরের গুরু লইয়া টানাটানি পড়িলে গোৰ্ণনাথ বলিলেন—

তোমার গুরু হাড়িপা বাউল আলমদার  
তলহরে করিল বজের অধিকারী।  
একে সে বজের রাজা বড়ই দুর্বীর  
তলহরে রাখিল তারে নাহিক নিস্তার।  
সেই সে পরম বোণী জগতে বাখানি  
অচ্ছেদ অন্তে কায় না দেখি বোণিনী।  
দেখিতে না দেখি তারে নিম্ন কলেবর  
পরমজ্ঞানে আছে সেই তলহর ভিতর।  
গুরুর বঞ্চন কদলীতে সীসের রক্ত নাই  
নিম্না কাছপা [ তুমি ] নহিবে চিরাই।\*

কাছপা উত্তর দিলেন—

তোমার গুরু যীননাথ তার কথা শুন  
হাড়ি গোপ পাখিল তার কিছু নাঞি শুণ।...

ঝগড়া মিটাইয়া দুইজনে নিজ নিজ গুরুর উদ্ভারে চলিলেন। গোৰ্ণনাথ গেলেন কদলীতে, সে কাছিনী গোৰ্ণ-বিজয়ের বিঘর। কাছপা চলিলেন পাটিকার, সে ব্যাপার ময়নামতী গোবিন্দচন্দ্রের কাছিনীতে বর্ণিত হইয়াছে।

\* বিজ জগন্নাথের অঙ্গিন পূজা।



এই দুই নাথ-কাহিনীর এবং কাণ্ড-হানীর শিকারী নিছ কাহিনীর মধ্যে যেটুকু সাধারণ বস্তু আছে তাহাতেই নাথনিছ সাহিত্যের পত্তন। ইহা হইতেছে শিব কর্তৃক শক্তিকে (মূল কাহিনী) মহাজ্ঞান উপদেশ, এবং শিবা কর্তৃক গুরুকে (গোবর্ধ বিজয়) ও মাতা কর্তৃক পুত্রকে (ময়নামতী গোবিন্দচন্দ্র কাহিনী) জ্ঞান উপদেশ দিয়া চৈতন্য উৎপাদন ও বৈরাগ্য প্রবর্তন। এই যে বিপরীত বৃত্তি—নিছ গুরুকে শিবা শিখাইতেছে এবং রাজা-রানী-পুত্রকে মাতা সন্তান লগ্নাইতেছেন—ইহাই নাথ-নিছ কাহিনীকে মহিমাযুক্ত করিয়াছে। বস্তুতঃ সমগ্র পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন মহনীর কাহিনী আর নাই। এবং বিংশ সাহিত্যের ইতিহাসেও ইহা অদ্বিতীয় বলিয়া মনে করি। গল্প-রসের পাটভার অল্প ময়নামতী গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনী প্রায় সমস্ত প্রাদেশিক আর্থ ভাবের রূপান্তরিত হইয়াছে। গোরখপন্থী বোগী গায়কেরা—বাঁহারা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে, পাণ্ডাবে ও রাজপুতনার “নারদীহার” নাম পাইয়াছেন—বাঙ্গালা প্রান্তের এই কাহিনীটি দেশে বিদেশে ছড়াইয়া দিয়াছেন। তবে বাঙ্গালার বাইরে প্রচলিত কাহিনীতে কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্তন হইয়াছে। গোপীচন্দ্রের ভগিনী চন্দ্রার ও মাতুল ভট্টহরির ভূমিকা বাঙ্গালীর বাহিরে পরিষ্করিত।

ময়নামতী গোবিন্দচন্দ্রের প্রয়োত্তরের নমুনা দিতেছি তুলত মল্লিকের গাথা হইতে। জালন্ধরির কাছে বোগী-দীক্ষা লইয়া রাজা গোবিন্দচন্দ্র ভিকার বাহির হইয়াছেন। মাতা ময়নামতীর কাছে ভিকার বাগিতে আলিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—

কে তোমার আভ-গুরু কার ভূমি চেল।  
এ নব-বঁাধনে কেন বিজুতি মাখিল।  
গন্ধদৌরত বোগী কোথা গেলে পার  
নিত্রা হইলে প্রাণ পুরুষ কোন [ত্রব্য] খার।  
বুকের কর পত্র বসিবে কর ধার।  
নদীতে কতেক বালি আকাশে কত তার।  
জল স্থল পবন বরুণ দিবা রাত্রি  
চন্দ্র সূর্য দেবতা সবাই থাকে কথি।  
কোথায় উৎপত্তি হৈলা পৃথিবী লংগার  
কোথায় রহিল পুন কহ সমাচার।

মরণের কিবা হেতু জীবন কিরূপ  
ইহার উত্তর বোনী কহিবে স্বরূপ ॥  
একই উদরে জন্ম সমতুল নয়  
জগৎ-সংসার কেনে একবর্ণ হয় ।  
কাটিলে জীবন হয় না কাটিলে মরে  
কি আহার করে শিশু জননী-উদরে ।  
নদ নদী কন্ধর কেন ডাটি-উজানি  
হাট ঘাট কেন কোথা সাগর জিবেদী ।

গোবিন্দচন্দ্র উত্তর দিলেন—

আত্ম-গুরু জন্মদাতা সিদ্ধা-গুরু মা  
জান গুরু আলঙ্কারি সিদ্ধা হাড়িপা ।  
এ নব-বৌদন মোর জুরারের পানি  
জীবন সকল মিথ্যা তব কায়াখানি ।  
গঙ্গাসৌরভ বন্ত নানিকাতে পার  
নিজা হৈলে প্রাণ পুরুষ শূন্যধরে বার ।  
বৃক্ষেব এক পত্র বরিষে এক ধারা  
এক বালি নদীতে আকাশে এক তারা ।  
আগনি জল স্থল আগনি আকাশ  
আগনি চন্দ্র সূর্য জগৎ প্রকাশ ।  
মিবা নিশি অরণ-বরুণ-কোথা আর  
প্রলয় সংসার দেখ তব আপনার ।  
মরণ সদাই মৃত্যু জীবনে কি আশা  
পরান-পুতলির হয় হাড়ে চর্মে বাসা ।  
একই উদরে জন্ম নানা-বর্ণে হয়  
স্থল নাড়ি কবল পদ্ম সব ঘটে হয় ।  
কাটিলে জীবন পার না কাটিলে মরে  
আগনি বৃক্কে ভেদ আগনি শরীরে ।  
জননী অঁঠরে বন্দী স্থিতি দশ মান  
পবন আহার শিশু-শরীর প্রকাশ ।

মণ্ডবোপা নন্দ-নদী ছাটি আর উজানি

তখন হাট বাট সাগর জিকেনী ।

বোঙ্গী-লিঙ্গের ইতিহাস অনেক দিনের । চৌরাণী লিঙ্গের উল্লেখ রহিয়াছে  
ক্যোড়িয়ারের বর্ণনরত্নাকরে ( চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ) । চৌবটি  
বোঙ্গিনীর চৌবটির মত চৌরাণী লিঙ্গের চৌরাণীও সাংকেতিক সংখ্যামাত্র ।  
ষাণশ-জ্যোতিষ শতাব্দীতে পকাশ বোঙ্গী-লিঙ্গের ও পরজিণ জ্ঞান-ভাঙ্কিনীর  
( অর্থাৎ লিঙ্গ-বোঙ্গিনীর ) কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল । রাউত মুসিংহ রত্ন  
'পকাশলিঙ্গাবদান' ও 'পকজিণজ্ঞানভাঙ্কিবদান' রচনা করিয়াছিলেন এবং  
বোঙ্গীদের সাধনগীতি লঙ্ঘন করিয়াছিলেন । এই নিবন্ধগুলির এখন শুধু  
ভিক্তভী অল্পবাদ বর্তমান আছে ।

গোখনাথ ছাড়া আরি লিঙ্গ-বোঙ্গীদের নামগুলির ঐতিহাসিকতার  
সন্দেহের কারণ নাই, বোঙ্গী-লিঙ্গ কবি মীননাথের স্মৃতি চতুর্থ শতাব্দী অবধি  
নিশ্চয়ই চলিয়া আসিয়াছিল ।<sup>৬</sup> চর্বাণীতিকোবে টীকাকার মুনিদত্ত মীননাথের  
লেখা 'পরদর্শন' নিবন্ধ ( ? ) হইতে এই চারি ছত্র ছড়া উদ্ধৃত করিয়াছেন—

কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট

কর্ম-কুরঙ্গ-সমাধি-কপাট ।

কমল বিকসিল কহিহ ন ছমরা

কমল-বধু পিবিবি ধোকে ন তমরা ।<sup>৭</sup>

শেষ দুই ছত্রের অশ্রান্ত প্রতিধ্বনি অনিতেছি লক্ষ্যের অনিলপুরাণে মীননাথ-  
ঋত হরগৌরীর তত্ত্বসংবাদে—

পুষ্প পাইয়া ভ্রমর বধু ভোণ ।

মৎস্য নাহি চেনে বক জল কৈল ঘোলা ।

মীননাথের সাধু নামান্তর মৎস্যজ্ঞ, তাহাতে আবার নাথ বোগ করিয়া হইল  
মৎস্যোক্তনাথ । বাঙ্গালার বাহিরে এই নামই বেশি প্রচলিত । মোছলমেরে

৬ মীননাথের নামে একটি ছোট কামরাস্তর বই ( নাম স্মরণীয়ক ) পাওয়া গিয়াছে ।  
মীননাথের কবলীরাজ্য ভোগ-কাহিনী হইতেই যেন হয় এই আদি-লিঙ্গকে স্মরণভক্তত্বের কম্পনা  
করা হইয়াছিল । নিবন্ধটি মীননাথের রচনা না হওয়াই সম্ভব ।

৭ অর্থাৎ—মদ্যে কহিতেছেন পরমার্থের বর্ষ—বাহ্য কর্ম-কুরঙ্গের সমাধির কপাট ।  
বিকসিত কমলের খবর শামকের কাছে পাওয়া যায় না, কিন্তু কমল-কদম্ব পান করিতে প্রমত্ত  
ধর্মীর পক্ষে না ।

( বা বোচন্দর ) মৎস্যজ্ঞের বিকৃত রূপ, কি মৎস্যজ্ঞ মোহনদের সংকৃত রূপ তাহা বলা শক্ত। মোহনর মূলত অনাথ ভাবার শব্দ বা নাম হইতে পারে, তাহা হইলে “মৎস্যজ্ঞ” ইহারই সংকৃত্যারিত রূপ হইবে। পরিচিত “মহম্মদি” ও “মোচরা” পীর মোহনদেরই আধুনিক রূপান্তর। নেপালে এবং অনার মীননাথ “মচ্ছর” নামেও প্রসিদ্ধ আছেন। তিব্বতী কিংবদন্তীতে বলে যে মীননাথ কৈবর্ত ছিলেন। হিন্দী-রাজহানী ছড়াতেও পাই “গোরখ কেওটরা”। এদিকে হাড়িপার নামান্তর জালঙ্কারি। অতএব নাথ-সিদ্ধদের নাম হইতে জাতি নির্ণয় যুক্তিসাধ্য নয়। মীননাথ নাম এবং মাছের পেটে থাকিয়া ( বা মাছের রূপ ধরিয়া ) তাঁহার মহাজ্ঞান অবশ্য সম্ভবত কোন প্রাচীনতর মন্ত্রউপাস্তের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে। এই ইঙ্গিত পৌরাণিক মৎস্যাবতার কাহিনীর সঙ্গেও অসঙ্গত নয়। বিষ্ণু মৎস্যরূপ ধরিয়া সমুদ্র-গর্ভ হইতে বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন। মীননাথের মহাজ্ঞান লাভও একপ্রকার বেদ-উদ্ধার বলিতে হইবে।

হাড়িপার নামান্তর জালঙ্কারি। জালঙ্কারিপাদের লেখা একাধিক তান্ত্রিক যোগসাধনা নিবন্ধের তিব্বতী অনুবাদ মিলিয়াছে। “বেমন, ‘তদ্বিবজ্ঞ প্রলীপিকা’ ‘(হৈবজ্ঞতম্ভেরটিগ্ননী)’ ‘বজ্রযোগিনীসাধন,’ ‘শ্রীচক্রসম্বরগর্ভ-তত্ত্ববিধি’ এবং ‘হকারচিত্তবিন্দুভাবনাক্রম’। সবগুলি একই ব্যক্তির রচনা না হইতে পারে। জালঙ্কারি নামে একাধিক সিদ্ধাচার্য থাক। মোটেই অসম্ভব নয়।

জালঙ্কারি-পাদের শিষ্য কাহুপাদ বা কানপার লেখা কয়েকটি চর্চাগীতি ( হিন্দী মরমিয়া সাধক-কবিরের ভাবায় “করন্তী শব্দ” ) পাওয়া গিয়াছে। কাহুপাদের নামে যে অপভ্রংশ বোহাকোব এবং তান্ত্রিক-যোগসাধনাষট্টি নিবন্ধগুলি মিলিয়াছে তাহা ইহারই লেখা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবার হেতু নাই; কেননা এই নামে একাধিক সিদ্ধাচার্য বিদ্যমান ছিলেন। কাহুপাদের ভণিতায় বারোটি চর্চাগীতি মিলিয়াছে, তাহার মধ্যে অন্তত ছয়টিকে তান্ত্রিক বোদী-সিদ্ধ কানপার রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধা নাই। একটিতে “ওক জালঙ্কারি বোহাই রহিয়াছে—

সাধি করিব জালঙ্কারি পাঞ

পাখি ন-রাহস মোরি পাতি আচাঞ।

নাথ-পন্থের ঐতিহ্যে চৌরদিনাথ নামবাহ্যে পৰ্যবসিত। এক বোদী (বা তান্ত্রিক) আচার্য চৌরদিন লেখা 'বাহুতত্ত্ব ভাবনোপদেশ' নিবন্ধ মিলিতেছে তিব্বতী অক্ষরাদে। নাথ-নিবন্ধ চৌরদি বোধ হয় বন্ধ ছিলেন। তাই ধর্মের চরণ হইতে তাঁহার অঙ্ক করিত হইয়াছে "চৌরদী পলুই লগ্না ধার" সেই লাক্ষাই দিতেছে।<sup>৯</sup> গোষ্ঠবিজয়ের চণ্ডিচানাথ ও হিন্দী মরমিরা লাক্ষক-কবিদের উদ্ভিষ্ট চণ্ডিচানাথ বোধ করি একই ব্যক্তিকে নির্দেশ করিতেছে। চণ্ডিচ-পান্থের লেখা 'লোকেশ্বরস্তোত্র' ও চতুর্ভূতভাবাভিবাসনক্রম' নিবন্ধ দুইটির তিব্বতী অক্ষরাদ পাওয়া বাইতেছে। বাঙ্গালার নাথ-পন্থের ঐতিহ্যে কাণেরি-নাথের উল্লেখ নাই, বাঙ্গালার বাহিরে আছে। অপরূপে অথবা প্রাচীন লেখা কাণেরি-নীতিকার লক্ষান মিলিতেছে। তিব্বতী অক্ষরাদে আর্মমেবের নামেও 'কাণেরি-নীতিকা' আছে। চর্বাগীতিকোষে আর্মমেবের যে চর্বাগীতিটি রহিয়াছে তাহাতে নাথ-পন্থের নিশা ছল্কা নয়। কাণেরি-পান্ধ কি তবে আর্মমেবেরই নামান্তর?

গোষ্ঠবিজয়ে নিবন্ধ-পত্রিকা প্রসঙ্গে পাতুর<sup>১০</sup> নিবন্ধের উল্লেখ আছে, বাহাকে দেবী শপিয়াছিলেন, "সংমারে তজিব তুন্ধি দেখিরা জোরান"। মরনামতী-গোবিন্দচন্দ্র কাহিনীতে পাতুর (বা শিঙ-পা) হাড়িপার শিষ্যপুত্র। ইনিই কি বৌদ্ধ তান্ত্রিক আচার্য গর্ভপান বা গর্ভরি-পান্ধ বিনি (বা বাহার)। 'বজ্রবানমূল্যপতিটীকা' ও 'হেবল্লেকবৃত্তি' লিখিয়াছিলেন?

নাথ-পন্থের মূল-গুরু গোষ্ঠনাথের ঐতিহাসিকতার কোনই আভাস মিলিতেছে না। নামটি সম্ভবত কোন অনার্য ভাষার শব্দের সংস্কৃতান্বিত রূপ। আধুনিক কালে নামটির লোকব্যুৎপন্ন অর্থ প্রবল হইয়া বোগী গুরুকে গো-রক্ষক (বিশেষ করিয়া দুগ্ধবতী-পাতী-রক্ষক) দেবতার পরিণত করিয়াছে বাঙ্গালা দেশের কোন কোন অঞ্চলে।

সাহিত্যিক ঐতিহ্যে নাথ-পন্থের যে নিশা মিলিতেছে তাহাতে একাধিক বোগ ও তন্ত্র-সাধনার পুত্র প্রায় অবিলম্বেভাবে জট পাকাইয়া গিয়াছে। চারিজন আদি-সিদ্ধের কথা প্রথমে ধরা যাক। মীননাথ-গোষ্ঠনাথ এক দলে পড়েন, হাড়িপা-কানশা অন্য দলে। এই দুই দল যে মূলত দুই পৃথক

৯ পূর্বে প্রদত্ত। এইখানে চৌরদিনাথকেও কৈবর্তবৃত্তি অবলম্বন করিতে দেখি।

১০ সংস্কৃত "গর্ভ-রূপ" হইতে, অর্থ বালক শিশু।

সম্প্রদায় ছিল তাহার একাধিক প্রমাণ আছে। এক সম্প্রদায়ে নামের শেষে পাই “নাথ”, অপর সম্প্রদায়ে “পা” (পাথ)। মীননাথ-গোবর্ধনাথের সম্প্রদায় ছিল একান্তভাবে নারীসকলবিবর্জিত জ্ঞানাজিত যোগ-মার্গাবলম্বী। হাড়িপা-কানপার সম্প্রদায়ও যোগ-মার্গী ছিল কিন্তু তাহা পূরাপূরি জ্ঞানাজিত ছিল না, তাহাতে তাত্ত্বিক-সাধনা চলিত এবং নারী সাধিকার স্থানও ছিল প্রথমকে বলিতে পারি অবদূত-যোগী সম্প্রদায়, দ্বিতীয়কে কাপালিক-যোগী সম্প্রদায়। অবদূত-যোগী সম্প্রদায়ের সঙ্গে কাপালিক-যোগী সম্প্রদায়ের বৈপরীত্য এবং বিরোধ একটিই হইয়াছে বাঙ্গালা নাথ-পন্থ কাহিনীতে। মীন-চৈতন্য কাহিনীতে ছুই সম্প্রদায়ের বিরোধ দেখাইয়া শেষে অবদূত-যোগীরই প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে।

অবদূত যোগ-মার্গেও অটলতা ছিল। আগলে মীননাথের ও গোরক্ষনাথের সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু ভেদ ছিল। গোবর্ধনাথ ছিলেন সেই যোগী-গোষ্ঠীর আদিগুরু যাহাদের সাধনার মূল কথা বিম্বধারণ ও আত্মজ্ঞানলাভ। এই গোষ্ঠীর সাধনপথ ছিল কঠোর ব্রহ্মচর্যের এবং জ্ঞানযোগের। মীননাথের গোষ্ঠী মূলতঃ ছিল শৈব-সম্প্রদায়ের সহিত সম্পৃক্ত। মীননাথ শিবেরই প্রতিরূপ। পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে শিবের যে কৌচনী-শ্রীতি দেখি তাহা মীননাথের করলীমোহনকেই স্মরণ করায়। গোবর্ধ-গোষ্ঠী যখন মিলিয়া গেল মীন-গোষ্ঠীর সঙ্গে তখন মীন হইলেন গোবর্ধের গুরু। কিন্তু মূলগত বিরোধের চিহ্নটুকু একেবারে লুপ্ত হইল না, গুরুকে শিবের কাছে চৈতন্ত-উপদেশ লইতে হইল। জরী হইলেন শিষ্যই, গুরুর মর্বাদা বজায় রহিল শুধু শিবের স্বীকৃতিতে।

তাহার পর অবদূত-যোগী ও কাপালিক যোগী-সম্প্রদায় মিলিয়া গেল। এই মিলিত সম্প্রদায়ই নাথ-পন্থ। ইহার মূলতত্ত্ব হইতেছে বিম্বধারণ, দেহভক্তি, ভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডদর্শন এবং আত্মজ্ঞান লাভ দ্বারা কালজয়। যোগী-গুরুরা অবদূত-মার্গী সাধু হইলেন, কাপালিক-যোগী সাধকেরা ভিক্ষুক ও গৃহস্থে পরিণত হইল।

নাথ-পন্থে যোগ-সাধনার উদ্দেশ্য হইতেছে ‘নহজ’ অবস্থা প্রাপ্তি। নহজাবস্থা ভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডের পৃথকতার থাকে না, দেহ ও জগৎ এককর হইয়া যায় এবং যোগী ত্রিকালের অতীত হইয়া অজরজ অমরত্ব লাভ করেন। বীৰ উন্নয়ন, বাহু নিকট এবং চিত্ত নিজস্ব হইলেই হয় সমতাপোষ এবং তাহারই পরিণতি নহজাবস্থা—

মন খির তো বচন খির

পদন খির তো বিলু খির ।

বিলু খির তো কছ খির

বলে গোরখদেব লকন খির ॥১১

ব্রহ্মচর্যের উপর কোর ছিল লবচেরে বেশি । নাথ-পাছের ঐতিহ্যে ইহার পরিচর  
বহিরাছে পদে পদে, নারীর ও নারী-দেবতার নিন্দায় । গোখবিজয়ের  
উপক্রমণিকায় গোখনাথের জাতে গৌরীর লাহনার ইহার তীব্র অভিব্যক্তি ।  
লক্ষণের অনিলপুরাণে দেবীরের কুৎসার মুখর হইরাছে শান্তনু মুনি—

আনিল এখন তোর দুর্গা বড় সতী

বাহার সতীপনাএ পালায়া গেল খিতি ।

মন দিয়া শুনহ দুর্গার বেভার

বাহার উঠিল কলঙ্ক আইবড় ভাতার ।

চণ্ডী বড় সতী তোর চণ্ডী বড় সতী

বার সতীপনাএ পালাইয়া গেল খিতি ।

মন দিয়া শুন পক্ষা চণ্ডীর বেভার

তাহার উঠিল কলঙ্ক বাদিয়া ভাতার ।

বাসুলী বড় সতী তোর বাসুলী বড় সতী

বার সতীপনাএ পালাইয়াছে খিতি ।

মন দিয়া শোন সেই বাসুলী-ব্যবহার

তাহার উঠিল কলঙ্ক অহর ভাতার ।

মনসা বড় সতী তোর মনসা বড় সতী

বার সতীপনাএ পালাইয়া গেল খিতি ।

মন দিয়া শোন তাহার ব্যবহার

তাহার উঠিল কলঙ্ক পিতার ভাতার ।

সীতা বড় সতী তোর সীতা বড় সতী

তার সতীপনাএ পালায়া আছে খিতি ।

মন দিয়া শোন সেই সীতার বেভার

তাহার উঠিল কলঙ্ক রাবণ-ভাতার ।

কপিলা বড় নতী তোর কপিলা বড় নতী

তার নতীশনাথ পালায়। গেল খিতি।

মন দিয়া তুমি সেই কপিলার বেতার

এক কপিলার হৈল এক সত ভাতার।

নাথ-বোম্বের সাধারণ বেশচিহ্ন হইতেছে কানে কুণ্ডল এবং গলার নানাবিন্দু ধারণ। কুণ্ডল হইতে শাঁখের অথবা গড়ারশৃঙ্গের, নাথ হইতেছে নিরঞ্জন পদচিহ্ন অথবা অঙ্গুরণ কোন লাহনা। বিন্দু হইতেছে ককবর্ণ উর্দাভূজ বাহাতে নাম গীথা থাকিত। জটীতার বহন অথবা মস্তক-মুণ্ডন এবং অঙ্গে ভঙ্গলেনপন ছিল গোষ্ঠীগত রীতি। কাপালিক সম্প্রদায়ের বোগীরা নটবেশ ধারণ করতেন। তাঁহাদের পায়ে থাকিত নুপুর, হাতে ডমরু, গলার পুঁতির মালা। কাহ্নের একটি চর্চাপ্রতিভাতে এই বোগীবেশের উজ্জ্বল বর্ণনা আছে। ইহার অন্তর্বাদ দিতেছি—

কাপালিক বোগী কারু বাহির হইয়াছে বিচরণে,

সে মেহ-নগরীতে বিহার করিতেছে এই আকারে।

অ-বর্ণাদি (অর) ও ক-বর্ণাদি (ব্যঞ্জন) তাহার চরণে শ্রুতি-নুপুর,

রবি-শশীকে করা হইয়াছে কুন্তল-আভরণ,

রাগ ঘেব মোহ ছাই করিয়া মাথা হইয়াছে,

পরম যোক্ষকে নেওরা হইয়াছে মোতির মালা করিয়া।

শাউড়ী ননদ শ্রীলোকে ঘরে মারিয়া রাখিয়া

মারাকে (বা মাকে) হত্যা করিয়া কারু হইল কাপালিক।

নাথ-প্রহরীদের কাছে সব চেয়ে পবিত্র গাছ ছিল বকুল, যেমন এখন শৈশবের কাছে বেল।<sup>১২</sup> গোর্ধবিকরে দেখি যে গোর্ধনাথের সিদ্ধ-পীঠ হইতেছে বিজয়ানগরে বকুলতলা। ষিখ সম্প্রদায়ের অনিলপুরাণের মতে কমলীরাজ্যও বোধ হয় বকুল-পীঠ ছিল। গুরু-উদ্ধার উদ্দেশ্যে গোর্ধনাথ নর্তকীর রূপ ধারণ করিতেছেন—

১২ পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন প্রাচীন শিবপীঠ বেল গাছের কালে বকুলগাছ দেখা যায়। প্রাচীন নাথ-পন্থেরই সম্পর্ক বুঝনা করিতেছে। "সিদ্ধ-বকুল" নামটিতে যোগেশ-সিদ্ধের সঙ্গে বকুল গাছের সম্পর্কের স্মৃতি রহিয়া গিয়াছে।



দেহ-রূপজন গোক' দূরে তেরাগিরা  
 জীর রূপ ধরে গোক' যাত্রা ত পাতিরা ।  
 কাল ধল ধূশে কেশ আবোধিত করি  
 বিচিন্ন কানড় ছাঙ্গে বঙ্কিল কবরী ।  
 তাহে বেচি লক্ষ তরুণহরের মালা  
 মেঘগাঁজ মধ্যে বেন পড়িছে বিজলা ।  
 অম্বুলে অম্বুরি পরে কনক-অধিকা  
 পিঠে পাটযোগ দোলে নামে মধুরিকা ।  
 বিচিন্ন পাটের তুনি মেঘগদাজল  
 নানা চিত্র খোঁত তাহে দেখিতে উজ্জল ।  
 কপালেত লাজাইল দিয়া পজাবলি  
 এমন লিম্বুরের কোটা পরিলা স্তম্ভরী ।<sup>১০</sup>  
 লাজন করিয়া হৈল গোকের গমন  
 কদলী বকুলে<sup>১৩</sup> সিয়া দিল দ্বন্দ্বন ।  
 কদলী বকুলে<sup>১৩</sup> গুরু পদচিহ্ন পাইয়া  
 পার হৈল গোর্ধনাথ চামড়া বিছাইয়া ।

নাথ-যোগমতের শূদ্র অর্বাচীন বৈদিক যুগে গিয়া পৌছায় । নাথ-পন্থের  
 সৃষ্টি-বর্ণনার লগ্নে অগ্নেয়ের দশম মণ্ডলে সকলিত নামদীর শূক্তের মিল  
 দেখাইয়াছি । উপনিষদে নাথ-যোগমতের বিশিষ্ট রূপক হংসের (বা পরমহংসের)  
 উল্লেখ পাই । বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত যে তিনটি শ্লোকে “হিরণ্যঃ পুরুষঃ  
 একহংসঃ” উল্লিখিত হইয়াছেন<sup>১৪</sup> তাহাতে অর্বাচীন নাথ-পন্থেরও ধর্ম-পূজার  
 কোন কোন ছড়ার লগ্নে গভীর ঐক্য উপলব্ধি হয় । উক্ততিগুলি তুলনা করিলে  
 বোঝা যাইবে । উপনিষদ-নাথ-শ্লোক—

অগ্নেন শারীরমভিগ্রহত্যা  
 অমৃতঃ হৃদ্যানভিচাক্ষরীতি ।  
 তক্রমাদায় পুনঃপ্রতি স্থানং  
 হিরণ্যঃ পুরুষঃ একহংসঃ ।

<sup>১০</sup> “বকুল” এখানে “বাকুল” হইতেও পারে । দক্ষিণ রাঢ়ে বাকুল লক্ষ্যটি চলিত আছে,  
 অর্থ বাসভক্ষন ।

প্রাণেন বক্ষসবরং কুলারং

বহিঃকুলারাবৃত্তচরিতা ।

স উরতে অমৃতো বজ্রকাষং

হিরণ্ময়ঃ পুংসঃ একহংসঃ ।

অগ্ন্যন্ত উজ্জ্বলচমীরমানো

রূপাণি দেবঃ কুরুতে বহুনি ।

উত্তেব জ্বাতিঃ সহ মোহমানো

অকম্বতেবাণি ওয়ানি পতন্ত্ ।

ধর্ম-ঠাকুরের ছড়া—

ব্রাহ্মণ বড়ুরা নয় নিরঞ্জন রায়

দেখিতে দেখিতে হংস শূণ্যেতে লুকার ।

হংসাংসী দুইজনে আকাশের জুতি

হংস চলিয়া যায় দোহ প্রহর রাতি ।

অর্গেতে থাকিয়া হংস নাথিল মরতে

কৌতুকে যুগল তুলি কে পার দেখিতে ।

হংসাংসী দুইজনে আকাশেতে জুতি

হংস চলিয়া যায় তেজ প্রহর রাতি ।

এমনি অর্পূর্ব হংস নাই সমতুল

হংস ছিড়িয়া যায় কমলের ফুল ।

হংসাংসী দুইজনে আকাশেতে জুতি

হংস চলিয়া যায় নিশাতোর রাতি ।

নাথ-পঙ্কের ছড়া—

উড়্যা যায় পরমহংস নাই যায় দূর

উড়িয়া ঘুরিয়া বান নিরঞ্জন-পুর ।

তাত্ত্বিক মহাবান-পন্থী বৌদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ অনেক সিদ্ধাচার্যই ছিলেন নাথ-বোঙ্গপন্থী, এবং চর্চাসীতিকোষের সকল গানই যে তাত্ত্বিক বৌদ্ধ-সাধনার ইঙ্গিত বহন করিতেছে না সে কথা স্বীকার করিবার সময় হইয়াছে । কাকের কথা কিছু আগে বলিয়াছি । কাকের একটি গানের প্রথম দুই ছত্র ধর্ম-ঠাকুরের ছড়ার রক্ষিত হইয়াছে ।

“চেতন-পা” জনিতাত্মক চর্যাগীতিটির বহুল অংশ নাথ-পহের দ্বারা বাহিয়া আলিয়া কবীরের নামিত একটি গানে দেখা য়িয়াছে। সম্ভবত চেতনের কোন শিল্প গানটি লিখিয়াছিলেন। আধুনিক বাঙ্গালার অস্ত্রবান করিলে এইরূপ হয়—

টিলিতে মোর অর, পড়শী নাই,  
হাড়িতে ভাত নাই, নিতাই উপপতির উপজব।  
বেগে সংসার বহিয়া বার  
মোহা হুধ কি বাটে ঢোকে।  
বলম প্রসব করিল, গাড়ী বাবা,  
পাঞ্জ তরিয়া মোহা হয় তিন লোক।  
নিতি নিতি শৃগাল যুকে সিংহের সনে  
চেতন-পারের পিত কম লোকে বোকে।

কবীরের গানটি এই—

অব কেনা করে গান পাও-কোতোয়াল  
খ-মাংস পসারি শীখ রাখোয়াল।  
যুধা কি নাও বিলাই কোড়ারি  
সোরে মেজুক নাগ পহাশি।<sup>১৫</sup>  
বলম বিরাওয়ে গাবী ভই বাধা  
বাছুরি দুহাওয়ে দিন তিন লাগা।  
নিতি নিতি শৃগাল সিংহ সনে যুকে  
কহে কবীরে বিরল জনে বুকে।

নিজাত্মীয় সরহের রচনার বোধ তাত্ত্বিকতার অপেক্ষা নাথ-যোগ-সাধনার ইচ্ছাই বেশি পাওয়া যায়। এই চর্যাগীতিটি যেন মুক্ত ওক মৌননাথের প্রতি মুক্ত শিল্প পৌর্ননাথের উক্তি—

নাথ নয়, বিলু নয়, রবি-শশিমণ্ডল নয়,  
চিত্তরাজ স্বভাবতই মুক্ত।  
কছু যে কছু ছাড়িয়া বাক লইও না,  
বোধি নিকটেই, লকার বাইও না।

১৫ অর্থৎ এখন কি গান করে গায়ের কোতোয়াল। কবীর লিখিয়াছে মাংসের পসার, পহুনি তহরর হুক (অথবা মাংসের পসারর হুকক পহুনি)। বুদ্ধিক হইল মোকা, বিকাল তহরর কামতারা। ব্যাভ আরহ শূউয়া, তহরর প্রহরী নাথ।

হাতে বহিয়াছে কাকণ, ধরণী এইও না,

আপনা আপনি বোক নিজ মন ।...

বামে ডাঙিনে যে খাল-খোড়

সরহ জনে, বাবা লোভা রাত্তা সায়নে দেখা বাইতেছে ।

আর একটি চর্যাপীতির একটি ছত্রও যেন কদলীমোহমুহু যীননাথকে নির্দেশ করে—“বন্ধে ছারা লইলে, পারে ডাঙিল তোয়ার বিজ্ঞান ।” সহের একটি অপরূপ দোহাতেও পাই ইহার ইঙ্গিত—

যে নারী খায় নিজ পতিকে.....

স্বামীর পাশে বসিয়া থাকে, কিন্তু সে চিন্তে জট।

বোগিনীর এই স্বরূপ আমি দেখিতেছি ।

সহের এই দোহার তো শ্রীনাথ-গুরু উল্লেখ বহিয়াছে—

বিগ্ন বি বজ্জিখ জোউ রজ্জুই

অচ্ছহ গিরি-গুরু-পাহ কেহিজ্জুই ।

আর একটি দোহার সহর বসিয়াছেন—

অনিমিষ-লোঅণ চিত্তনিরোধে

পবণ নিরুহই গিরিগুরু-বোই ।

পবণ বহই সে। গিটলু হকে

জোই কোলু কেবই কিরে তকে ।

এমন ত্রিকালভর্য সিদ্ধযোগীর কাছে কর্ম নিরর্থক এবং নির্বাণ অর্থহীন । তাই সহর বসিয়াছেন চর্যাপীতিতে—

আমরা জানি না, অচিন্ত যোগী,

জন্ম মরণ ভব হয় কিরূপে ।

যেমন জন্ম মরণও তেমননি,

জীবন্তে মৃত্যু বিশেষ নাই ।

বাহার এখানে আছে জন্ম-মরণের শব্দ।

সে করুক বস-বসায়নের কাজ। ।

সহর্যাপীতি সিদ্ধযোগীর কাছে জন্মমৃত্যু সমান । তাই কান্দ তাঁহার জীবনসারাতে আনন্দবিরোগব্যবাহার কোনো শিককে উপলব্ধ করিয়া বসিয়াছিলেন—

সহজাবহার চিত্ত থাকে শূণ্য সম্পূর্ণ,  
 স্বভাবিয়োগে বিষয় হইও না।  
 বল, কিলে কারু নাই,  
 যখন যে অহুসিন দ্বিত্বন ব্যাপিনা বিলাস করিতেছে।  
 মৃদলোকে দুই-নই দেখিলে হয় কাতর,  
 তরলভঙ্গ কি সাগর শোষে  
 মৃদু থাকে বতরিন ততরিন লোকে দেখে না,  
 হৃথের মাঝে মাখন থাকিলেও দেখিতে পার না,  
 এই সংসারে কেহ আসে না যায়ও না।  
 এইভাবে লইয়া বিলাস করিতেছে যোগী কার।

নাট্যিক এবং বেদাচারবহির্ভূত বলিয়া নাথ-গদ্বীরা ব্রাহ্মণ্যসমাজ নিষ্পত্তি ছিল। বর্ণাশ্রমীদের কাছে নাথ-যোগীদের আচরণ ছিল জুগুপসিত। তবুও যোগী গুরু মহাত্ম্য ব্রাহ্মণ্যসমাজেও অস্বীকৃত ছিল না। যোগীদের আচরণ ও প্রভাব সম্পর্কে সেকহুতোদয়্যর একটি গল্প আছে। তাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

লক্ষ্মণসেনদেবের পাটহাতী একটা পথে একটি মাটি তুণ পাইয়া তাহা না ডিলাইয়া নমস্কার ও প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া যায়। এই কথা রাজার কানে গেলে তিনি তুণ খুঁড়তে হুকুম দিলেন। তুণমধ্য হইতে বাহির হইল এক সমাধিস্থ যোগী। খানভল হইলে যোগী জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন রাজা কে ? লোকে উত্তর দিল, এখন লক্ষ্মণসেন রাজা। যোগী বলিলেন, বিক্রমকেশরী গেলেন কোথায় ? ইহাতে বোকা গেল যে, বহুপূর্ণ পূর্বে বিক্রমকেশরীর রাজ্য-কালে যোগী সমাধি আশ্রয় করিয়াছিলেন। রাজা সমাদর করিয়া যোগীকে সত্যর আনাইলেন। যোগী নিজের পরিচয় দিলেন। নাম চন্দ্রনাথ। গৃহস্থপ্রায়ে তিনি ছিলেন গোয়ালী, নাম ছিল হুধাকর। লক্ষ্মণসেন যোগীকে অহরোহ করিলেন কিছু আহার করিতে। যোগী কহিলেন, অবতায় পাইলে খাইতে পারি। তখন রাজার মহানল হইতে উত্তম খাদ্য-পানীয় আনা হইল। যোগী একই মুখে দিরাই খু খু করিয়া খেলিয়া গেলেন। রাজা অপ্রস্তুত হইয়া হুধাইলেন, অবতায় তবে কি ? যোগী উত্তর করিলেন, তোমার সত্যর যদি কেহ সত্যাকার পণ্ডিত থাকেন তবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জান অবতায় কি। রাজা খবর দিলেন দোবর্ধন আচার্যকে। তিনি ব্যাপার শুনিয়া বলিলেন, খু

ধারাব যোচী চাউলের জাত আর কালো কচুর শাক লিঙ্গ<sup>১৬</sup> পরিবেশন করিতে। রাজা তাহাই করাইলেন। সেই অখাদ্য পরম পরিভুক্তভাবে থাইয়া বোগী রাজাকে বলিলেন, মহারাজ আমরা বোগী, স্বখাদ্য আখাদ্যের পরিভ্যাক্ষা বিবের মত, কর্ণ অন্ন আমাদের উদরে অমৃতের কাক করে।

ভারতবর্ষের মিষ্টিক সাধক কহিয়া উপনিষদের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবরই তাঁহাদের অখাদ্য-উপলব্ধিতে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন প্রহেলিকার হাদে। নাথ-পন্থী বোগী গুরু এই প্রহেলিকা-ছড়ার হাদকে বোগ-শিকা উপদেশের বিশিষ্ট বাহন করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাদের অধিকাংশই প্রহেলিকা ছড়ার ও অখাদ্যরূপকের উদ্ভব হইরাছিল বাঙ্গালায়। তাই হিন্দী রাজধানী ছড়ার মধ্যেও বাঙ্গালার হর শোনা যায়।<sup>১৭</sup> নাথ-পন্থী বোগীরা বিশেষভাবে ছিলেন পরিত্রাজক। ইহাদের মধ্যে জাতির পাঁতি ভো ছিলই না, ভাবার গভীও না। পশ্চিমা বোগী গুরুর পুরবিয়া শিষ্য এবং পুরবীয়া বোগী-গুরুর পশ্চিমা শিষ্য বিরল ছিল না। তাই পুরানো বাঙ্গালা নাথ-পন্থীদের নিবন্ধে হিন্দী প্রয়োগের ছড়া মিলিতেছে।<sup>১৮</sup> কলম্বর ও দরবেশ ককীরদের মধ্যেও ইহা অজ্ঞাত ছিল না। যেমন নরানচাঁদ ককীরের “বালকানামা”র<sup>১৯</sup> বাল্কার (অর্থাৎ শিষ্যের) সঙ্গীত—

কাই বৈঠে রাম-রহিম কাই বৈঠে গাঁই  
কাই বুলাবন মোকাম মজিল স্থান ভেস্ত পাই।  
কাই গোলক-বৈকুণ্ঠ কাই মক্তা-মদিনা  
কাই চন্দ্র-সূর্য কাই কাই দীন-তুনিয়া।  
কাই বৈঠে চৌকতুবন কাই আলম তারা  
কাই মেঘ বিজুরী কাই কাই বৈঠে ধারা।  
নরানচাঁদ ককীরে বলে দরবেশ মেরা ভাই  
কোন আলম খবর বান্দা এক পলক্লে পাই।

১৬ বরনামতীর পদ্য বোগী-লিঙ্গও শিষ্যের রামা কালো কচুর শাক লিঙ্গ থাইয়া তুলত হইরাছিলেন।

১৭ বাঙ্গালা সন্ন্যাসের ইতিহাস প্রথম খণ্ড ( বিত্তীয় সংস্করণ ) পৃঃ ৭৬৮।

১৮ গোপবিত্তের পরিচিষ্ট প্রস্তাব।

১৯ আবদুল করিম সম্পাদিত বাঙ্গালা প্রাচীন পদ্যের বিবরণ, প্রথম-খণ্ড, বিত্তীয় সংস্করণ, পৃঃ ১০৮।

সুখশীতের কবান—

দিল্লীতে বৈঠে রাম-রহীম দিল্লীতে মালিক-সাঁই  
দিল্লীতে কুমারন মোকাম মজিল হান ভেত পাই।  
যরে বৈঠে চৌক-কুবন মুহিআ আলম তারা  
চাঁদবুত মেঘ কুন্ডি ইস্তে বৈছে ধারা।

জেন সত্কারারে প্রচলিত অপভ্রংশ ইন্দোহাতেও যোগ-পদ্বী লিঙ্গ-সাধকের প্রয়োজন  
মিলিয়াছে। যেমন ২০—

প্রথ—

কালহিঁ পাবণহিঁ রবিসনিহিঁ  
চউ একটুই বাহ  
হ'উ তুহিঁ পুছ'উ জোইয়া  
পাহিলে কান্ বিণান্।

উত্তর—

সদি পোয়ই রবি পজলই  
পবন হলোলে লেই  
সত পুজু তমু পিজি করি  
কামহঁ কালু গিলেই।

উত্তরবলের হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ যোগী-কাচ<sup>২১</sup> বা যোগী বাজা  
আগ্রহের সহিত শুনিয়া আনিয়াছে সেদিন অবধি। ইহার মূল হইতেছে  
নাথ-পদ্বী সাধক-লিঙ্গদের প্রহেলিকা-বিলাস। বোড়শ শতাব্দীতেও যোগীদের  
অধ্যাত্তত্বপূর্ণ প্রহেলিকা-ছড়া লবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। কুম্বান কবিরাজ  
লিখিয়াছেন যে, ত্রিচৈতন্য তাঁহার তিরোধানের অবাবহিত পূর্বে অষ্টমত আচার্যের  
কাছে নিরলিখিত প্রহেলিকা-ছড়াটি পাইয়া অন্তরবলের কাছে বলিয়াছিলেন—

মহাযোগেশ্বর আচার্য তরজাতে সমর্থ  
আমিহ বুঝিতে নারি তরজার অর্থ।

অষ্টমত-আচার্য প্রেরিত ছড়াটি এই—

বাউলকে কহির লোকে হইল বাউল  
বাউলকে কহির হাটে না বিকার চাউল।

২০ উক্ত হাফিজুল জেন সম্পাদিত পান্ডুত লেখা ২১২, ২২০।

২১ ত্রিচৈতন্য হনুমন্ত বদ্বী বদ্বী বদ্বী ( ১০২১ ) বদ্বী।

বাউলকে কহিয় কাজে নাহিক আউল

বাউলকে কহিয় ইহা কহিয়াছে বাউল ॥

অবৈত-আচারের যোগী-সুলভ প্রহেলিকাশ্রিত্যের উল্লেখ করিয়া কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন,

“তর্জা প্রহেলী আচায কহে ঠারে ঠারে”

প্রভুমাত্র বুঝে কেহ বুঝিতে না পারে ।

আধুনিক যোগী-কাচে ফকীরের দরবেশ-বাউল-বৈষ্ণবতাবের রঙ বেশি করিয়া লাগিয়াছে । আর প্রবেশ করিয়াছে সহজ সরল দেহতত্ত্বের মধ্য দিয়া ব্যবহারিক জীবনের সহজ সরল অভিজ্ঞতার কথা । যেমন,

বালকরানের প্রশ্ন—

কোথায় বসে মণি-মগজ কোথায় বসে চান

লতি-রতন কোথায় বসে কোথায় বসে প্রাণ ।

কোথায় বসে তাল-সুখা কোথায় বসে কল

কোথায় বসে রতি-রতন কোথায় বসে বল ।

কোথায় বসে সাত জন কোথায় বসে মোড়া

কোথায় বসে জোর বলে কোথায় বসে ঘোড়া ॥

গুরু উত্তর—

মাথায় বসে মণি-মগজ ললাটে বসে চান

কমলে বসে লতি-রতন খড়েতে বসে প্রাণ ।

তালুতে বসে তাল-সুখা জিহ্বায় বসে কল

খড়েতে বসে রতি-রতন বাহুতে বসে বল ।

ছাতিতে বসে সাত জন রে নাভিতে বসে মোড়া

কোমরে বসে জোর বলে রে চরণে বসে ঘোড়া ॥

বালকরামের প্রশ্ন—

কোন গুরু আমায় লালে আর পালে

কোন গুরু আমায় আছাড়িয়া মারে ।

কোন গুরু আমায় তুলিয়া ধায় ভাত

কোন গুরু আমায় লয়ে বেড়ায় সাথ ॥



গুরু উত্তর—

মাও যে পরম গুরু লালে আর পাণে  
 বাপ যে পরম গুরু আছাড়িয়া মারে ।  
 বহিন যে পরম গুরু তুলে খাওয়ার ভাত  
 ডাই যে পরম গুরু লয়ে বেড়ায় সাথ ।  
 পিতা গুরু মাতা গুরু গুরু কোষ্ঠ ডাই  
 তাহা হইতে অধিক গুরু ভজিলে সে পাই ।  
 মায়ের গায়ের বস্ত্রখানা মা তোমার গায়ে দিয়া  
 চারি প্রহর রাত্রি জাগে তোমায় কোলে নিয়া ।

ধর্ম-ঠাকুরের গাজনেও এইরূপ ছড়া কাটাকাটি হইত । যেমন,  
 ধামাতকরণীর প্রশ্ন—

বাড়ি কোথা পণ্ডিতের কোন্ দেব ভজ  
 কোন্ মূর্তি ধ্যান কর কোন্ দেব পূজ ।  
 কোন্ মুখে পূজা কর কোন্ বেদ পড়  
 শীত্ৰগতি কহিলাম চাতুরালি ছাড় ।

পাটভক্তির উত্তর—

বাড়ি মোর বহুকায় নৈরাকার ভজি  
 শূন্যমূর্তি ধ্যান করি সাকার-মূর্তি পূজি ।  
 পূর্বমুখে পূজা করি পশ্চিম বেদ পড়ি  
 শীত্ৰগতি কহিলাম চাতুরালি ছাড়ি ।

মহাভারত বনপর্বে যে বক-মুখিতির সংবাদ আছে তাহার মূলেও এই অধ্যাত্ম-  
 জিজ্ঞাসা ও বুদ্ধি পরীক্ষা । আরও পিছাইয়া গেলে জনক বিনোদের সভায়  
 বাজবহোর সঙ্গে অবিদের “ত্রিশোক্ত” জন্মে পৌছাইব ।

“বোধ” নামে অধুনা প্রসিদ্ধ চর্যাগীতিগুলির মধ্যে যে নাথ-পরীদেব রচনাও  
 আছে তাহা দেখাইয়াছি । ইহার কথা বার দিলে বাঙালী সাহিত্যে নাথ-পরী  
 রচনা হইতেছে মীনচৈতন্য ও ময়নামতী-পোপীচন্দ্র পাখা । প্রথম পাখাটি  
 উত্তর ও উত্তর-পূর্ব বঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে গোপবিনয় নামে পাওয়া যায় । পশ্চিমবঙ্গে  
 এই কাহিনী ধর্ম-ঠাকুরের পুরাণ-কাহিনীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে । দ্বিত  
 লক্ষণের ও সহস্রের চক্রবর্তীর অনিঃপূরণে মীন-গোবর্ধন কাহিনী মূখ্য স্থান

লইয়াছে। কদলী হইতে প্রত্যাগমনের পর মীননাথ কর্তৃক মহানাদে যোগী-রাজ্য স্থাপন প্রথম অনিলপুরাণেই উল্লিখিত হইয়াছে। অনিলপুরাণে ও গোৰ্খ-বিজয়ে বর্ণিত কাহিনীর মূলস্থানীয় ছড়াগুলি পূৰ্বাপর প্রচলিত এবং একই। পরিবর্তন বাহা কিছু হইয়াছে তাহা প্রধানত গায়কের মুখে ও লিপিকরের হাতে।

ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্র আখ্যানিকা মীন-গোৰ্খ ছড়ার মত একান্তভাবে যোগী সাধক-গোষ্ঠীর খাস সম্পত্তি ছিল না। ইহার ককণরসের আবেগন জনগণের চিত্ত স্পর্শ করিয়াছিল। তাই এই কাহিনী গানে, পাচালী কাব্যে ও নাটগীতে রূপ পাইয়া আর্থ ভাষা ভারতের সর্বত্রগামী হইতে পারিয়াছিল।<sup>২২</sup> পশ্চিমবঙ্গে এই কাহিনীর সমাদর কমিয়া আসে বৈষ্ণবতার প্রসারের জন্য, বিশেষ করিয়া চৈতন্য-সন্ন্যাস কাহিনীর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায়। উত্তরবঙ্গে সাধু ও গৃহস্থ যোগীর সংখ্যা বরাবরই খুব বেশি ছিল। তাই এই অকালে মীন-গোৰ্খ গীতি ও ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্র গাথা বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত জনগণমন ভোরণ করিয়া আসিয়াছে। প্রস্তুত গ্রন্থের পরিশিষ্ট দুইটিতে গোৰ্খ-বিজয় কাহিনীর আধুনিকতর রূপান্তরের পরিচয় মিলিবে।

নাথ-পষের সিদ্ধপ্রধান দুইজন, মীননাথ ও গোৰ্খনাথ, বৈষ্ণবভক্ত-মালায় গাথা পড়িয়াছেন।<sup>২৩</sup> তাঁহাদের-কাহিনীও সেইমত রূপান্তরিত হইয়াছে। গুরু-শিষ্য পর্যটনে বাহির হইয়া পৌছিয়াছেন এক বিষ্ণু-ভক্তিহীন রাজার দেশে। গোৰ্খনাথ সে দেশে কালবিলম্ব করিতে চাহেন না, কিন্তু মীননাথের ইচ্ছা রাজাকে ভক্তিপথে টানিয়া আনিবার জন্য কিছুকাল থাকা। গুরুর ইচ্ছাই জয়ী হইল। মীননাথ রাজার সঙ্গে প্রীতি করিয়া পাশা খেলিতে লাগিলেন। রাজকন্যা তাঁহাকে বরবালা প্রদান করিল। গুরুকে ভোগস্থখে রত দেখিয়া শিষ্য দুঃখিত-চিত্তে চলিয়া গেলেন। রাজার মৃত্যু হইলে মীননাথ সিংহাসনে বসিলেন। তাঁহার এক পুত্র জন্মিল। অবশেষে গোৰ্খনাথ গুরুর উদ্ধারে আসিলেন সে দেশে, কিন্তু রাজার দর্শন পাইলেন না।

ষারিপণ ভিতরে ঘাইতে নাই দেয়

ঘাইতে না পার্যা কিছু স্থজিল উপায়।

২২ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃঃ ৭৭৫ দ্রষ্টব্য।

২৩ কৃষ্ণাসের ভক্তমালা দ্রষ্টব্য।

দরজা সম্মুখে এক ঢোল বাজাইয়া  
 চেত মজ্জল গোথী আয়া ইহাই বলিয়া ।  
 নাচিতে লাগিল। হোথা মীননাথ স্থনি  
 পরে সম্মুখিলা যে গোরথনাথ-বাণী ।  
 ডাকিয়া লইয়া গোথীনাথ প্রণমিলা  
 দেবান্তে আপন নিজ মন্দিরে রাখিলা ।  
 গোথীনাথ ব্যাকুল গুরুর চেষ্টা দেখি  
 সগাই চিত্তয়ে এক কণা নহে স্থখী ।  
 গুরুর তো নাহি পারে জ্ঞান শিখাইতে  
 জিজ্ঞাসার ছলে কিছু লাগিলা কহিতে ।  
 পূবে যে সকল তত্ত্ব শিখাইলে মোরে  
 হয় কি না হয় কহি তোমার গোচরে ।  
 যত্বপি না হয় শিখাও ভালমতে  
 এত বলি সব তত্ত্ব লাগিলা কহিতে ।

তত্ত্বকথা শুনিয়া মীননাথের জ্ঞান হইল । তিনি খেদ করিতে লাগিলেন,  
 আরে গোথী কি করিছ কি বিধ খাইছ  
 আপনার মুণ্ডেতে অনল জলি দিছ ।  
 ধিক্ ধিক্ মোরে এবে কি করিব কেহ  
 গোথীনাথ কহে ছাড়ি এখন চলহ ।

মীননাথ তখন রাত্যপাট ছাড়িয়া চলিলেন, তবে মূল্যবান অলঙ্কারগুলি পথসম্বল  
 করিয়া পুটলি বাধিয়া লইতে তুলিলেন না । কিছু দূর গিয়া গোথীনাথ  
 গুরুর মোট মাথায় তুলিয়া লইলেন এবং পথে এক নদী পাইয়া তাহাতে  
 ফেলিয়া দিলেন । গুরু হায় হায় করিতে লাগিলেন । শিষ্য বলিলেন, তুচ্ছ  
 বস্তুর জন্য কাতর হন কেন । এই বলিয়া তিনি বহু অলঙ্কারের অসারত্ব প্রদর্শন  
 করিলেন । তখন মীননাথের সম্পূর্ণ চৈতন্য হইল । গুরুশিষ্য মনের আনন্দে  
 ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ।

# রামকথার তত্ত্ব

এক

রামকথার মূল সাহিত্যিক রচনা হল ‘রামায়ণ’। সংস্কৃতে লেখা। আকারে মোটামুটি মহাভারতের দিকি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, সমগ্র সাতকাণ্ড রামায়ণ মহাকাব্যটি এক সময়ের স্তূতরাং এক লেখকের লেখা নয়। আমাদের দেশের ঐতিহ্যে রামায়ণের রচয়িতার নাম বাল্মীকি। রামায়ণের প্রথম ছয় কাণ্ড—বাল, অযোধ্যা, অরণ্য, স্কন্দর, কিষ্কিন্ধ্যা ও যুদ্ধ (বা লঙ্কা)—আসলে একটি ব্যক্তির লেখা হতে পারে। এই ছয় কাণ্ডে রাম-কথা সম্পূর্ণতা পেয়েছে। সপ্তম (উত্তর) কাণ্ডে যে পরবর্তী রচনা তা নামেই বোঝা যায়। এটি একটি স্বতন্ত্র কাহিনী, যার নায়ক রাম নয়, তাঁর পুত্রশত্রু ও তাঁদের পালক পিতা বাল্মীকি।

বাল্মীকির রামায়ণ ছাড়াও রাম-কথা মিলেছে সংস্কৃতে, পালিতে, প্রাকৃততে বিবিধ ভারতীয় দেশী ভাষায়, অভ্যন্তরীণ মিলেছে—ইরানী ভাষায়, তিব্বতী ভাষায়, জাম-কম্বোজ-দ্বীপময় ভারতের বিভিন্ন ভাষায়। এই সব রাম-কথার সবত্র রামায়ণের অন্তর্গত নেই। অনেকগুলির মূল সূত্র এসেছিল অন্য ঐতিহ্য থেকে। এবং এসবের কোন কোনটিতে রামায়ণের প্রভাব কমবেশী পাওয়া যায়। এই সব রাম-কথার আলোচনা ‘রাম-কথার প্রাক্-ইতিহাস’ পুস্তিকাটিতে পাওয়া যাবে। উপস্থিত প্রবন্ধে দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, রাম-কথা কোন একটি কবির মানসকল্পনাজাত অথবা কোন দেশের ঐতিহ্যসম্মত আখ্যানাবলী নয়। কোন অবতারের পূরণপ্রসিদ্ধ জীবনচরিতও নয়। এ আখ্যানাবলীর মূল বীজ ছিল অনেকগুলি উড়ো লৌকিক গল্প, যে বীজ যথেষ্ট মিলেছে স্বদেশে ও বিদেশে। এই উড়ো বীজ থেকে কেমন করে যে বিভিন্ন রাম-কথাগুলি অঙ্কুরিত ও প্রবর্ধিত হয়েছিল তাই আলোচনা করে দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি। এই উড়ো বীজ থেকে একটি বনস্পতি উদ্ভূত হয়েছিল—রামায়ণ মহাকাব্য। কিন্তু বিভিন্ন রাম-কথাগুলি সবই রামায়ণ-মহাকাব্যের বীজ-জাত নয়, আওতায় জাত, কোন কোনটি কলম-জাত।

## দুই

সাতকাণ্ড রামায়ণের মধ্যে তিনটি 'কথা' আছে। প্রথম কথা রামের নির্বাসন ও বনবাস। দ্বিতীয় কথা বনবাসী রামের পত্নী হরণ ও পত্নী-উদ্ধার। তৃতীয় কথা পত্নীহারা রামের পুত্রপ্রাপ্তি। এই তিনটি কথা একদা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। আগে প্রথম কথা দুটির মধ্যে যোগস্থল কল্পনা করে আলল অর্থাৎ ছয়-কাণ্ড রামায়ণ রচিত হয়। তার অনেক কাল পরে তৃতীয় কথাটি মূল কাহিনীর সঙ্গে জুড়ে যায়। পূর্বগামী পণ্ডিতদের এই যে ধারণা এর কিছু নতুন প্রমাণ আছে।

প্রধান এবং প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল প্রথম ও দ্বিতীয় কথা দুটি প্রাচীন সাহিত্যে মিলেছে দুটি অসংস্পর্শ রাম-আখ্যানরূপে। অন্যত্র (‘রাম-কথার প্রাক্ ইতিহাস’ পুস্তিকায়) দেখিয়েছি যে প্রথম কথাটি সম্পূর্ণ রাম-কথারূপে মিলেছে বৌদ্ধ সাহিত্যে পালিতে (জাতক ৪৬১), মহাভারতে দ্রব্য, জ্যোতিষ পর্ব ৫৭ অধ্যায়, শাস্তি পর্ব ২২ অধ্যায়) এবং হরিবংশে (১:৪১)। এ আখ্যানে রাম সত্যসদ্ব মহাপুরুষ, পণ্ডিত বিচক্ষণ দানশীল শুশাসক রাজা। তিনি পিতার প্রদত্ত বনবাসদণ্ড স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং দণ্ডকাল শেষ হবার পরে দেশে ফিরে গিয়ে রাজা হয়েছিলেন। এই কথায় তিনটি স্তর পাওয়া যায়। একটি স্তরে সীতার ও ভাইদের উল্লেখ নেই। দ্বিতীয় স্তরে সীতা ভগিনী। তৃতীয় স্তরে সীতা পত্নী। শেষ দুই স্তরেই ভাইদের উল্লেখ পাই।

এই কথার গল্পটির একটি স্বতন্ত্র প্রাচীনতর (?) রূপও ছিল। সে গল্পে বনবাস-প্রত্যাগমন ছিল না, ছিল বিসর্জন ও পুনরাগমন। সে কাহিনী উড়ো বীজেই রয়ে গেছে, অক্ষুরিত হতে পারে নি। উড়ো বীজের প্রসঙ্গে তা বলব।

## তিন

দ্বিতীয় কথায় (অর্থাৎ স্বাধীন কাহিনীটিতে) রাম (অথবা অনামা তরুণ রাজা) রাজ্যান্তে হয়ে (অথবা বৃগয়া উপলক্ষে) অরণ্যবাসে ছিলেন। সঙ্গে তাঁর পত্নী ছিল (অথবা অরণ্যবাস কালে পত্নী সংগ্রহ করেছিলেন)।

এই পত্নীকে হরণ করে এক মারাবী তপস্বী ( অথবা তপস্বী বেশ ধরে মারাবী রাক্ষস )। অনেক খোঁজাখুঁজির পর বানরদলের সঙ্গে মিত্রতা করে তাদের সাহায্যে রাম পত্নীকে উদ্ধার করেন। তারপর পত্নীসহ (অথবা পত্নীছাড়া) দেশে ফিরে গিয়ে রাজপাটে বসেন। এ আখ্যানটি মিলেছে ( একটি বৌদ্ধ জাতকে, চীনা অঙ্কবাদের ), (২৫১ খ্রীষ্টাব্দে করা ), মহাভারতে বনপর্বে, অধ্যায় ২৭৪ শ্লোক ১-৩ ) আর খোঁটানি ভাষার রামচরিত বর্ণনায় ( গদ্যে, আত্মমাত্রিক নবম শতাব্দী )। মহাভারতের কাহিনীটি খুব সংক্ষেপে অন্যত্র বলা হয়নি বলে এখানে উদ্ধৃত করছি। অয়ত্থেব হাতে দ্রৌপদীর নিগ্রহ ও উদ্ধারের পর যুধিষ্ঠিরকে সাক্ষ্যনা দেবার জন্য মার্কণ্ডেয় এই গল্পটি বলেছিলেন :

প্রাপ্তম্ অপ্রতিমং হৃৎং রামেণ ভরতর্ষভ।

রক্ষণা জানকী তস্য হতা ভাধা বলীয়সা ॥১॥

আশ্রমাদ্ রাক্ষসেন্দ্রেণ রাবণেন হুরাষ্টনা।

মায়াম্ আহ্বায় তরসা হস্তা গৃধ্রং জটায়ুসম্ ॥২॥

প্রত্যাক্ষহার তাং রামঃ সূগ্রীববলম্ আশ্রিতঃ।

বহু সেতুং সমুদ্রস্ত দক্ষা লঙ্কাং শিতৈঃ শটৈঃ ॥৩॥

অর্থাৎ, ‘হে ভরতশ্রেষ্ঠ, তুলনাহীন হৃৎ পেয়েছিলেন রাম।

অধিকতর বলবান্ রাক্ষস কর্তৃক তাঁর ভাধা জানকী অপহৃত হয়েছিল ॥ ১ ॥

( জানকী অপহৃত হয়েছিলেন ) তাঁদের আশ্রম থেকে রাক্ষসদের রাজ্য ছুরাষ্ট্রা রাবণ কর্তৃক, প্রবল মায়্যা দেখিয়ে, শকুনি জটায়ুকে নিহত ক’রে ॥২॥

সূগ্রীবের সৈন্য সাহায্যে সমুদ্রে পুল বেঁধে তীক্ষ্ণ শর দিয়ে

লঙ্কাকে পুড়িয়ে তাকে উদ্ধার করেছিলেন রাম’ ॥৩॥

( তিনটি মাত্র শ্লোকে গল্পটি শোনবার পর যুধিষ্ঠির রাম-কথা বিস্তৃত ভাবে তনতে চাইলে মার্কণ্ডেয় তা বর্ণনা করলেন উনিশ অধ্যায়ে। এই উনিশটি অধ্যায়ের ( ২৭৪-২৯২ ) প্রথম অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোক আগে উদ্ধৃত করেছি। এই তিনটি শ্লোক মাত্র আদি মহাভারতে ছিল। বিস্তৃত বর্ণনাতে ছুটি কাহিনী জুড়ে গেছে। এ পরবর্তী কালের প্রসাধন। তবুও রামায়ণ-কাহিনীর সঙ্গে সবটা মেলে না। এ প্রসঙ্গ পরে আলোচনা করব। )

তৃতীয় শতাব্দীর চীনা অঙ্কবাদের যে জাতক গল্পটি মিলেছে তাতে পাত্তপাত্তীর নাম নেই। তবুও যে এটি রাম-কথা তা কাহিনী অঙ্কন

স্বীকার করতে হয় এবং নায়ক যে মহাপুরুষ রাম তা তাঁর বোধিসত্ত্ব বলে উল্লেখ থেকেও বোঝা যায়। গল্পটি কিছু খণ্ডিত। উপক্রম অন্য রকম। মাতুল এসে রাজ্য কেড়ে নেওয়ার নায়ক সপত্নীক অরণ্য আশ্রয় করেছিলেন। মাতুলের আক্রমণ কেকয়ীর বিরূপতারই এক বিকল্প বলে মনে হয়। হস্ত এখানে প্রথম কথার সঙ্গে কিছু যোগাযোগ ছিল। কিন্তু বর্ণনীয় বস্তুর সঙ্গে তার যোগসূত্র খুব তাৎপর্যপূর্ণ নয়। প্রতিনায়ক এখানে সমুদ্রবাসী নাগ—রাবণের আসল রূপ। সত্যীত্বের পরীক্ষা দিয়ে তবে পত্নীর মিলন হয় পতির সঙ্গে।

গোটানী রাম-কথার উপক্রম একেবারে অন্যরকম। রাজা দশরথ ব্রাহ্মণ জমদগ্নির গোক চুরি করেছিলেন এই অপরাধে জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম দশরথের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে নিহত করেন। দশরথের দুটি শিশু পুত্র ছিল। তাদের বাঁচাবার জন্য রাজমহিষী তাদের ভূগর্ভে অজ্ঞাতবাস করান বারো বছর ধরে। তারপর রাম লক্ষণ সমর্থ হয়ে পরশুরামের সন্ধানে বার হন। এক পাহাড়ে তার দেখা পেয়ে রাম তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁকে হত্যা করেন এবং দেশে সর্বেসর্বা হন।

দুই ভাই একসাথে বনে বেড়াতে যান। সেখানে এক ঋষির পালিত কন্যাকে দেখেন। এ কন্যা ছিল ব্রাহ্মণদের রাজা দশগ্রীবের (অর্থাৎ রাবণের) অলক্ষণা স্তত্রাং পরিতাক্ত কন্যা। এই কন্যাকে নিয়ে রাম-লক্ষণ বনের অনাত্র গিয়ে বাস করতে থাকেন। দশগ্রীব একদিন আকাশে উড়ে যেতে যেতে মেয়েটিকে দেখে এবং নিজের মেয়ে না জেনে তার রূপে মুগ্ধ হয়। সে নেমে আসে। সীতার গ্রহরী ছিল এক শকুনি। সীতা নিজে ছিল মহের বেড়ার মধ্যে। দশগ্রীব শকুনির সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করে। তার পর ভিখারী ব্রাহ্মণ সেজে ভিক্ষা গ্রহণ করার ছলে সীতাকে ধরে নিয়ে লঙ্কাধীপে চলে যায়। দুভাই সীতার খোঁজ করতে থাকে বারো বছর ধরে। শেষে তারা দেখা পায়, বানররাজ দুভাই নও ও স্ত্রীবের সঙ্গে। দুজনে একই রকম দেখতে এবং দুজন যুদ্ধ করছে। রাম নওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে স্ত্রীবকে গোপনে—তার বাধন যুদ্ধ করছে সেই

অবস্থায়—হত্যা করেন। তারপর নও রামকে সাহায্য করে সীতার অন্বেষণ বাপারে। এক পাখীর মুখ থেকে জানা গেল যে, সীতা আছেন লঙ্কার ঘোঁষে। তখন বানররা সমুদ্রে পুল বাধলে। বানরদৈন্য নিয়ে রাম-লক্ষণ লঙ্কায় গেলেন। দশগ্রীবের সঙ্গে যুদ্ধ বাধল। দশগ্রীব বিযাক্ত বাণ মেয়ে রামকে হৃৎকল্ল করে দিল। চিকিৎসক জীবক রামকে বাঁচিয়ে তুললে ‘মৃত-সঞ্জীব’ ঔষধ দিলে। এ ঔষধ নও এনে দিলে হিমালয় থেকে। গাছটি সে চিনতে পারেনি বলে গোটা পাহাড়টাই তুলে এনেছিল। তারপর আবার যুদ্ধ চলল। জ্যোতিষীরা রামকে বলে দিলে দশগ্রীবের মর্মস্থান পায়ের বুড়ো আঙুলে আঘাত না করলে তাকে ধারেল করা যাবে না। তখন রাম দশগ্রীবকে বন্দুযুদ্ধে আহ্বান করে তাকে তার ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দেখালে চ্যালেঞ্জ করলেন। দশগ্রীব তা দেখাতেই রাম সে আঙুল তীরবিদ্ধ করলেন। দশগ্রীব হার মানলে। রামের আত্মগত্যা স্বীকার করায় রাম তাকে প্রাণে মারলেন না।

সীতার সঙ্গে রাম ও লক্ষণ লঙ্কায় এক বছর বাপন করলেন। তারপর সীতাকে নিয়ে প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিলে, লক্ষণ চাইলেন টাকাকড়ি দিয়ে প্রজাদের মুখ বন্ধ করতে। সীতা তা চাইলেন না। তিনি পাতালে প্রবেশ করলেন। তারপর রাম ও লক্ষণ সমুদ্রের নাগদের তাড়িয়ে দিলেন ওষুধ ও সর্ষে পুড়িয়ে।

এই খোঁটানি গল্পটিতে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষত্ব আছে। প্রথমত পরশুরাম ও দশরথের সংঘর্ষ। এটির ক্ষীণ আভাস পড়েছে প্রচলিত রাম-কথায়ও। সীতাকে বিয়ে করে আসবার সময় পরশুরামের সঙ্গে পথে সাক্ষাৎ—খোঁটানি গল্পে উল্লিখিত বিরোধেরই কিঞ্চিৎ তলানি মাত্র। আসলে কি পরশুরামই সীতার পালক পিতা, বাল্মীকির প্রথম সংস্করণ?

দ্বিতীয়ত, খোঁটানি গল্পে রাম ও লক্ষণ দুজনেই সীতার প্রণয়গ্রাথী। মনে হয় এই মোচড়টুকু পালি জাতকে উল্লিখিত ভাই-বোন সখস্বেরই জের। জনকের সত্য, ধনুর্ভজ ইত্যাদির কোনই উল্লেখ নেই। তবে সীতা দশগ্রীবের কন্যা। রাবণ দশগ্রীব নামেই আগাগোড়া উল্লিখিত। এই নাম যেন দশরথ নামের জোড়া। রাম-লক্ষণ সীতাকে পেয়েছিলেন বনে, তপস্বীর আশ্রমে। এ গল্পে হজ্জমান নেই। হজ্জমান এক হয়ে গেছে রামায়ণ-কাহিনীর সূগ্রীবের সঙ্গে। আর সে কাহিনীর বাণী হয়েছে সূগ্রীব এবং সে কাহিনীর সূগ্রীবের নাম



হয়েছে নও। দশরথী মরে নি, মূনি হয়েছিল। সীতাকে পরিত্যাগ করা হয়েছিল লঙ্কাত্তেই। সীতা-পুত্রের কোনই উল্লেখ নেই।

উপক্রম অংশ বাদে, পুরোপুরি অসংস্পর্গভাবে দ্বিতীয় কাহিনীটি মিলেছে ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জের মারানানও ভাষায় লেখা (দ্বাদশ-চতুর্দশ শতাব্দী) ‘মহারাদিরা লাগুয়ানা’ (অর্থাৎ—মহারাজা রাবণ) কাব্যে। গল্পটিতে অনেক বৈশিষ্ট্য আছে।

কোন এক দেশের রাজার ছেলে ছিল রাবণ। তার দশটা মাথা, তবে হাত দুটি মাত্র। সে ছিল দুর্ভীষিত ও অত্যাচারী। সেই জন্য পিতা তাকে লঙ্কা নগরে (‘পুলু নগর’) নির্বাসন দেন। সেখানে রাবণ তপস্যা করে ক্রমতাপন্ন হয়, আর ক্রি়ে এসে পিতৃরাজ্য অধিকার করে। অপর এক রাজ্যে রাজার দু’ছেলে ছিল। তাদের নাম রাজা মন্ডনদ্বিরি ও রাজা মন্ডবর্ণ। তাদের বয়স হয়েছিল কিন্তু বিয়ে হয়নি। সন্ধান পেয়ে দু’ভাই বিবাহের উদ্দেশ্যে এক দূর দেশে যাত্রা করে জলপথে। এ দেশের নাম ‘পুলু নাবান্দাই’, রাজকন্যার নাম তিহাইরা। সেখানে পৌঁছতে রাজপুত্রদের দশ বছর লেগে গেল। সেখানে গিয়ে রাজা মন্ডনদ্বিরি বিবাহাখীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করলেন। দু’ভাই সে দেশে কিছু কাল কাটিয়ে শেষে দেশের দিকে রওনা হলেন। এবারে ধরলেন তাঁরা স্থলপথ। সঙ্গে অনেক লোকজন। দীর্ঘ পথ কুরোবার অনেক আগেই তাঁদের খাদ্যভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে গেল। অগত্যা তাঁদের এক স্থানে উপনিবেশ করে চাষ-আবাদে দ্বারা শস্য সংগ্রহ করার জন্য রয়ে যেতে হল। এখানে থাকতে থাকতে একদিন রাজকন্যা তিহাইরা দেখলেন যে এক সোনার-শিঙে হরিণ ক্ষেতে ঢুকে ফসল খাচ্ছে। দেখে তাঁর লোভ হয় হরিণটাকে পোষবার জন্য। পত্নীর নির্বন্ধে মন্ডনদ্বিরি ছুটলেন সে হরিণ ধরতে। কায়দা করতে না পেরে তিনি ভাইকে ডাক দিলেন তাঁর সাহায্যে আসতে। ভাই এলেন। তখন একটি হরিণ দুটি হয়ে দু’দিকে ছুটে পালাল। ফলে দু’ভাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। মন্ডনদ্বিরি যার পেছনে ছুটেছিলেন সে তাঁকে বাড়ির কাছে এনে দিয়ে শূণ্ডে মিলিয়ে গেল। তিনি আর ক্রি়ে এসে দেখেন যে পত্নী নেই। তিনি বুঝতে পারলেন, এ কাজ লাগুয়ানার। (সম্ভবতঃ রাবণ তিহাইরার পাণিগ্রাহী ছিল)।

মন্ডনদ্বিরি তখন ভাইয়ের খোঁজে চললেন। পড়ে গেলেন তিনি

এক নদীতে, হাথে গেলেন অচেতন। সেই অবস্থায় স্বপ্ন দেখলেন যেন এক বুনো ঘোষ তাঁকে ভাড়া করেছে, তাতে তাঁর অগুরুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথিবীকে ছিটকে পড়েছে—পড়েছে একেবারে সে দেশের রানী লাক্ষাবীর মুখের মধ্যে আর রানীও তা গিলে কেলেছে। তার ফলে লাক্ষাবী এক ছোট বানরশিশুর জন্ম দিলে। তার নাম রাখা হল লক্ষণ। মঙ্গনদ্রি়ি এই পৰ্ব্বন্ত স্বপ্ন দেখেছেন এমন সময় মঙ্গবৰ্ণ এসে তাঁকে জল থেকে তুলে স্নান করলেন।

তিহাইয়ার খোঁজে দুভাই বেরোবেন বেরোবেন করছেন এমন সময় স্বপ্নকে নত্যা প্রমাণ করে বানরশিশু লক্ষণ তাঁদের কাছে এসে হাজির হল। লক্ষণের সহায়তায় দুভাই জন্মের কুমার বনের ঘোষ আর গাছের বানর জুটিয়ে নিয়ে এক বিরাট বাহিনী গঠন করলেন। তারপর মঙ্গনদ্রি়ির হাতের তেলো থেকে লাফ মেরে লক্ষণ সাগর উত্তীর্ণ হয়ে তিহাইয়ার সন্ধান এনে দিলে। লক্ষণ লক্ষ্য করেছিল যে, যখনই লাগোয়না তিহাইয়াকে ছুঁতে যায় তখনই দুজনের মধ্যে দাউ দাউ করে আগুন জলে উঠে বাধার সৃষ্টি করে।

তার পর দু দলে যুদ্ধ বাধল। লাগোয়নার সৈন্য পরাস্ত হল। তখন সে হস্তযুদ্ধে নামল। এক বিশেষ পাথরে শাণ দেওয়া তলোয়ারে—এ ব্যাপার লাগোয়নার মৃত্যুর তুচ্ছ—লাগোয়না পরিত হল। পরাজিত হয়ে লাগোয়নার মতিগতি বদলে গেল। সে ভালোভাবে নিজের রাজ্য শাসন করতে লাগল। ভাই, লক্ষণ ও পত্নীকে নিয়ে মঙ্গনদ্রি়ি তাঁর দলবল নিয়ে দেশে ফিরে এলেন কুমীরের পিঠে চেপে। দেশে ফিরে লক্ষণের রূপ বদল ঘটল, সে স্বরূপ রাজকুমারে (‘দাতু’) পরিবর্তিত হল। সকলে স্নেহে দিন কাটাতে লাগল।

ফিলিপিন কাহিনীর প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে, এ কাহিনীর কোন উপক্রম নেই, সম্পূর্ণ স্বয়ম্ভব। দ্বিতীয়ত, এতে পত্নী সংগ্রহ করে থেকে নয়, বিদেশে গিয়ে। তৃতীয়ত, অপহরণে যুগের সহায়তা। চতুর্থত, হতমানের সঙ্গে রাম-দাতার সম্পর্কের এক অভিনব ব্যাখ্যা। (এ-ব্যাপারে স্বীকৃত ভারতের অল্প রাম-কথা কতক মেলে, তবে এতটা স্পষ্টভাবে নয়।) পঞ্চমত, জল-স্থল-আকাশচারী ত্রিশক্তি সমাবেশে উদ্ধার-বাহিনী গঠন। ষষ্ঠত, লক্ষণকে হতমানের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে ছই ভাইয়ের সঙ্গে রাজকুমারীর সম্পর্ক একটু যেন অস্পষ্ট রাখার চেষ্টা।

## চার

তৃতীয় কথাটি হল, এক রাজার পত্নী পরিত্যাগের গল্প। অশ্বমেধ দ্বিভিত নির্দোষ পত্নীকে বনবাস দেওয়া হল। সেখানে সে এক মুনির আশ্রমে থেকে সন্তান প্রসব করে। বনবাস দেবার সময়ে রাজা জানতেন না যে পত্নী সন্তান। মুনি ছেলেকে (বা বমজ ছেলেকে) মাল্যব করে তাদের গান শোনান। সেই গান শুনে রাজা খুশি হয়ে তাদের পরিচয় জানতে চান। পরিচয় পেয়ে তাদের পুত্র বলে গ্রহণ করেন। পতির সঙ্গে মিলনের আগেই পত্নীর দেহত্যাগ হয়।

এই কাহিনীটি উত্তরকাও রামায়ণের বিষয়। মূল রামায়ণে ছিল না। মহাভারত বনপর্বে যে বিস্তৃত রামোপাখ্যান আছে তাতেও নেই। ভট্টিকাব্যেও নেই।

## পাঁচ

এইবার ‘কথা’ তিনটির দূরদূরান্তরে ছড়িয়ে পড়া উড়ো বীজের আলোচনা করি।

প্রথম কথার উড়োবীজ যে সব মিলেছে তার মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হল পুরোনো আইরিশ মিথের একটি গল্প,—‘লিরের পুত্রকন্যা’ (Oidheadh Cloinne Lir)। দেশের প্রাচীনতম অধিবাসীদের রাজা নিবাচিত হয়েছিলেন বোব। নির্বাচনে খুশি না হয়ে লির রাগ করে দূরে গিয়ে বাস করতে থাকেন। বোব বেশ ভালো রাজা ছিলেন। তাঁর তিনটি পালিত কন্যা ছিল। তিনি লিরকে নিমন্ত্রণ করে এনে বড়োমেয়ে ইভাকে তার সঙ্গে বিয়ে দিলেন। দুজনে সচ্ছন্দে সংসার করতে লাগলেন নিজের ঘরে। তাঁদের জন্মাল চন্দ্রকা বমজ সন্তান। প্রথমে একটি মেয়ে ও একটি ছেলে। এদের নাম হল ফিনোলা ও আত্রদ। তার পরে জন্মাল দুটি ছেলে। তাদের নাম হল কিআক্রা ও কনন্। কিছুদিন পরে লিরের পত্নীবিয়োগ হল। তখন খবর বোব তাঁর দ্বিতীয় কন্যা ইভাকে লিরের দ্বিতীয় পত্নী করেছিলেন। ছেলেমেয়ের মুখ চেয়ে লির আশ্রিত করেন নি। কিছুদিন পরে ইভা লক্ষ্য করলে যে লির ছেলেমেয়েদের একটু বেশি মাজার ভালোবাসেন। এই ভাবনার বশে তাঁর মনে ঈর্ষা জন্মাল। সে ঈর্ষা শীঘ্রই হিংসার

পরিণত হল। সে ছেলেমেয়েদের ডাড়িয়ে দেবার চেষ্টায় রইল। এক বছর সে পৌড়ার ভাণ করে বিহানায় গুয়ে গুয়ে বোন-সতীনের সন্তানদের বিক্রমে কন্দি আঁটতে লাগল। একদিন সকালে ইভা ছেলেমেয়েদের নিয়ে রথে চড়ে বাপের বাড়ি ঘাবার উদ্যোগ করলে। কিনোলা প্রথমে যেতে চায় নি, শেষে বাধ্য হয়েছিল। রথ টানা দক্ষিণ মুখে চলল। কিছুদূর এসে ইভা সজ্জের লোকজনকে বলেছিল ছেলেমেয়েদের কেটে ফেলতে। তারা রাজি হয়নি। আবার রথ চলল, এসে পৌঁছল এক হ্রদের ধারে। সকলে রথ থেকে নামল। ইভা ছেলেমেয়েদের বললে, কাপড় চোপড় খুলে হ্রদে ঝাপ দিয়ে স্নান করতে। যেই তারা জলে নামল অমনি ইভা জাহ্ন-দণ্ড ছুঁইয়ে একে একে তাদের সাদা রাজহাঁস করে দিলে। তারপর সে মন্থ পড়ে তাদের শাপ দিলে। সে শাপের ফলে তারা প্রায় অনন্ত কাল ধরে রাজহাঁস হয়ে থাকবে তবে মাহুয়ের মত কথা কইতে পারবে।

বাপার গুনে লির হায় হায় করতে থাকেন কিন্তু শাপ কাটাবার কোন উপায় খুঁজে পাননি। তিনি মাঝে মাঝে হ্রদের ধারে এসে হাঁসদের গান শুনতেন।

শাপ দেওয়া পৰ্বন্ত সন্মার বাপারটির মিল রান-কথার সঙ্গে ম্পষ্ট। পালি জাতক গল্পের সঙ্গে মিল সীতা ও লক্ষ্মণের জলে নামায়। হাঁসদের গানে মিল টেনেছে উত্তরকাণ্ডের সঙ্গে। পালি জাতকের সঙ্গে আরও মিল ভাই-বোন বাপারে।

এ কাহিনী পালি জাতকের তুলনায় আরো পুরোনো বলে মনে হয়। এতে নির্বাসিতদের পুনরাবর্তন নেই।

দ্বিতীয় কথার একটি বিশিষ্ট রূপান্তর পেয়েছি যবদ্বীপীয় এক লৌকিক গল্পে। এতে পুনরাবর্তন নেই, তবে হাঁস হওয়াও নেই। গল্পটি Dr. Juan H. Francisco-র প্রবন্ধ থেকে নেওয়া।

একদা এক বুড়ো রাজা ছিলেন। তাঁর ছিল অনেক স্ত্রী, অনেক সন্তান। বুড়ো ছেলে, রাম রাজা (Jamojaja) দেবতার মতো হৃদয় শক্তিশালী ও উদার। প্রজারা তাঁর খুব অহুগত ছিল। রামরাজাকে দারুণ হিংসে করত তাঁর সৎমা দেবী অন্ডানা (Devi Andana)। সে চাইত তাঁর নিজের ছেলে বাতে তাঁর স্বামীর সিংহাসনে বসতে পারে। রূপসী সে ছলাকলা বিস্তার করে স্বামীর মন ভুলিয়ে রামরাজাকে নির্বাসিত করার প্রতিজ্ঞা আদায় করে নিলে।

সেই দিনই সন্ধ্যা বেলায় রাজা বড়ো ছেলে ও সত্যাসন্থের ডেকে বসলেন, ‘আমার বড়ো ছেলের কিছু শত্রু জুটেছে, তাকে মেয়ে ফেলতে চায়। আমি তাকে হত্যা করছি সে যেন আমার রাজ্য ছেড়ে চলে যায়। আমার বৃত্তার পর সমীরণ (Samijan) রাজা হবে।’ অগত্যা রামরাজা বনে চললেন। তাঁর পত্নী দেবী কুমুদো (Devi Kusumo) তাঁর সঙ্গে ছাড়লেন না। বাবার আগে সংমা পোপনে রামরাজাকে বিষ খাইয়ে দিলে। সে বিষের ফল দেহিতে কলে।

অনেক দূর চলে বাবার পর তাঁরা পৌঁছলেন এক গভীর খাদের ধারে। সেখানে রামরাজা অবসর হয়ে বসে পড়লেন এবং তারপর তাঁর মৃত্যু হল। পত্নী বিলাপ করতে লাগলেন। একটু পরে দেখলেন এক দেবতা—বিবাহের দেবতা কামরাজা। তিনি রামরাজাকে বাঁচিয়ে রাখলেন কিন্তু মানুষ আকারে নয়। রামরাজা পবিত্র গাছ হয়ে মাথা তুলে উঠলেন। পত্নী সে গাছ জড়িয়ে ধরে কান্ডে লাগলেন। তারপর তিনি কান্ডে কান্ডে শ্রোতবিনীতে পরিণত হয়ে গেলেন।

রামরাজা স্ত্রীকে নিয়ে বনে গেছে জানতে পেরে প্রজারা খুঁজতে বেরিয়েছিল কিন্তু কোন খোঁজ না পেয়ে তারা কিরে গেল। সমীরণও তাদের সঙ্গে গিয়েছিল মায়ের সঙ্গে রাগারাগি করে। সে কিন্তু ফিরল না। দেবতার তাকে পাখী করে দিলেন। সে পাখী হয়ে ডেকে বেড়াতে লাগল “কাকাগালোত” “কাকাগালোত” ( মানে, ‘ভাইকে খুঁজছি, ‘ভাইকে খুঁজছি’ )। সেই ডাক পাখী এখনও ডাকে। সে গাছ এখনো লোপ পায় নি। সে স্বরণা এখনো বইছে।<sup>১</sup>

এই গল্পের পরিণতি লক্ষ্য করার মত। যেন রাম সীতা ভরত বনাক্রমে গাছ, জল ও পাখী শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। প্রচলিত রাম-কথায় এই তিন শক্তির প্রকাশ দেখি বানরে, সমুদ্রে ও জটায়ুতে।

একটি উড়োবীজ পাওয়া গেছে বাংলা গল্পে। তবে সোজাহুজি নয়, লীওতালনের মারক্য।<sup>২</sup> এক রাজার ছিল দুটি বানী আর এক উপরানী। বড়ো বানীর দুটি ছেলে, সীত ও লক্ষণ, ওদের রেখে তিনি মারা বান।

১। Indonesian Fairy Tales, Adelo de Leeuw ( 1967 ), পৃষ্ঠা. ৭২-৮৮।

২। Folklore of Santal Paraganas, C. H. Bompas ( 1909 ), পৃষ্ঠা ২০৭-২৪০।

সংমা ছেলে দুটিকে দেখতে পারত না, কিন্তু উপরানী ভাবের খুব বড় করত। ছোট রানী রাজাকে পরামর্শ দেয় ছেলে দুটোকে দূর করে দিতে। কিন্তু রাজার মত হয় না। শেষে রানী কঠিন রোগের ভাণ করে বিছানা নিলে। রাজা তাকে খুব ভালোবাসত, তাই অভ্যস্ত কাতর হয়ে পড়ল। তার পর রানীর পরামর্শ মতো চিকিৎসক রাজাকে জানালে যে রানীকে বাঁচিয়ে রাখবার একমাত্র ঔষুধ হল ছেলে দুটির মেটে অর্ধাংশ বকুৎ। বুড়িলাই রাজা তাই হুকুম দিলে ছেলে দুটিকে বনে নিয়ে গিয়ে কেটে কেলে তাদের মেটে এনে দিতে। সেপাইরা সীত-লক্ষণকে বনে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে ছুটো কুকুর কেটে তাদের মেটে এনে দিলে। সংমা তা খেয়ে অস্থখের ভাণ ছেড়ে দিলে।

সীত-লক্ষণ বনে বনে ঘুরতে লাগল। এক সময় হঠাৎ তাদের নজরে পড়ল, একটা গাছের গুঁড়ি বেয়ে সাপ উঠছে উপর ভালে পাখির বাসার দিকে লক্ষ্য করে। তারা সাপটাকে মেরে ফেললে। বাসার পাখীর বাচ্চা ছিল, তারা বেঁচে গেল। বাচ্চাদের বাপ-মা এসে ব্যাপার শুনে খুশি হয়ে সীত লক্ষণকে তাদের খাবারের কিছু কিছু খেতে দিলে আর তাদের আশীর্বাদ করলে,—সীত রাজা হবে, লক্ষণের মুখ থেকে সোনা ধসবে।

তারপর একদিন সীতকে একস্থানে রেখে লক্ষণ দূরে গেছে শিকার অবশেষে, এমন সময় সেখানকার রাজার পাট-হাতি ঘুরতে ঘুরতে এসে সীতকে দেখে তাকে পিঠে তুলে নিয়ে রাজবাড়িতে চলে গেল। সেদিন সে রাজ্যের রাজকন্যার স্বয়ংবরের আয়োজন হয়েছে। পাট-হাতি এনে দেওয়ার্তে সীতেরই সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হল আর সীত রাজ্যের রাজা হল। লক্ষণ এসব কিছুই জানতে পারলে না। খাতস্থ হয়ে সীত লক্ষণের খোঁজ করতে লোক পাঠালে কিন্তু তার কোন খোঁজ তখন পাওয়া গেল না। যখন তার খোঁজ পাওয়া গেল তখন লক্ষণ এক কুমোরে বাঁড়িতে কাজ করছে। লক্ষণের মুখ দিয়ে সোনা বরে, তাই তাকে ছাড়তে কুমোর রাজি হয় না। শেষে অনেক টাকা-কড়ি দেওয়ার সে লক্ষণকে ছেড়ে দিলে। সীত-লক্ষণের মিলন হল।

এদিকে গুহের বাবার বয়স হয়েছে, রোগও হয়েছে। দু-ভাই সেদিকে কোন নজর দিল না। তারা তাদের খাইয়া উপরানীকে আনিতে নিয়ে সুখে রাস করতে লাগল।

লক্ষ্য করার বিষয়—স্বপ্নের সমাপ্তি হলেও এ গল্পে প্রত্যাবর্তন নেই।

স্বপ্নের পরিবর্তে শীত নাম দেখে সহসা মনে হতে পারে গল্পটিতে<sup>১</sup> নাম বদল হয়ে গেছে। শীতা-রাম ও রাম-লক্ষণ এ দু-জোড়া নাম থেকে একটির প্রথম ও অপরটির শেষ নাম নেওয়া হয়েছে। এ অস্বাভাবিক বসন্ত নয়। তবে তার চেয়েও লক্ষ্যতর অস্বাভাবিক হলো যে, গল্পটিতে আসলে শীতা নামই ছিল এবং সে ছিল লক্ষণের বোন। পাট-হাতির পিঠে চড়ে শীত শাস্তভাবে সবকিছু মেনে নিয়েছিল। তাতে তার নারীত্বই বোঝায়। ভাইয়ের সঙ্গে মিলনের পর তারা যে বাপের কাছেই কিরে যায়নি সে ব্যাপারও এই সম্পর্কে লক্ষণীয়। শীতাকে পাট-হাতি তুলে এনে রানী করে দিয়েছিল বাপারটি শীতাহরণেরই মতো।

ছড়াই শীত-লক্ষণের গল্প পাস বাংলা দেশে আরও কিছু বিকৃতি লাভ করেছে পাত্র নামে। ‘শীত’ স্বাভাবিক ভাবেই সাধারণ অর্থে গৃহীত হয়েছে, প্রথমে ‘শ্বেত’ ও পরে ‘শীত’ বলে, এবং শীত শীত হওয়ার পর তেমনি অনিবার্য কারণে ‘লক্ষণ’ হয়েছে বসন্ত। অন্যথা গল্প প্রায় একই রয়ে গেছে। তবে কিছু ঘুরপাক খেয়ে।

গল্পটির একটি বাংলা রূপান্তর আছে দক্ষিণাবঙ্গন মিত্র মজুমদারের বইয়ে। তাঁর ‘ঠাকুরমার ঝুলি’ (১৯০৭) থেকে বাংলা গল্পটির সার উদ্ধৃত করি।

এক রাজার দুই রানী। বড়ো রানী দুয়ো। তার দুটি ছেলে,—সুস্থ, সুখী, সবল। ছোট রানী সুয়ো। তার তিন ছেলে—রোগা, কুখী, দুর্বল। ছোট রানী তুচ্ছ করে বড়ো রানীকে পাখি করে দিলে আর ছেলে দুটিকে মেয়ে ফেলবার জন্য বনে পাঠিয়ে। জন্মদে ছেলে দুটিকে বনে ছেড়ে দিয়ে এল। তাদের নাম শীত ও বসন্ত। তুচ্ছ কাতর শীতের জন্য বসন্ত জল আনতে গেছে, এমন সময় এক রাজ্যের পাট হাতি শীতকে তুলে নিয়ে সেই দেশের রাজধানীতে গিয়ে রাজার শূন্য সিংহাসনে তাকে বসিয়ে দিলে। বসন্ত কিরে এসে আর শীতকে দেখতে পেল না। তার পর বসন্ত এক মূনির সেবকরূপে বনেই রয়ে গেল। শীত-বসন্তর মা পাখি হয়ে এক রাজকন্যার মাথায় ঠাঁই পেল। সেই রাজকন্যা অবিবাহিত।

পাখির প্ররোচনার রাজকন্যা জেদ ধরলে, যে তাকে গজমোতি এনে দেবে তাকেই সে বিয়ে করবে। এই কথা বসন্তর কানে গেল। সে মূনির কাছে তার জিশুল চেয়ে নিয়ে সেই জিশুলের সাহায্যে গজমোতি লাভ করলে। গজমোতি পেয়ে রাজকন্যা খুশি হয়ে বখন পাখির পরিচর্যা করছিল তখন তার মাখার মধ্যে লতীন যে বড়ি টিপে নিয়ে ডুক করেছিল তা খসে পড়ে, আর ছুরোরানী তাঁর স্বমূর্তি কিরে পান। যা তাঁর হু ছেলে কিরে পেলেন। বসন্তর সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হল।

এ গল্পে দুটি কাহিনীর জোড় আছে। উপক্রমে নীত-বসন্তর কাহিনী। বনে তাদের ছাড়াছাড়ি পর্বন্ত। বাকি অংশ বলতে গেলে মূল গল্প, ছুরোরানী, বসন্ত ও রাজকন্যার কাহিনী। শেষকালে জোড়াতালি করে দুটি গল্প মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রথম কাহিনী সাঁওতাল গল্পটির একটি সংক্ষিপ্ত রূপান্তর। মূল গল্পে ছিল রাজসন্তান ভগিনী-ভাই, নীতা ও লক্ষণ। সাঁওতালি (এবং বাংলা) গল্পে তারা দু'ভাই হয়। নীতা হয় “নীত”। বাংলার স্বাভাবিকভাবেই “নীত” হয়েছে “শীত”। অনাথা নামটি অর্থহীন ও অসমঞ্জস হয়। এখন মনে হতে পারে রাম কেন লক্ষণ হলেন? এ নাম পরিবর্তনের হেতু কি? সে হেতুর সন্ধানে গেলে আমরা রাম-কথার এক প্রাক্করূপে পৌছব। এ প্রাক্করূপে দু'ভাইয়ের বদলে ছিল ভাইবোন। (তুলনীয়: জাতক গল্পের বীজে পাই দু'ভাই এক বোন।) বোনের নাম ছিল নীতা এবং ভাইয়ের নাম ছিল লক্ষণ, অর্থাৎ হুলক্ষণ, লক্ষ্যপুরুষ। অর্থাৎ নীতা-লক্ষণ মানে ছিল চাব-চাবী। পরে “রাম” অর্থাৎ বিজ্ঞান, শান্তি বৃদ্ধ হল লক্ষণের সঙ্গে। (এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য জৈন রাম-কথা। এখানে রামের তুলনায় লক্ষণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে।) সাঁওতাল গল্পে যেমন তেমনি বাংলা গল্পের মূলও “লক্ষণ” নাম ছিল। নীত “শীত” হওয়াতে লক্ষণ স্বাভাবিক ভাবেই “বসন্ত” হয়েছে। মূল এখানে ‘রাম’ থাকলে যদি তা বদলাত তবে দু-অক্ষরের অন্য নাম হত, যেমন—“জাড়”, “মাধ” বা অমনি কিছু।

সাঁওতাল বাংলা গল্প দুটির মধ্যে রাম-কথার এমন এক প্রাক্কৃতন রূপ পাওয়া গেল যেখানে পাত্রপাত্রী দুজন মাত্র, এবং তারা ছিল ভাই-বোন।

বাংলা গল্পটির দ্বিতীয় আখ্যানে রাম-কথার সঙ্গে মিল রাখার অন্তর্ভুক্ত চেষ্টা



হয়েছে বলে মনে হয়। হুয়োরাবীর তিন ছেলে করে মোট সংখ্যা পাঁচ রাখবার চেষ্টা হয়েছে, রাম-লক্ষণ-ভরত-শত্রুঘ্ন ও সীতা।

### ছয়

প্রথম কাহিনী উড়ো বীজ সঙ্গবেদকেও এড়িয়ে যায় নি। দশম মণ্ডলের তৃতীয় স্তম্ভের তৃতীয় স্লোকে এর আভাস পেয়েছি।

ভদ্রো ভদ্রা সচমান আগাং

অলারং জারো অতোতি পচাং।

সুপ্রকেতৈব্ দ্যুতিব্ অগ্নিব্ বিতিষ্ঠন্

রুশদ্ভিব্ বর্ধৈব্ অতি রামন্ অহাং।

‘শ্রীমান্ পুরুষ এলেন শ্রীমতী নারীর সঙ্গে। প্রেমিক ভগিনীর পিছনে পিছনে আসছে। সমুজ্জ্বল দ্যুতি নিয়ে স্থির হয়ে অগ্নি জ্যোতির্ময় আভার রামকে বিদায় দিলেন।’

এখানে ভদ্র=রামভদ্র, ভদ্রা=সীতা, অলারং=সীতা, জার=লক্ষণ, অগ্নি—দশরথ। তা ছাড়া ‘রাম’ কথাটিও রয়েছে। আমার অল্পমানে এখানে প্রথম কাহিনীর একটি ছবি উঠেছে।

### সাত

প্রথম কথার বিষয়: বনবাস অথবা নির্বাসন। প্রতিনায়ক নেই।

দ্বিতীয় কথার বিষয়: পত্নী অপহরণ—উদ্ধার। এই কাহিনীর বিস্তৃতি ও বিচিত্রতা সমধিক। প্রথম কথার প্রতিনায়ক বলতে প্রত্যেকে কেউ নেই। নায়কের বিরুদ্ধতা সবই ভূমিকায় ঘটে গেছে। দ্বিতীয় কথার প্রতিনায়ক মায়ারী তপস্বী অথবা দানব। নায়ককে জয়লাভ করবার জন্য ত্রিবিধ শক্তির সাহায্য নিতে হয়—হুলশক্তি, জলশক্তি ও অন্তরীক শক্তি। বিভিন্ন উড়ো বীজে ঘটনার বিজ্ঞতা সত্ত্বেও নায়কের শক্তি ও প্রতিনায়কের শক্তি ব্যাপারে মিল দেখা যায়। এ কথার উপক্রমে অধিকাংশ উড়ো বীজে নায়কেরা তিন তাই পাওয়া যায়, তাদের তিন ভগিনীপতি। এরাই পরে সাহায্য করেছিল। রাজার ছেলেরা সবাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে ছিল পিতার প্ররোচনায়। নায়ক পত্নী সংগ্রহ করেছিলেন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে।

দ্বিতীয় কথার প্রতিনায়কই ঘটনাবলীর নিয়ন্তা।

দ্বিতীয় কথার বহু উড়ো বীজ পাওয়া গেছে। তার মধ্যে অনেকটা একই ধরনের উড়ো বীজের সাতটি গল্প এখানে বলছি। একটি গল্প বাংলা দেশের ( তবে ইংরেজী অনুবাদে পাওয়া )<sup>১</sup>, একটি সার্বিক-লিথুয়ানিয়, একটি হাঙ্গেরিয় ও তুর্কি, একটি আলবানিয়, একটি আইরিশ ও দুটি রুশিয়।

প্রথমে বাংলা গল্পটির বখাষধ অনুবাদ দিই।

এক ধার্মিক ব্রাহ্মণের এক ছেলে আর তিন মেয়ে ছিল। সকলেই সত্যাব্য ও সুপ্রী। মরবার আগে বামুন ছেলেকে বলে গেল,—‘দার-তার সঙ্গে বোনদের বিয়ে দিও না। যে-সে মেয়েকেও তুমি বিয়ে কর’না।’ বামুনের মৃত্যুর পর বছর খানেক কাটল। মেয়েরা সুন্দরী বলে ইতিমধ্যে তাদের অনেক সম্বন্ধ এল। সবই সাধারণ ঘরের বলে তাদের প্রত্যাখ্যান করা হ’ল। একদিন হঠাৎ প্রবল ঝড় উঠল। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড ঝুটি। ঘন ঘন বজ্রপাত। এমন সময় বামুনের ঘরে ঢুকল উজ্জলকান্তি সৌম্যমুখ এক যুবক। বিস্ময়াহত হয়ে বামুনের ছেলে আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করলে—‘কে তুমি?’ ‘ও! আমি ঝড়ের ঠাকুর’—সে বললে, ‘তোমার বড়ো বোনকে বিয়ে করে নিয়ে বাব বলে এসেছি।’

‘বেশ নিয়ে যাও ওকে। ঈশ্বর তোমাদের দুজনের মঙ্গল করুন।’—বামুনের ছেলে বললে। তারপর ঝড়ের ঠাকুর বড়ো বোনকে বিয়ে করে ঘরের চৌকটি পার হতেই যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

পরের বছর একদিন হঠাৎ দারুণ ভূমিকম্প হ’ল। স্থানে স্থানে মাটি কেটে চৌচির হ’ল। হঠাৎ এক বলবান্ হৃদয়র্শন যুবক বামুন-ছেলের ঘরে এসে ঢুকল।

‘কে তুমি?’—জানতে চাইলে বামুন-ছেলে নবাগতর কাছে, আগেকার মতোই। ‘ও! আমি ভূঁইচাল ঠাকুর। তোমার মেজো বোনকে বিয়ে করে নিয়ে যেতে এসেছি।’ বামুন-ছেলে বললে, ‘বেশ, নিয়ে যাও ওকে। ঈশ্বর তোমাদের দুজনের মঙ্গল করুন।’ তারপর ভূঁইচাল ঠাকুর মেজো বোনকে বিয়ে করে নিয়ে গিয়ে মাটির তলায় নেমে গেল।

তারপরের বছরে এল ভয়ঙ্কর বান। সমুদ্রের হাঙ্গর, কুমীর দলে দলে চরে বেড়াতে লাগল। এমন সময়ে ঘরে ঢুকল এক সাহসী বীর যুবক। তাকে

১. গল্পটি অসীচন্দ্র দত্ত তাঁর উপন্যাসের—নাম The Young Zaminder. ( ১৮৭৪ ? )—রূপে দিয়ে গেছেন ( ‘The Sevali’s Story’ )।

বিজ্ঞান। করলে বায়ুন-ছেলে আগেকার ছবারের মতোই—‘কে তুমি?’ ‘ও, আমি জল-ঠাকুর। তোমার ছোট বোনকে বিয়ে করে নিয়ে যেতে এসেছি।’ ‘বেশ নিয়ে যাও ওকে। ঈশ্বর তোমাদের দুজনের মঙ্গল করুন।’ জল-ঠাকুর বায়ুন-ছেলের ছোট বোনকে বিয়ে করে নিয়ে গিয়ে জলের মধ্যে ঢুকে গেল।

বোনেদের বিয়ে-খা হয়ে বাবার পর একদিন তার মনে ভাবনা জাগল,—‘বাবা যেমনটি বলেছিলেন তেমনি তো বোনদের বিয়ে হয়ে গেল। এখন আমি ঘর করার জন্যে অ-সাধারণ কন্যে পাই কোথায়?’ তার মনের ভাবনা খুব ফুটেও বেরল। কাছে এক গাছে এক পাখি বসেছিল। সে গুর মনের কথা শুনেতে পেলো। পাখি চমৎকার দেখতে—নানা রঙের পালকের ডানা তার। পাখি বললে, ‘বনের মধ্যখানে এক অত্যন্ত অ-সাধারণ মেয়ে দেখেছি। সে এক দানবের কন্যা। বাপ তাকে খুব ভালোবাসে। সর্বদা নজরে নজরে রেখে রক্ষা করে। মেয়েটি তোমার বোনেদের চেয়েও ভালো দেখতে। তার মুখে কথা বলে যেন জ্ঞানের মুক্তাবুঝি।’

বায়ুন-ছেলে পাখিকে বললে, ‘পাখি—তাকে পাই কি করে?’ পাখি বললে, ‘তার বাবা রাজির বেলায় চরতে যায়। যদি ভূমি সেই সময়ে তার লগ্নে দেখা ক’রে তাকে ভুলিয়ে আনতে পার তো হয়।’

বায়ুন-ছেলে সাহসী ছিল, তার মনেও বেশ উৎসাহ ছিল। সে একদিন রাজিকালে একলা বনের মধ্যে চলে গেল। ঘুরে ঘুরে সে দানব-কন্যার বাড়িতে পৌঁছল। তার লগ্নে কথাবার্তা করে শেষে বললে, ‘স্বস্তি তোমার চোখ দুটি। এসো না আমার সঙ্গে। এ নির্জন বাসে তো জীবনে কোন সুখ পাছ না। আমার সঙ্গে অস্ত্র গলে কেমন সুখে থাকব আমরা দুজনে।’

মেয়েটি বললে, ‘আমার মত খুব আছে। নির্জনে থেকে আমি তিত্তিবিরক্ত হয়ে গেছি। কেনই যে আমাকে এখানে নজর-বন্দী করে রাখা তাও তো বুঝি না। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে যে এখান থেকে পালান খুব কঠিন। সে চেষ্টায় বিপদও ডের।’—ছেলেটি উত্তর করলে, ‘তবুও আমাকে প্রাণপণে চেষ্টা করতে হবে। তোমার মতো মেরেকে পেতে হলে সব কষ্ট বিপদকে তুচ্ছ করতে হয়।’

দানব বাড়ি কেয়ার আগেই তারা পালান। কিন্তু বন পেরিয়ে যেতে পারল না। ধরা পড়ে গেল।

‘কি বাছা, ভালোবাসার মাছ খুঁটিয়ে আমার কাছ থেকে পালাবে মনে করেছ? বোকা তুমি। যা বাড়ি ফিরে। তোমার ভালোবাসার লোককে

‘আমি জল করে বাচ্ছি’ এই বলে দানব বামুন-ছেলেকে আটে-পুটে বেঁধে—বনের সব থেকে উচু গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে দিলে—বাতে করে পেঁচা ও অন্যান্য পক্ষী তাকে হুক করে মেয়ে কেলে। কিন্তু ঝড়-ঠাকুর তাকে দেখতে পেয়ে প্রচণ্ড ঝড় তুলে মাটিতে নামিয়ে আনে আর নির্বিঘ্নে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়।

রাত্রিতে বামুন-ছেলের ভালো ঘুম হল না। সে মেয়েটির কথাই ভাবতে লাগল। মনে মনে ঠিক করলে—আবার চেষ্টা করবে তাকে উদ্ধার করে আনবার জন্যে। সেদিন রাত্তিরে সে আবার বনে গেল। তাকে দেখে দানবের মেয়ে খুশি হয়ে স্বাগত করে তার গলা জড়িয়ে ধরে রইল বিয়ের মালার মতো।

তারপর সে বললে, ‘কেন তুমি আবার এলে? তুমি কি আমার বাবার নিষ্ঠুর শক্তির পরিচয় পাওনি?’ বামুন-ছেলে বললে, ‘তোমার মতো রক্ত পেতে হলে—এমন সাহস না করলে হবে না। চল আবার পালাই। এবার হয়ত এড়াতে পারব।’ মেয়েটি বললে, ‘তুমি বলছ। চল বাই। কিন্তু আমার মন বলছে, আমরা এবারও ধরা পড়ব আর তুমি আরও নিষ্ঠুর শাস্তি পাবে।’

‘বা হবার হোক, চল বাই’—এই বলে সে মেয়েটিকে নিয়ে পালাল। কিন্তু এবারও দানব ফিরে আসবার আগে তারা বনের সীমানা পেরতে পারল না। ধরা পড়ল। ‘আ! আবার ছোকরা সাহস দেখাতে এসেছ! আগেকার শাস্তির কথা ভুলে গেছ। আচ্ছা এবার তোমাকে মাটিতে পুঁতেব বাতে করে আর কখনো দিনের আলো দেখতে না পাও।’ এই বলে দানব বামুন-ছেলেটিকে মেয়ে মাটিতে পুঁতে রেখে মেয়েকে নিয়ে চলে গেল।

ভূ-ইচাল-ঠাকুরের নজরে এল শালার দুর্দশা। সে মাটি কাটিয়ে গিয়ে বামুন-ছেলেকে কবর থেকে উদ্ধার করলে—আর তাকে বাড়িতে পৌঁছে দিলে।

তবুও বামুন-ছেলে দমল না। পরের দিন রাত্তিরে আবার সে বনে দানবের বাড়িতে গিয়ে হাতির হল। তাকে দেখে মেয়েটি খুশি হল বটে কিন্তু আবার বিপদের ভূঁকি নেয়ার জন্যে তাকে ভৎসনা করলে। আবার তারা পালাল। আবার ধরা পড়ল। দানব দেবতাদের অমর আত্মার দোহাই দিয়ে বললে,

‘এবার তোকে আমি জলে কেলে দিচ্ছি। দেখি কি করে উদ্ধার পাস।’ এই বলে সে—বামুন-ছেলেকে পাকড়ে ধরে এত জোরে ছুঁড়ে দিলে যে সে বন থেকে একেবারে সমুদ্রের জলে গিয়ে পড়ল।

জল-ঠাকুর সতর্ক ছিল। সে চেউ ঠেলে ঠেলে তাকে ভাতার তুলে কেলেলে।

তারপর নির্বিঘ্নে বাড়ি পৌঁছে দিলে। বনের মতো মেয়ে পেয়ে তাকে বিয়ে করার প্রচেষ্টা তিন তিনবার ব্যর্থ হওয়ার বামুনের ছেলে মৃদুড়ে পড়ল। তার পর গাছে নেই পাখিকে দেখতে পেয়ে বললে, ‘পাখি ভাই, তুমি তো আমাকে বিয়ের পাখীর সন্ধান দিয়েছিলে। এখন বল না কি করে তাকে পাই।’

পাখি বললে, ‘ভাই, তুমিতো বামুনের ছেলে। আমার মতো তুচ্ছ প্রাণীর কাছে এমন ব্যাপারে পরামর্শ চাইছ। এক কাজ কর। এক ঘটি গন্ধাজল আর কিছু তুলসী পাতা সঙ্গে নিয়ে বেও এবার। তোমার বৌকে নিয়ে পালিয়ে আসবার সময়ে পিছনে গন্ধাজল ছিটোতে ছিটোতে আর তুলসীপাতা বিছোতে বিছোতে এস। কোন দানব তা ভিড়িয়ে এলে তোমাদের ধরতে পারবে না।’

বামুনের ছেলে আবার বনে দানবের বাড়ি গেল, পাখির উপদেশ মত ঘটি ভরে গন্ধাজল ও লাভি ভরে তুলসী পাতা নিয়ে।

বামুনের ছেলেকে দেখে মেয়েটি যেমন হাসিখুশি হল তেমনি তার প্রাণের আশংকা করে ভীতও হ’ল। সে বললে, ‘কেন তুমি আবার এলে? এবার বাবা তোমাকে প্রাণে বাঁচতে দেবে না।’ ছেলেটি বললে, ‘বা হবার তা হোক। তোমাকে না পেলে বেঁচে আমার স্ত্রী কী? এস, তাড়াতাড়ি পালাই। এবারে ব্যবস্থা করেছি। তোমার বাবা আর নাগাল পাবে না।’ আগেকার মতোই তারা পালাল। বামুন-ছেলে পিছনে গন্ধাজল ছিটোতে আর তুলসী পাতা বিছোতে লাগল। দানব তাদের ধরি ধরি করেও ধরতে পারল না। গন্ধাজল আর তুলসী পাতার আটকে পড়ে গেল। সে ছুঁহাতে মাথার চুল ছিঁড়ে চোঁচাতে লাগল।

বাড়িতে এসে তাদের বিবাহ-অনুষ্ঠান নিশ্চয় হল। ছুঁজনে স্ত্রী ঘর করতে লাগল। দানবের মেয়ে ভালো বামুন-গিন্নী হয়েছিল।

রাম-কথার সঙ্গে মেলাতে গেল,—বামুন কতর্দী=দশরথ। বামুন-ছেলে=রাম।

দানব-কন্যা=সীতা। দানব=বান্দুকি (অথবা রাবণ)।

পাখি=কটাবু, লম্পাতি।

কড়-ঠাকুর=হুয়ান। জল-ঠাকুর=সমুদ্র। ভুঁইচাল-ঠাকুরের ইঙ্গিত রয়েছে খোটানী রামকথার। সীতা-বিবাহেই কাহিনী শেষ।

গন্ধকথাটিতে যে ভাববোধ পরানো হয়েছে তা লহজই বোকা যায়। গন্ধাজল ও তুলসী-পাতা যথাক্রমে—অলঙ্কার নদীর ও বনের আবির্ভাবের হিম্মতময়

রূপান্তর। গল্পটির সঙ্গে আরও কয়েকটি গল্পের অন্তর্ভুক্তির গভীর মিল আছে। সে গল্পগুলি মিলেছে নানা দেশে নানা ভাষায়।

পার্বীর গল্প ‘বাল চেলিক’ উপরের বাংলা গল্পের রূপভেদের মতো। গল্পটি সংক্ষেপে বলছি। এক রাজার তিন ছেলে, তিন মেয়ে। রাজা যারা ধাবার সময় বলে বান যে যারা মেয়েদের বিয়ে করতে প্রথম আসবে তাদের সঙ্গেই যেন বিয়ে দেওয়া হয়। পরপর তিনজন বিবাহার্থী এল। তিনজন শক্তিশালী অজ্ঞাত পুরুষ। (একজন ড্রাগনদের রাজা, একজন বাজ-পাখিদের ( Hawk ) রাজা, আর একজন ঈগল পাখিদের রাজা)। বড়ো ছুভাই তাদের ফিরিয়ে দিচ্ছিল। ছোট ভাই ভেদ করে বিয়ে ঘটিয়ে দেয়। বিয়ে করেই তারা পত্নীদের নিয়ে অন্তর্ধান করে।

বড়ো ছুভাইয়েরও বিয়ে হল। তারপর তিনভাই বেরোল বোনদের খোঁজ নিতে। পথে রাজিতে আলো না থাকায় ছোটভাই আলো খুঁজতে গিয়ে পড়ে এক রাক্ষসের দলে। তাদের মেয়ে কেলে। অবশেষে সে পৌঁছয় এক নির্জন রাজপুরীতে। সেখানে রাজা আর রাজকন্যা ছাড়া কেউ নেই, সবাই রাক্ষসের পেটে গেছে। ঘুমন্ত রাজকন্যাকে সে সাপের কানড় থেকে বাঁচায়। রাজা তার সঙ্গে সেই ছোট ভাইয়ের বিয়ে দেন। একবার রাজা প্রাসাদ ছেড়ে বাইরে বান। একটি ঘর ছাড়া সব ঘরে জামাইকে প্রবেশ অধিকার দিয়ে রাজা তাকে চাবির তোড়া দিয়ে বান। কোতূহল বশে জামাই সেই নিবিড় ঘরটি খোলে। দেখে ঘরের মাঝখানে আটে-পিঠে শিকলে বাঁধা একটা লোক ঝুলছে। তার সামনে আছে সোনার গামলা-ভর্তি জল। লোকটা তৃষ্ণায় ছটকট করছে। রাজার জামাইকে দেখে সে জল চাইলে। জামাই এক মগ জল দিলে। আবার জল চাইলে। আরও এক মগ দিলে। সে বললে, ‘আমাকে যে এই দুবার জল দিলে তাতে ভূমি দুবার প্রাণ কিরে পাবে।’ তারপর বললে, ‘আর একমগ জল আমার গায়ে ঢেলে দাও।’ তা দিতেই লোকটার শিকল সব পটুশুই করে ছিঁড়ে গেল। ঘর থেকে সে ঝড়ের মত উড়ে বেরিয়ে গেল। ছোট মেয়ে রাজকন্যাকেও নিয়ে গেল। সে হল চেলিক।

স্বামী বেরল পত্নীর অবশেষে। একে একে গেল তিন বোনের কাছে। বোনাইরা তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। তারপর সন্ধান করে সে পৌঁছল এক পর্বতগুহার মুখে। সেখানে পত্নীর দেখা গেল। দুজনে পালাল। চেলিক তাড়া করে এসে রাজকন্যাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। এই রকম আরও একবার

হল। তিনবারের বার চেলিক রাজকুমারকে হত্যা করে রাজকন্যাকে নিয়ে চলে যায়।

ভগিনীপতিরা জর্ডন নদীর পবিত্র জল এনে রাজপুত্রকে বাঁচায়। তারপর তাদের পরামর্শ অনুসারে রাজপুত্র রাজকন্যার মারকত চেলিকের প্রাণবন্ত কী ও কোথায় তা জেনে নেয়। হুদুদ দেশে পাহাড়ের উপরে এক বহুঙ্গনী শিরাল আছে। তার কৃৎসিণের মধ্যে বাঁচা আছে। সেই বাঁচার এক পাখি আছে। সেই পাখিই চেলিকের প্রাণ। রাজপুত্র অসাধ্য সাধন করলে। পাখিটাকে মারতেই চেলিক মরে গেল। ভগিনীপতিরা শালা ও তার পত্নীকে বখাছানে পৌঁছে দিলে।

এই গল্পে ছোট রাজকুমার=রামের স্থানে লক্ষ্মণ, রাজা=দশরথ, রাজকন্যা=সীতা, রাজকন্যার পিতা=জনক+বান্দীকি, চেলিক=রাবণ, ভগিনীপতিরা=বানর ও হুয়ান। জর্ডনের জল=বিশল্যকরণী।

উপরে বলা সার্বিক গল্পটির প্রায় ঘন পাঠ্যান্তর রূপে একটি গল্প পাই তুর্কি ও হাৎকেরিয় ভাষায়। গল্পটির নাম ‘কড় দানব’। গল্পটি সংক্ষেপে বলি।

(বাংলা গল্পটির সঙ্গেও মিল আছে গোড়ার দিকে অনেকখানি পর্যন্ত।)

এক রাজার তিন ছেলে, তিন মেয়ে। যুতাকাল আসন্ন হলে পর রাজা বলে গেলেন, যে ছেলে সারা রাজি ধরে তাঁর কবরে পাহারা আগতে পারবে সে-ই রাজ্যভাগ পাবে আর যে ব্যক্তির কন্যাদের বিবাহার্থী হয়ে প্রথম আসবে তাদেরই মেয়ে দিতে হবে। রাজার যুত্বা হল। তাঁর বড়ো ছেলে কবরে পাহারা দিতে গেল। মাত্র রাত হতেই অন্ধকারের মধ্যে সে চীৎকার শুনে পেল। তাই শুনেই সে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। তার পরের রাজিতে যেকো ছেলে গেল। তার দশাও সেরকম হল। তার পরের রাজিতে ছোট ছেলে গেল। সে অন্ধকারের মধ্যে থেকে থেকে ভীষণ চীৎকার শুনেও জ্বর পেল না। তার কোমরে ছোরা বাঁধা ছিল। সে নিভর্যে এগিয়ে চলল চীৎকার যে দিক থেকে আসছিল সে দিকে। কিছুদূর গিয়ে সে এক বিরাট ভীষণ মূর্তি জীব (Dragon) দেখতে পেল। ড্রাগনকে সে বধ করলে। তারপর সে আলোর খোঁজে এগিয়ে চলল। একটু পরে সে এক ঘরের কাছে এল, সেখান থেকে একটু আলো আসছিল। সে দেখলে এক বৃদ্ধো কালো সাধা দুটো হুতোর গুটি নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। কালো গুটিটা সে গুটোচ্ছে আর সাধা গুটিটা গড়িয়ে বাচ্ছে। ছোট রাজকুমার তাকে

জিজ্ঞাসা করলে, ‘ও তুমি কি করছ বাবা?’ সে বললে, ‘আমার কাজ করছি, রাত ওঠোচ্ছি, দিন খুলছি।’ এই শুনে রাজকুমার তাকে এমন করে বেঁধে ফেললে যাতে সে নৃত্যে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে না পারে। সেখান থেকে সে বেরল আলোর খোঁজে। পৌঁছিল এক রাজপ্রাসাদের উঁচু পাঁচিলের গারে। সেখানে চল্লিশজন দম্ভা বলে পাঁচিল জিভোবার পরামর্শ করছিল। দম্ভাদের সাহায্য করবার ছলে রাজকুমার তাদের একে একে সব কেটে ফেললে। তারপর উপরে গিয়ে বন্ধ দরজা খুলে তিন ঘরে তিন অপূর্ব স্তম্ভরী মেয়ে দুমুছে দেখতে পেল। শেষের ঘরের মেয়েটি সবথেকে স্তম্ভরী, আর তার ঘর খাত্তুর পাতে আগাগোড়া মোড়া ছিল। সে ঘরের দরজায় সে ছোরা মারলে। তারপর ছোট রাজকুমার প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল। কিরে গিয়ে বুড়োর বীধন খুলে মিলে আর যে ড্রাগনটাকে মেরেছিল তার নাক কান কেটে নিয়ে পকেটে ভরলে। তারপর বাড়ি কিরে এল। দেখলে বড় ভাই সিংহাসন অধিকার করেছে।

কিছুদিন পরে এক সিংহ এল বড়ো রাজকুমারীকে বিয়ে করতে। বড়ো ভাই রাজি হয়নি, ছোট ভাইয়ের কথায় বিয়ে হল। তারপরে এল মেজো কুমারীকে বিয়ে করতে এক বাঘ। তার সঙ্গেও বিয়ে হল ছোটরাজকুমারের কথায়। তেমনি করে ছোট-রাজকুমারীর বিয়ে হল পাখির সঙ্গে। সে পাখি যে-সে নয়, পাখিদের রাজা—‘সবুজ-অঙ্ক’ (Emerald Anka)।

যে রাজবাড়িতে চল্লিশজন দম্ভা হানা দিতে গিয়েছিল তার রাজা সকালে উঠে কাটা লাপ ও পাঁচিলের ধারে কাটা দম্ভাদের তুণ দেখে অবাক হয়ে গেল। তারপর রাজা এক বিরাট ভোজের আয়োজন করে চারদিকে খবর পাঠিয়ে দিলে। তার ধারণা, যে ব্যক্তি তার মেয়ের ঘরের দরজায় ছোরা গেঁথে গেছে সেই তাদের উদ্ধারকর্তা এবং সে এই ভোজে আসবে। তিন রাজপুত্র ভাইয়েরা এশেছিল। ছোট রাজপুত্রের কোমরে খালি ছুরির খাপ দেখে তাকে রাজা উদ্ধারকর্তা বলে বুঝতে পারলে। তাকে পুরস্কার দিতে গেলে সে তার ছোট মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলে। রাজা বললেন,—সে তো সন্তান নয়। ও মেয়ের উপর বড়-দানব নজর দিয়েছে। তাই তাকে খাত্তুর পাতে মোড়া ঘরে রাখা হয়েছে। তবুও রাজকুমার ভেদ করতে লাগল। অবশেষে বিয়ে হল। অপর দুই রাজকন্যার বিয়ে দেওয়া হল বড়ো দু-ভাইয়ের সঙ্গে। তারা বিয়ে করে বৌ নিয়ে বাড়ি চলে গেল। ছোট রইল স্বস্তর-বাড়িতে।



ছোট রাজকুমার একদিন অলক্ষণের জন্য শিকার করতে বেরল। সেই অবসরে ঝড়-দানব এসে তার বোকে উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। তারপর ছোটরাজকুমার বেরল পত্নীর খোঁজে। তার দেখা ও মিলন হল তার ভিন বোন ও তাদের স্বামীর সঙ্গে। ছোট বোনের স্বামী পাখিদের রাজা রাজপুত্রকে ঝড়-দানবের প্রাণাধের লক্ষ্যন বলে দিলে।

ঝড়-দানব চলিশদিন করে একটানা ঘুমোয়। তার ঘুমোবার সময়ে রাজকুমার গিয়ে পত্নীকে উদ্ধার করে নিয়ে চলল। ঘুম থেকে উঠে দানব তাদের ধাপসা করলে আর ছোট-রাজকুমারকে হত্যা করে মেয়েটিকে আবার নিয়ে এল। বাবার আগে মেয়েটি স্বামীর হাড়গোড় কুড়িয়ে খলি বোকাই করে তারা যে ঘোড়ায় আসছিল তার শিঠের উপর চাপিয়ে দিলে। সে ঘোড়া এসে পৌঁছল পরীদের রাজ্য পাখির প্রাণাধে। পরীদের রাজ্য স্বর্গোদ্যান থেকে জল আনিয়ে তা ছিটিয়ে রাজকুমারকে জীবিত করলে।

রাজকুমার আবার পত্নীকে উদ্ধার করে আনতে চলল। পরীর রাজ্য তাকে বলেছিল—সে বেন পত্নীকে নিয়ে ঝড়-দানবের মর্ম (talisman) কী ও কোথায় তা ভেবে নেয়। নইলে তাকে (ঝড়-দানবকে) পরাজিত করা যাবে না। স্বামীর কথামত মেয়েটি ঝড়-দানবকে তুলিয়ে তার মর্মরহস্য ভেদে নিলে। ছ সাগর পেরিয়ে সাত সাগর। সে সাগরে এক বড়ো দ্বীপ। সে দ্বীপে চরে এক বাঁড়। সেই বাঁড়ের পেটে এক সোনার বাঁচা। তার মধ্যে আছে এক লাশা ঘুঘু। সেই ঘুঘুই ঝড়-দানবের মর্মবস্ত। সে দ্বীপে পৌঁছবার উপায়ও ঝড়-দানবের কথার জানা গেল।

রাজকুমার সাতসাগরের দ্বীপে পৌঁছল। সেখানে বাঁড়কে মেরে বাঁচা শুদ্ধ পাখি নিয়ে এলো ঝড়-দানবের প্রাণাধে। তারপর পাখিকে মেরে ফেললে। তারপর পত্নীকে নিয়ে স্বপ্নরালয়ে প্রত্যাবর্তন করলে।

গল্পটির নায়ক রাজার লতাসহ ছোটছেলে—রামকথার লক্ষণ। রাজ্যলাভের জন্যে পরীক্ষা ও বিবাহ জনকতনয়ার বিবাহের মতো।

প্রতিনায়ক নামেও বা কাজেও তাই। আগেকার আইরিশ গল্পের মতো বৈদিক দেবতার পূজ্য বায়ু-বাতের অস্থর রূপ। “বোবা ইন্ অল্য শ্বিরে ন রূশব্” অর্থাৎ ‘এর ইক শোনা যায়, রূশ দেখা যায় না’। মর্মস্থানের উল্লেখ পাখির গল্পটির সঙ্গে ও মিশ্রাণী রামকথার সঙ্গে তুলনীয়। ঝড়-দানবের একটানা চলিশদিন, অর্থাৎ হ্রদীর্ঘকাল ধরে ঘুমিয়ে থাকা বাবণের তাই কৃতকর্পকে

শরণ করার। রাবণের মতো বড়-দানবের গুপ্ত-পুরীও লঙ্কার মতো দুর্-সাগরের মধ্যে বীশে।

নায়কের ছোট ভগিনীপতি রামকথার জটায়ু সম্পতি স্থানীয়। আর সিদ্ধ ঘোটক বাতে চড়ে নায়ক প্রতিনায়কের গুপ্তপুরীতে গিয়েছিল ও কিরে এসেছিল সে হল হনুমানের স্থানীয় অথবা শেতুবন্ধনের তুল্য। নায়কের পুনরুজ্জীবন ব্যাপারও রামকথার অঙ্গব্যাপী। গল্পটি খ্রীষ্টানের মুখে শোনা, তাই স্বর্গোদ্যানের (Eden Garden) জল এনে তাকে জীবিত করা হয়েছিল।

প্রতিনায়কের মা এ গল্পে তিন ভগিনীতে পরিণত হয়েছে। ঘরের কোণের বুড়ো বৈদিক অশ্বিনয়ের (অথবা নক্ত ও উবার) প্রতীক, এর প্রতিচ্ছবি আছে একটি রূপ গল্পে, নাম ভাস্মিলিশ ও বাবাইরাগ। তাতে বুড়োর ব্যাপারটি কালো, লাল, সাদা তিন ঘোড়ার উপর তিন বীর রূপে মিলছে।

আলবানিয়ার একটি গল্প মিলেছে বার সঙ্গে উপরের গল্পটির আংশিক, তারও উপরের গল্পটির সঙ্গে আরও বেশি মিল আছে। গল্পের নাম 'তিন ভাই আর তাদের তিন বোন'। গল্পটি বলি।

তিন ভাই ও তিন বোনের সংসার। বাপ-মা নেই। ভাইয়েরা বোনেরের বিয়ে দিলে। বড়োর হল নৃবের সঙ্গে, মেজোর চাঁদের সঙ্গে আর ছোটর দখনে বাতাসের সঙ্গে। কিছুকাল পরে ভাইয়েরা বেরল বোনেরের খবর নিতে। পথে রাজিতে তারা এক পাহাড়ের গোড়ায় বিশ্রাম নিলে। আগুন জ্বালালে। দুজন করে ঘুমতে লাগল, একজন করে পাহারায় রইল। সেখানে পড়ল তারা এক রাক্ষসীর পাহারায়। বড়ো ভাই ছিল পাহারায়, সে রাক্ষসীকে মেয়ে ফেললে। পরের দিন তারা যেখানে ডেরা করলে রাজিবেলার সেখানেও আগুন জ্বলতে দেখে রাক্ষসী এল। পাহারা দিচ্ছিল মেজো ভাই। সে রাক্ষসীকে মেয়ে ফেললে। পরের দিনও তেমনি ঘটল। সেদিন ছোট ভাই অনেক কাকুতি-মিনতি করে পাহারা দেবার তার আদায় করেছিল। যে রাক্ষসী এল তাকে সে মেয়ে ফেললে। কিন্তু হলে হবে কি, রাক্ষসীর মেজের কাপটায় তাদের আগুন নিভে গেল।

তখন ছোটভাই চলল আগুন আনতে। হাতে নিলে একটা পোড়া কাঠ। দূরে আগুন জ্বলতে দেখে সে এগিয়ে গেল। তার দেখা হল এক বুড়ীর সঙ্গে। সে বুড়ী হল দিনের আলোর মা। 'কে তুমি কোথা থেকে আসছ? কোথায়

বাবে ?—প্রশ্ন করলে তাকে ছোট ভাই। বুড়ী বললে, ‘আমি পূর্ব থেকে আসছি—উষাকে নিয়ে, তোমার সঙ্গে গল্প করার সুসন্ত আমার নেই।’

ছোট ভাই বুড়ীর হাতে হুম্বু খেয়ে বললে, ‘আইমা তোমাকে একটু সবুজ করতে হবে। একটু আমাকে সময় দাও, আমি ওই ওখানে যে আলো জ্বলছে—তার থেকে আমার এই কাঠ জালিয়ে আনি। দিন দুটে গেলে আমি আর দূর থেকে আগুন টের পাব না।’ বুড়ী তার কথায় রাগ করলে না। বললে—‘বেশ। আমি অপেক্ষা করছি।’ কিন্তু বুড়ীর কথায় সে বিশ্বাস করলে না। নিজের কোমরবন্ধ খুলে তাই দিয়ে বুড়ীকে বেঁধে দিলে এক গাছের গুঁড়ির সঙ্গে।

আগুন আনতে গিয়ে সে পড়ল ডাকাতের পাল্লায়। তার বারো জন। ছোটর শক্তির পরিচয় পেয়ে তারা সাহায্য চাইলে—রাজার ঘোড়াশাল থেকে গোড়া চুরি করবার জন্যে। শ্রাচীর পেরোবার সময় সাহায্যের অহিলার সে ডাকাতদের এক এক করে সবাইকে মেরে ফেললে। তারপর সে রাজবাড়িতে ঢুকল। উঠোনে একটা কুয়া দেখে সে কুয়ার কাছে গিয়ে কুয়ার গাঁথনির ফাঁকে তার রক্তমাখা তলোয়ার গুঁজে রেখে দিলে। তারপরে সে ফিরে এল বুড়ীর কাছে। তার বাঁধন খুলে দিলে। তারপর ভাইদের কাছে ফিরে এলে আগুন জ্বাললে।

রাজার বাড়িতে ছোটভাই ডাকাত মেরেছিল—সে বাড়িতে সকাল বেলায় হলকুল পড়ে গেল। রাজা মহাভাবনায় পড়লেন, কুয়ার পাড়ে রক্তমাখা তলোয়ার কার—? অনেক খোঁজ হল। কোথাও সন্ধান মিলল না। শেষে বড়ো রাস্তার চৌমাখার রাজা এক সরাইখানা খুললেন। সেখানে থাকা-খাওয়ার জন্য পরসাদ লাগবে না। তার বসলে আগন্তুকদের নিজের নিজের কাহিনী বলতে হবে। রাজার উদ্বেগ, এইভাবে একদিন তলোয়ারের মালিককেও চেনা ও ধরা যাবে। অবশেষে তাই ঘটল। ছোটর মুখে তার কাহিনী শুনে সরাইখানার অধ্যক্ষ রাজার কাছে নিয়ে গেল। তার সঙ্গে রাজা মেয়ের দ্বিগুণ দিলেন।

রাজার মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে জেলের কর্মীদের ছেড়ে দেওয়া হল। কিন্তু একজন বিকট কর্মীকে ছাড়া হল না। সে আধা-মাহু, আধা লোহা। তাকে ছেড়ে দেবার জন্য ছোট রাজাকে খুব অস্বস্তি করার তাকেও ছেড়ে দেওয়া হল। কিন্তু সে ছাড়া পেরেই রাজকন্যাকে নিয়ে উষাও হল। এমিকে রাজা রাগে জামাইকে কেটে ফেলে আর কি,—জামাই বিনয় করে বললে, ‘আমাকে

লোহার জুতো আর লাঠি করিয়ে দিল। আশি বছর না খুঁজেই আপনার মেয়েকে উদ্ধার করে আনব'। রাজা তাই করে দিলেন। ছোট পত্নীর খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। গেল সে একে একে তিন বোনের বাড়িতে। শেষে লন্ডান মিলল ছোট বোনের কাছে। সে পাঠালে তাইকে এক বিরাট বাজপাখির (falcon) কাছে। সে এত মোটা যে উড়তে পারে না। তার কাছে গিয়ে ছোট লন্ডান চাইলে। আখা-মাহুব আখা-লোহার বাড়িতে পত্নীর সঙ্গে দেখা হল। আখা-মাহুব আখা-লোহা জানতে পেয়ে তাকে ধরে মেয়ে রক্ত পান করে দেহটাকে বাইরে কেল দিলে। বাজপাখি তখন স্তম্ভ পর্বত থেকে লোয়ালো পাখির ছুধ এনে খাইয়ে ছোটকে বাচালে। তারপর মরণান্তিক অন্তরের তান করে রাজকন্যা আখা-মাহুব আখা-লোহার প্রাণ কোথায় তা জেনে নিলে। সে প্রাণ ছিল উলটো দিকে পাহাড়ে এক বনগুয়ারের সোনা-রুপার দাঁতের ভিতরে এক খরগোশের পেটের মধ্যে তিনটি পায়রা রূপে। ছোট সেই পাহাড়ে গিয়ে বনগুয়ার মেয়ে তার সোনা-রুপার দাঁতের মধ্যে থেকে খরগোশ বার করে তার পেট চিরে তিনটি পায়রা বার করে একে একে তাদের মুখ কেটে দিলে। অমনি আখা-মাহুব আখা-লোহা মরে গেল। বাজপাখির পিঠে চড়ে ছোটর সঙ্গে রাজকন্যা তার বাপের বাড়ি ফিরে এল।

এই গল্পেও প্রথম রাজা=দশরথ, দ্বিতীয় রাজা=জনক, ছোটরাজকুমার=লক্ষণ (রামের স্থানীয়), বাজপাখি=জটায়ু (হুম্যান)। আখা-মাহুব আখা-লোহা=রাবণ। (তিনটে পায়রার তিনমুখ কাটার মধ্যে দশগ্রীবের ইঙ্গিত আছে মনে করি)। গল্পটিতে বিশেষত্ব হল বড়ো ছ-ভাইকে খর্ব করা হয়নি। দিনের আলোর মা বুড়ীকে আমরা পরের কোন কোন গল্পে নতুন সাজে দেখব।

এখন বলি প্রথম রূপ গল্পটি। গল্পের নাম 'মারিয়া মোরোভনা'। গল্পটিতে যুগোশ্লাভ গল্পের আর এক এবং অস্তিত্ব রূপান্তর পাচ্ছি পূর্ণতর ভাবে।

ইলীল সমুদ্রের কিনারা থেকে অনেক অনেক দূরে থাকত এক রাজকুমার (Tzarevich) নাম—আলেক্সিস্ (Alexis) ও তার তিন বোন—রাজকুমারী (Tzarevna) নাম—আন্না (Anna), ওলগা (Olga) আর হেলেনা (Helena)। মা আগস্‌ই মারা গিয়েছিল, বাবা মারা বাবার সময়ে মেয়েদের তাঁর ছেলের হাতে দিয়ে বলে বান—যেন যথা সময়ে সে বোনেদের বিয়ে দেয় আর প্রথমেই যে প্রার্থী আসবে, মেয়ের অমত না হলে তারই সঙ্গে যেন বিয়ে দেওয়া হয়।

শিতার মৃত্যুর কিছুকাল পরে প্রচণ্ড বড় বজ্রা তুলে আবির্ভাব হল এক বিচিত্র জেন পাখির (Hawk)। সে ঘরে ঢুকতেই স্বন্দর পুঙ্খবহ রূপ গেল। সে আত্মাকে বিয়ে করতে চাইলে। তাদের বিয়ে হল। তারা চলে গেল। বছর খানেক পরে আবার একদিন তেমনি বড় উঠল। সেদিন এল এক বড় কালো ঈগল পাখি। সেও ঘরে ঢুকে স্বন্দর যুবক হয়ে গেল। সে গুল্মগাকে বিয়ে করে নিয়ে চলে গেল। তার পরের বছর একদিন তেমনি করে এল আর ঘরে ঢুকে মাহুব হয়ে গেল এক প্রকাণ্ড দাঁড়কাক। সে হেলেনাকে বিয়ে করে নিয়ে চলে গেল। বোনেরা চলে যেতে আলেক্সিস্ কোন রকমে একটা বছর বাড়িতে কাটিয়ে তারপর ঘোড়ার চড়ে বেরিয়ে পড়ল বোনেরের খবর নিতে। তিনদিন ঘোড়া হাঁকাবার পর সে পৌঁছল এক যুদ্ধ-ক্ষেত্রে। সেখানে অসংখ্য অস্ত্রশস্ত্র ও মৃত ঘোড়া ও সেনাই পড়ে ছিল। সেনাইদের মধ্যে একজন তখনও বেঁচেছিল। তার মুখে আলেক্সিস্ তখনল যে এই যুদ্ধ যিনি জয় করে গেছেন তাঁর নাম মারিয়া মোরেভ্‌না। তিনি তিন মায়ের মেয়ে ছ দিদিমার নাতনি, ন তাইয়ের বোন, রাজার স্বন্দরী কন্যা। এই কথা বলেই সেনাই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলে। আলেক্সিস্ এগিয়ে চলল। অবশেষে পৌঁছল সে মারিয়া মোরেভ্‌নার শিবিরে। তার লক্ষে পরিচয় হল। আলেক্সিস্‌দের ভ্রমণের কারণ জেনে নিয়ে মারিয়া তাকে কিছুকাল আতিথ্য স্বীকার করতে বললে। আলেক্সিস্ রাজী হল। তাদের মনে পরস্পরের প্রতি অস্বরাগ লক্ষ্য হল। আলেক্সিস্কে নিয়ে মারিয়া রাজপুরীতে চলে গেল। দুজনের বিবাহ হল।

একদিন মারিয়া রাজ্যের এক প্রান্তে বিহ্বাহ দেখা দিলে তাকে যেতে হল যুদ্ধ করে সে বিহ্বাহ দমন করতে। সেনাবাহিনী নিয়ে বাবার আগে মারিয়া বলে গেল,—আলেক্সিস্ যেখানে খুশি বিচরণ করতে পারে কিন্তু সে যেন মারিয়ার অন্তঃপুরে যে ঘরটিতে তাল দেওয়া আছে, তা যেন কিছুতেই না খোলে। নিষেধে কৌতূহল বাড়ায়। আলেক্সিস্ সে ঘর খুললে। দেখলে আঠেপিঠে লোহার শিকলে বাঁধা একটি লোক কাড়িকাঠ থেকে ঝুলছে। আলেক্সিস্ তার পরিচয় চাইলে সে বললে তার নাম জাহুকর কাস্‌থচ, তাকে এমন করে বেঁধে রেখে বসুণা দিচ্ছে মারিয়া মোরেভ্‌না দশ বছর ধরে। সে অত্যন্ত কাতর ভাবে বলল, ‘আমাকে একটু জল দাও। তেঁটায় ছাতি জেটে বাজে।’ আলেক্সিস্‌দের দয়া হল। সে জল ভর্তি করে জল দিলে। জাহুকর খেয়ে বললে—‘আরও এক জল দাও, তোমার বিপদে আমিও তোমার প্রাণ দোব।’

আলেকসিস্ আরও এক ভগ্ন ভঙ্গ ছিল। সে বললে,—‘আরও এক ভগ্ন ভঙ্গ দাও, আমি তোমাকে ছ-দুবার প্রাণদান করব।’ আরও এক ভগ্ন ভঙ্গ নেওয়া হল। সেটা সে চক্ চক্ করে খেতেই তার মূর্তি পালটে গেল। সে পট্ পট্ করে লোহার শিকল ছিঁড়ে ঝড়ের মতো জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল। মারিয়াকেও নিয়ে গেল। আলেকসিস্ নিজের বোকামির জন্য দুঃখ করতে লাগল। তারপর সে প্রতিজ্ঞা করে বেরোল যে মারিয়াকে উদ্ধার করবেই।

অনেক পথ ঘাবার পর তার একে একে দেখা হল তার তিন বোন ও ভগ্নিনীপতিদের সঙ্গে। বিদায় নেবার সময়ে তারা আলেকসিসের কাছে চেয়ে নিলেন স্মারক হিসাবে তার রূপের চামচে কাঁটা আর নস্ত্রির ভিবে। তারপর অনেকদূর গিয়ে সে কাস্‌ৎচের বাড়ি পৌঁছল। সে বাড়িতে ছিল না। বাগানে মারিয়ার দেখা পেল। তাকে নিয়ে ঘোড়ার চেপে পালাল। মারিয়ার পলায়ন বার্তা কাস্‌ৎচের ঘোড়া জানিয়ে দিলে। তখন সে ধাওয়া করে এসে মারিয়াকে কেড়ে নিয়ে গেল। আলেকসিস্কে প্রাণে মারলে না। এইরূপ আরও একবার হল। সে আবারও আলেকসিস্কে ছেড়ে দিলে। তৃতীয় বার সে আলেকসিসের ঘোড়া কেটে ফেললে আর তাকে পিণের পুরে লোহার গজাল মেরে সমুদ্রে ফেলে দিলে। তাইয়ের এই বিপদ সঙ্গে সঙ্গে বোন ও বোনাইদের গোচর হল। তাদের কাছে আলেকসিস্ যে রূপের চামচে কাঁটা ও কোটো দিয়েছিল তা কালো হয়ে গেল। বোনাইরা তখন ছুটল। সমুদ্র থেকে পিণে তুলে এনে আলেকসিস্কে উদ্ধার করলে। সে তার কথা সব জানালে।

তারপর পরামর্শ-সভা বলল। কাক বোনাই বললে, কাস্‌ৎচের মতো ঘোড়া না পেলে মারিয়াকে উদ্ধার করা বাবে না। আলেকসিসের এখন কর্তব্য হচ্ছে মারিয়াকে দিয়ে কাস্‌ৎচের ঘোড়া কোথা থেকে পাওয়া যায় তা জেনে নেওয়া। আলেকসিস্ আবার গেল মারিয়ার কাছে। মারিয়া কাস্‌ৎচকে তুলিয়ে তার ঘোড়ার ইতিহাস জেনে নিলে। কাস্‌ৎচ বললে, ‘নীল সমুদ্রের তীরে এক মাঠ আছে, সেখানে ঘুরে বেড়ায় এক বিচিত্র মাদী ঘোড়া। বারো জন সর্বদা তার জন্য ঘাস কাটছে। সে ঘাস ঘোড়া সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে ফেলছে। প্রত্যেক মাসে একটা করে ছানা হয় তার। আর তা সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে ফেলে তার শিছুলাগা বারোটা নেকড়ে বাঘ। তিন বছর অন্তর সে একটা করে মাদী ছানা প্রসব করে। নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলবার আগে যদি কেউ

উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পারে তবে সেই ঘোড়া আমার ঘোড়ার জুড়ি হবে।’ কি করে যে তার ঘোড়া পেরেছিল সে গোপন কথাও মারিয়া বার করে নিলে। কালুৎচে বললে,—‘ন নর (অর্থাৎ সাতাশ) রাজ্য পেরিয়ে তিরিশ রাজ্যে আগুন নদীর ওপারে এক খুব বুড়ী ডাইনী (Baba Yaga) থাকে। সে তরুকে তরুকে থাকে, বখনি মারী ছানা হয় তখন সে তা নিয়ে আসে। সে এমনি ঘোড়া অনেক পুষছে। এক সময়ে আমি তিনদিন ঘোড়ার পরিচর্যা করেছিলুম। বুড়ী খুশি হয়ে আমাকে একটি ছোট বাচ্চা দেয়। সেই বাচ্চাই বড়ো হয়ে আমাকে কাজ দিচ্ছে।’ মারিয়া জিজ্ঞেস করলে, ‘আগুন নদী ভূমি পেরোলে কি করে?’ সে বললে, ‘আমার কাছে এক অপূর্ব ক্রমাল আছে, সেটা ভানদিক ধরে তিনবার নাড়লেই নদীর উপর এমন উঁচু পুল খাড়া হয়ে যায় যে আগুনের শিখা অতদূর পৌঁছতে পারে না।’

কালুৎচে ভূমিরে পড়লে মারিয়া আন্তে আন্তে তার বুক পকেট থেকে ক্রমালখানি নিয়ে নিলে। আলেক্সিসকে সেটি দিয়ে ঘোড়ার কথা সব বললে। সে তখন চলল আগুনের নদীর পানে। ক্রমালের গুণে নদী পেরোল সে। তিনদিন পথ হাঁটার পর সে পেটের দ্বায়ে এক পাখির ছানা ধরলে খাবে বলে। ছানাটির মায়ের প্রার্থনায় সে ছানাটিকে ছেড়ে দিলে। তারপর সে ঢুকল এক বনে। সেখানে এক মোমাছির চাক দেখতে পেয়ে সে তা ভেঙে মধু খেতে গেল। রাণী মোমাছি তাকে চাক ভাঙতে নিষেধ করল, তাহলে তার প্রজারা আর খেতে পাবে না।

আলেক্সিস চাক ভাঙলে না। বন থেকে বেরিয়ে হেঁটে হেঁটে পৌঁছল সমুদ্রতীরে। সেখানে একটা গলদা চিংড়িকে সে নিতে গেল। চিংড়ি বললে,—‘আমাকে ছেড়ে দাও। পরে আমি তোমার উপকার করব।’ সে ছেড়ে দিলে। তারপর সে ঘুরতে ঘুরতে ভোরের দিকে পৌঁছল বনের মধ্যে। দেখতে পেলে বুড়ী ডাইনীর কুঁড়েঘর। সে ঘর মুগির ঠেঙের মাথার উপর বনবন করে ঘুরছে। কুঁড়ের চারদিকে বারোটা খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে, এগারোটা খুঁটির মাথায় মড়ার খুলি বসানো। একটা খালি। কুটারের সামনে এসে আলেক্সিস বললে,—‘ছোট কুঁড়ে ছোট কুঁড়ে। ঝাড়াও খুঁটি তেমনি ভাবে যেমন তোমার বা তোমাকে যেখাছিল, বনের দিকে পিছন আর সামনের দিকে মুখ করে।’

তার দিকে দরজা করে কুঁড়ে স্থির হয়ে গেল। তখন আলেক্সিস মুগির

ঠেঁও বেয়ে উঠে কুটীরে ঢুকল। দেখলে বুড়ী তুঙ্গুরের উপর শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। আলেক্সিস্ বুড়ীকে জাগালে,—‘আইমা ভালো থাকো’—বলে। ‘রাজকুমার তুমি ভাল থাক। কেন আমার কাছে এলেছ? নিজের ইচ্ছার, না কাছে পড়ে?’—বুড়ী বললে! আলেক্সিস্ বললে—‘ছুকারণেট, আমি এসেছি তোমার সিন্ধুঘোটক চরাবার কাজ করতে। মাইনে নেব একটি ঘোড়ার ছানা।’ বুড়ী ডাইনী বললে,—‘বেশ, আমার কাছে বারোমাস কাজ কেউ করে না। তিন দিন করে। তুমি যদি ভালো করে কাজ কর তবে বোরের উপযুক্ত বাহন ঘোড়া পাবে। কিন্তু ঘোড়া যদি একটিও হারায় তবে তোমার মাথা ওই খালি খুঁটির উপরে চড়াব।’

কাজের ভার নিয়ে আলেক্সিস্ ঘেঁই আড়গড়ার গেট খুলে দিলে অমনি সব ঘোড়া নেত্র নাড়তে নাড়তে চারদিকে উধাও হল। তখন হতাস রাজকুমারের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। কান্দতে কান্দতে সে মাটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। যখন নৃধ ডুবু ডুবু তখন তার ঘুম ভেঙে গেল এক পাখির ঠোঁটের যুহু আঘাতে। এ সেই পাখি যার ছানাকে সে ছেড়ে দিয়েছিল। পাখি বললে, ‘দেখ গিয়ে সব ঘোড়া আড়গড়ায় আটক রয়েছে।’ সে যেতে যেতে শুনতে পেল, বুড়ী ডাইনী তার ঘোড়াদের বন্ধে,—‘কেন তোরা আমার কথা শুনলি না?’ ঘোড়ারা উত্তর দিলে,—‘কি করব, বিস্তর পাখি এসে আমাদের চোখে ঠোকর মারতে মারতে আড়গড়াতে সোঁদিয়ে দিলে।’ তখন বুড়া বলল দিলে,—‘কাল তোমরা বনের মধ্যে ঢুকে নিরুদ্দেশ হ’য়ো।’

পরের দিন ছাড়া পেতেই ঘোড়াগুলো বনের মধ্যে ঢুকে উধাও হল। আগেকার দিনের মতো আলেক্সিস্ও কান্দতে কান্দতে ঘুমিয়ে পড়ল। সন্ধ্যার আগে তার ঘুম ভাঙল একটা বড়ো মৌমাছি। মৌমাছি বললে,—‘আড়গড়ায় দেখোগে। তোমার ঘোড়া সব ঠিক আছে।’ পরের দিন বুড়ীর নির্দেশ মতো সব ঘোড়া কাঁপ দিলে সমুদ্রে। সেদিন চিংড়ী মাছেরা দাঁড়ার চোটে সব ঘোড়া সমুদ্র থেকে বেদিয়ে এনে আড়গড়ায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। যে গলদা চিংড়ীকে আলেক্সিস্ ছেড়ে দিয়েছিল সে তাকে এই পরামর্শ দিলে,—‘তুমি আজও কুটীরে দেখবে এক কোণে একটা ছোট ন্যাংলা খোঁড়া বাজা আছে। ঠিক যখন রাত দুপুর হবে তখন তার পিঠে চড়ে পালিয়ে যেয়ো।’ তাই করলে সে। বুড়ী ডাইনী ধাওয়া করলে। আলেক্সিস্ ক্রমাল ডানদিকে



নেড়ে সাঁকো তুলে পেরিয়ে এল। তারপর সে কামাল বাঁদিকে নেড়ে বিলে ছুবার। তাতে সাঁকো খুব লম্বীর্ণ হয়ে গেল। ভাইনী বুড়ী পেরোতে গেলে ভেঙে পড়ল। বুড়ী আগুনে পুড়ে মারা গেল। আলেক্সিস্ বারোদিন ধরে স্মরণের সময় লব্ধ মাঠে ঘাস বাঁধ্যালে পর ঘোড়া তৈরি হয়ে গেল।

সেই ঘোড়ার চড়ে সে কান্‌ৎচের গ্রামাণ্ডে গিয়ে মারিয়াকে তুলে নিয়ে বাড়ির দিকে চলে। কান্‌ৎচকে তার ঘোড়া সব ব্যাপার জানিয়ে দিতে সেও ধাওয়া করলে। আলেক্সিসের নাগাল পেয়ে এখন তাকে কাটবার জন্য তলোয়ার উঠিয়েছে, তখন আলেক্সিসের ঘোড়া কান্‌ৎচের ঘোড়াকে চিনতে পেয়ে বলে উঠল, ‘দাদা দাদা, করছ কী? এই বদমাইয়েলটার এখনও দাপস করছ? দাঁও একে পিঠ থেকে ফেলে পায়ে করে মাড়িয়ে।’ ঘোড়া তাই করলে। কান্‌ৎচে কোনরকমে হামাগুড়ি দিয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালো। আলেক্সিস্ কান্‌ৎচের ঘোড়ায় উঠল। মারিয়া আলেক্সিসের ঘোড়ার চড়ল। মারিয়াকে নিয়ে আলেক্সিস্ বোন ও বোনাইদের সঙ্গে একে একে দেখা করে শেষে নিজের বাড়িতে এসে রাজত্ব করতে লাগল।

এই গল্পের বিশেষত্ব,—রাজকুমার (একজন মাত্র)=রাম, রাজকন্যা মারিয়া=সীতা (কিন্তু বীর নারী। বিবাহ স্বয়ংবরেরই মতো), কান্‌ৎচে=বান্ধীকি-রাবণ (আইরিশ গল্পের ড্রইন), আগুনের নদীতে পুলা=সমুদ্রে সেতুবন্ধন। বনের বুড়ী=আগের গল্পের দিনের আলোর মা।

কান্‌ৎচে শেষ পর্যন্ত মরেনি। কোন কোন রামকথায় রাবণও মরেনি।

নীচের গল্পকথাটিতে রামকথার অর্থও পূর্বচ্ছবি আছে।

গল্পটি পুরোন আইরিশ বীর-গাথায়—‘লawn দ্যারিগ ও ভীষণ উপত্যকার মহাবীর’। (‘Lawn Dyarrig and the Knight of Terrible Valley’)।

একদা এক রাজা ছিলেন এরিন দেশে। তিনি যুগ্ম করিতে গিয়েছিলেন। একজন মহাবীরের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। তার মাথা টুপি ফুটে বেরিয়ে পড়েছে, তার কছই আর হাঁটু পোশাকের থেকে বেরিয়ে পড়েছে। আর তার পায়ের আঙুল জুতো থেকে বেরিয়ে আছে। লোকটি এগিয়ে এসে রাজার মুখে এক ছুঁি লাগালে। রাজার তিনটি দাঁত খসে পড়ল। রাজার মাথা কাদার লুটোপুটি হল। রাজা বাড়ি ফিরে মনের দুখে বিছানা আজর করলেন।

রাজার তিন ছেলে। নাম তাদের উর (Ur), আর্থার (Arthur) ও লawn (Lawn=কেন্দ্র?) দ্যারিগ (Lawn Dyarrig)। তারা পাঠশালা থেকে

বাড়ি এসে বিকেলে ওনলে বাবা বিছানা নিয়েছেন। তারা বাপের কাছে গেল। রাজা তাদের সব কথা বলে জিজ্ঞাসা করলেন,—সেই লোকটির সঙ্গে দেখা হলে তারা কী করবে। বড়ো বললে, ‘তার দেখা যদি পাই, আমি তাকে চারটে ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে দিয়ে চার খণ্ড করব।’ রাজা খুশি হয়ে বললেন,—‘তুমি আমার ছেলে বটে।’

মেজো বললে, ‘যদি তাকে ধরতে পারি তবে আমি তার চারদিকে আগুন জালিয়ে তাকে পুড়িয়ে মারব।’ রাজা উৎফুল্ল হয়ে বললেন—‘তুমি আমার ছেলে বটে।’

ছোট বললে—‘যদি তাকে খুঁজে পাই তবে আমি তার সঙ্গে বখালাখা লড়ব। হয়ত সে আমার সামনে বেশিজন দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না।’ রাজা বললেন,—‘তুমি আমার পুত্র নও। তোমার জন্য আমি আর অর্থ-ব্যয় করব না। তুমি কালই এখান থেকে দূর হয়ো।’

পরের দিন বড়ো ছ’ভাই বেরোল সেই লোকটার অন্বেষণে। রাজবাড়ি থেকে বিভাড়িত ছোট ভাই তাদের কাছে এসে বললে,—‘তোমরা বড়োলোকের বেটা হয়ে সঙ্গে চাকর না নিয়ে যাচ্ছ, তা ভালো দেখাবে না।’ বড়ো ভাইয়ের ইচ্ছা ছিল না, মেজো ভাইয়ের নির্দেশে ছোট ভাই চাকর হয়ে সঙ্গে চলল।

সমস্তদিন পথে চলে তারা দিনের শেষে একটা বাড়ি দেখতে পেল। সে বাড়িতে আছে শুধু এক বুড়ী। তিনভাইকে অতিথি পেয়ে বুড়ী বড়ো দুজনকে করমর্দন করে স্বাগত জানালে। ছোটকে সে, এরিনের রাজার ছেলে বলে, ‘এস-এস’ বলে চুমু খেলে। বড়ো ভাই এ ব্যাপার লক্ষ্য করে বললে, ‘এ কী রকম হল। ছোটটাকে এত খাতির।’ বুড়ী বললে, ‘সে কথা শুনে কাজ নেই, তাতে তোমার মরণ।’ সকাল বেলায় খাওয়ার-দাওয়ার পর—বিদায় নেবার সময় এলে বুড়ী বড়োকে পর্ষটনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে বড়ো ভাই সব কথা বলে বললে,—‘আমি সেই লোকটাকে খুঁজছি জীবিত অথবা মৃত।’

বুড়ী বললে,—‘সে তো ভীষণ উপত্যকার শ্যাম বীর। সেই তো তোমার বাপের দাঁত ভেঙেছিল। এখানে আমি তিনশ বছর ধরে বাস করছি। প্রত্যেক বছর দেখেছি তিনশ জন তরুণ বীর বোঝা এখান দিয়ে গেছে কিন্তু তাদের একটিকেও ফিরে আসতে দেখিনি ভীষণ উপত্যকা থেকে।’ মেজো ভাইকে জিজ্ঞাসা করার সেও বললে,—‘বড়ো ভাইয়ের মতো আমিও যাচ্ছি।’ ছোট ভাইকে জিজ্ঞাসা করার সে বললে,—‘আমি ওদের চাকর হয়ে যাচ্ছি।’

তারপরে বুড়ী উরকে উদ্দেশ্য করে বললে,—‘একবছর একদিন হল, আমার মেয়ে আভা খোলা জানালার ধারে বসে সেলাই করছিলো। এক খুব ভালো জামাজোড়া পরা মহাবীর (Champion) সেখান দিয়ে বাবার সমর আমার মেয়েকে দেখে তার কোমরবন্ধে আঙুল ঢুকিয়ে তাকে নিয়ে উধাও হয়েছে। তার বাবা পিছনে পিছনে ধাওয়া করেছিল। আজ পর্যন্ত মেয়ের বা মেয়ের বাপের খবর পাইনি। সে ব্যক্তি হল ভীষণ উপত্যাকার শ্যাম বীর। তার মতো বীর পৃথিবীতে নেই, আমার কথা শোন, বাড়ি কিরে যাও বাপের কাছে।’

বড়ো রাজপুত্র উর বুড়ীর কথায় কর্ণপাত করলেনা। সব কুন্সে বুড়ী ছোটকে বললে, ‘ও ঘরে যাও, কাপড়-চোপড় পর আর এক গালা তলোয়ারের তলায় সে পুরোন তলোয়ারটা আছে তা নাও।’ সে কাপড়চোপড় পরলে। তলোয়ারটা ঠুকতেই তা থেকে সাতমণ মরচে করে পড়ল। তারপর বুড়ী তাকে বললে,—‘এগিয়ে পড়ো। একটু এগিয়ে ঘোড়াশাল পাবে। তার থেকে রোগা সাদা ঘোড়াটি বেছে নিও। তোমার ভাইয়েদেরও তোমার পিছনে চাপিয়ে নিয়ো। তবে আমার মতে গুনের সঙ্গে না নেওয়াই ভালো।’ সে কিন্তু ভাইয়েদের ঘোড়ায় তুলে নিলে। বুড়ী বলেছিল ঘোড়া দিয়ে আসবে একেবারে পৃথিবীর পূর্বভাগে। ছোট এক সাদা মাঠে গিয়ে থামবে। সেখানে তাদের নামতে হবে। আর ঘোড়ার সামনের খুরের তলায় ঘাসের চাপড়াটুকু কেটে নিতে হবে। ভাই করা হল। ঘাসের চাপড়াটুকু তুলে নিতেই তলায় দেখা গেল ভীষণ উপত্যাকা। তলায় নামবার জন্য ঝুড়ি বুনতে ও দড়ি পাকাতো হল। সে কাজ একরকম ছোটই করলে। নামবার বেলায় বড়ো বললে, ‘আমি আগ্নে।’ কিন্তু খানিকটা নামতেই সে আর নামতে রাজি হল না। তাকে টেনে তোলা হল। তারপর মেজোর পালা। সেও একটু নেমে কিরে এল। শেষে ছোট গেল। সে পৌঁছল ভীষণ উপত্যাকায়। এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে সে সাত শ ঘোড়াকে দেখতে পেল। তাদের সে সেই তলোয়ার দিয়ে কেটে ফেললে। তারপর আর একদল ঘোড়া। তাদেরও সে লাভাভ করলে। তারপর সে এল এক করণার ধারে। করণার জল খেয়ে ছোট বিশ্রাম করতে চাইলে। সে গুরে পড়ে ঘুমিয়ে গেল। ভ্রাম বীরের প্রাসাদ থেকে বশ্বিনী নারীর ঝি এসে ঘুমন্ত জনকে দেখে তার মনিবকে জানালে। মহিলা দৌড়ে এল। সে জানত যে এমনি করে করণার ধারেই সে জন দ্যাবুরিগের দেখা পাবে। জনকে সে উঠিয়ে নিয়ে প্রাসাদে গেল।

মহিলা লনকে আশ্বপরিচয় দিয়ে এই কথা বললে, যে ভ্রাম বীর তাকে হরণ করে এনে বিয়ে করতে চাইলে সে সাত বছর একদিনের মূলত্ববি কড়ার করিয়ে নিয়েছে। এর পরে সে বিয়ে করবে। তবে ইতিমধ্যে তাকে বীরের পরিচর্যা করতে হবে। বীর পাখি শিকারে যায় তিন দিন ধরে। আর বাড়িতে থাকে তিন দিন ধরে। তার ফেরবার সময় হয়ে এসেছে।

বীর বাড়ি ফিরল। মহিলা তার টেবিলে খাবার দিয়ে এল। খেতে খেতে সে লগনের ব্যাপার সব শুনলে। শুনেই রেগে গিয়ে সে তিনশ বোঝা পাঠালে লগনকে ধরে আনতে। সে তার কলকে যত্নসব উপড়ে ধাবে। তাদের সকলের হাতপা কেটে কেলে লুপাকার করলে লগন। তারপর আবার তিনশ করে বোঝা পাঠালে বীর। তাদেরও সব সেই একই দশা হল।

তারপর দু জনে বন্দবুদ্দ। মহিলা লগনকে সাবধান কর দিলে,—‘যদি যুদ্ধের প্রজ্ঞদণ্ডে বীর প্রথমে আঘাত করে, তবে সে জিতবে সেদিন। তুমি যদি প্রথমে আঘাত কর তাহলে তুমি জন্মী হতে পারবে,—যদি আবার কথামতো কাজ কর। ভ্রাম বীর অনেক মায়াজানে। সে যদি বোঝে যে যুদ্ধের গতিক ভালো নয় তখন সে কুয়াশার মতো উবে যাবে। আর সেই ভাবে নেমে এসে তোমাকে আঘাত করবে আর তুমি হয়ে যাবে সবুজ পাথর। সকালে যখন তুমি তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবে তখন এক গ্রন্থ লম্বা ঘাসের চাপড়া তুমি ঈশ্বরের নাম করে কেটে নিয়ে তুমি যে ছোট পাথর প্রথমে দেখবে তার উপর রেখে দিও। যখন বীর তোমাকে আক্রমণ করতে আসবে তখন তুমি সেই চাপড়া দিয়ে বৃকের ডান দিকে তাকে মেরো। সে তখনই সবুজ পাথর হয়ে যাবে।’

তাঁই হল। লগন মহিলাকে উপরে উঠিয়ে দিলে, মেয়েটিকে দেখে উর (বড়ো তাই) লুক হল। সে মনে মনে ভাবলে,—উপরে যে এসেছে সে উপরে থাক আর নীচে যে আছে সে নীচেই থাক। এই বলে লগনকে না তুলে মেয়েটিকে নিয়ে বাড়ি চলে গেল। পথে সে একটা মরা ঘোড়ার মুখ থেকে তিনটে দাঁত খসিয়ে নিয়ে গেল বাবার দাঁত বলে দেখাবে বলে।

এদিকে লগন ঘুরতে ঘুরতে এক বালকের দেখা পেলে,—নাম তার খাটো-কাপড় (খাটো কাপড় পরা, তাই)। তাকে লগন ভীষণ উপত্যকা থেকে বেরোবার পথ জিজ্ঞাসা করলে সে উচ্ছতভাবে উত্তর করলে। তখন লগন তার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে তাকে শায়িত্তা করলে।

সে উপর দেখিয়ে দিলে, বলে, ‘ওই যে লাগামটা আছে ওটাকে নাড়ালেট

যে ক্ষণ আসবে তার যুখে লাগিয়ে দিবে। সে তোমাকে বাইরে নিয়ে যাবে।' লাগামে নাড়া নিতেই একটা ছোট নোংরা ঘোড়ার ছানা হাজির হল। তাতে চড়ে লগুন দেশে ফিরে এল।

সে রাজবাড়িতে গেল না। গেল এক তাঁতের বাড়িতে। সেখানে সে শুনে যে রাজার বড়ো ছেলের বিয়ে, তাঁতদের রাজবাড়িতে নেমন্তন্ন। সেও তাঁতদের সঙ্গে গেল আর তাদের অনেক খাবার দেওয়ারে। তাই শুনে বড়ো তাই বেরিয়ে এল তাকে তাড়িয়ে দিতে, কেননা সে অত খাবার বিলোচ্ছে। তার সঙ্গে যেয়েটিও বেরিয়ে এল, সে লগুনকে চিনতে পারলে না। তখন লগুন কৌশলে তার কাছে তার দেওয়া আংটি পৌছে দিতে সে লগুনকে চিনতে পারলে। লগুন বাপের দাঁত শ্যাম বীরের পকেটে পেয়ে তা নিয়ে এসেছিল। এখন বাপের যুখে পরিয়ে দিতেই মাড়ির সঙ্গে ছোড় লেগে গেল। লগুনের সঙ্গে মহিলার বিবাহ সকলে স্বীকার করে নিলে।

তারপর পুত্রবধূ অর্থাৎ লগুনের পত্নী তার শাশুড়ীকে উপহার দিলে একটি কোমরবন্ধ। বললে, 'এখন আপনাকে পরতে হবে।' রানী তা পরলে। তারপর বৌ শাশুড়ীকে প্রশ্ন করলে, 'উর কার বেটা?' রানী উত্তর দিলে, 'কেন, উর এরিনের রাজার বেটা।' শুনে বৌ কোমরবন্ধকে বললে, 'কবে এঁটে ধরো।' কোমরবন্ধের আট্টুনিতে রানী মারা পড়বার যোগাড় হল। রানী স্বীকার করতে বাধ্য হল যে উর গুয়ের চরায় সে তার বেটা। তারপর প্রশ্ন হল, 'লগুন কার বেটা?' রানী বললে, 'রাজার বেটা।' বৌ কোমরবন্ধকে কবে ধরতে বললে—কিন্তু কোমরবন্ধ তেমনই রইল। আঁট হল না। রাজা তখন লগুনকে পুত্র বলে স্বীকার করে তাকে অর্ধরাজ্য দান করলে আর উর ও আর্ধ্যকে লগুনের চাকর করে দিলে।

গল্পটিতে রামকথার ছায়া নজরে পড়বার মতো নয়। তবে মিল কিছু কিছু আছে। সে মিল আকস্মিক হতে পারে। উৎসগতও হতে পারে। সে মিল পাই কোন কোন চরিত্রের গঠনে। নায়ক যিনি তিনি রামকথার রাম নন, লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণের প্রাণনা ও প্রাধান্য জৈন রামকথার লক্ষ্য করা যায়। যতদূর যেন হয় তাতে বোধ হয় খোঁটানী ভাষার প্রাপ্ত এক কাহিনীতে সীতাকে নিয়ে রামলক্ষ্মণের বিরোধের কথা আছে। যেন হচ্ছে সে কাহিনীতে রাবণ আর লক্ষ্মণ যেন এক হয়ে গেছে। রামকথার যে প্রাচীন রূপটিতে 'লক্ষ্মণ' নামটি (মানে ভাগ্যবান, স্তুত্বাৎ শ্রীর অধিকারী) গৃহীত হয়েছিল সে

কাহিনীতে এই আইরিশ গল্পের মতো রাজার কনিষ্ঠ পুত্রই ছিল নায়ক। ভারতবর্ষীয় রামকথায় রামলঙ্ঘনের স্বপ্নের কথা মুছে কেলে তাদের সৌজাত্যকেই উজ্জ্বল করে দেখানো হয়েছে। স্ববর্ষীয় রামকথার লঙ্ঘন বড়ো ভাই।

প্রতিনায়ক শ্যাম বীর ( Green Knight ) গল্পের শুরুতে যেন পরশুরামের মতো আচরণ করেছে। খোটানী রামকথা কাব্যে দশরথের মৃত্যু ঘটেছিল— পরশুরামের হাতে। এ গল্পে ঘটেছে দাঙ্গা লাঞ্ছনা। তারপর তার আচরণ ঝড়-দানবের মতো। বেদে সীতাকে পর্জনা-পত্নী বলা হয়েছে। সে কথা আগে আলোচনা করেছি। গল্পের শ্যাম মহাবীর বেদের পর্জনা ( বায়ু ও বাত ) দেবতা অশ্বর ( অর্থাৎ দানব ) রূপে প্রতিকলিত। পর্জনা পৃথিবীকে শস্য-শ্যাম করে দেয়, তাই মহাবীরকে নাম করা হয়েছে শ্যাম বা সবুজ বলে। ঘাসের চাপড়া যেন দেবতার প্রতীক এবং তৃকৃ। তাই এর আঘাতেই দানব মারা পড়ল ( অথবা বশীকৃত হল )। কোথাও মহাবীরের আকৃতির বর্ণনা নেই, তার প্রচণ্ডতার ও উদ্ভাসতার উল্লেখ আছে। এও বেদে পর্জনা-বায়ুর উল্লেখের মতো ( যেমন, একজনের বেগ অসুভব করা যায়, রূপ দেখা যায় না। ঋগ্বেদ ১,১৬৪-৪৪ )। মহাবীরের বিক্রম ভয়ঙ্কর, বেদে বলেছে— “বিশ্বং বিভাঙ্গ ভুবনং মহাবধাৎ।”

লগ্নকে ধরে বা মেয়ে নিয়ে আসতে বীর বার বার বোঝা পাঠিয়েছিল। বেদে বলেছে,—পর্জন্য তাঁর দূতদের পাঠিয়ে দেন। মহাবীরের ভয়ঙ্কর উপত্যকার পৌছতে লগ্নকে নামতে হয়েছিল ঝুড়ি ( basket ) করে ঝুলে। বেদে পর্জন্যের দান নেমে আসে মশকক উল্টে। গল্পে মহাবীর বৃড়ীর মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছিল। সে মেয়ে তখন খোলা জানলার ধারে বলে সেলাই করছিল; ঋগ্বেদে বায়ুর সখকে বলা হয়েছে,—

ভূভাস্ উবাসঃ শুচরপরাবতি

ভদ্রা বজ্রা তথ্যতে দংশু রগ্নিশু

( অর্থাৎ, দূরদেশে দীপ্ত উবারা শোভন বিচিত্র কাপড় বুনে নতুন চমৎকার স্বতো দিয়ে )।

নায়িকা মেয়েটির সঙ্গে উবার মিল দেখা গেল। এ মিল আরও স্পষ্ট হয় লগ্নের সম্পর্কে। ( গল্পটির আদিম রূপে মেজ ভাই কোন ছিল না। প্রচলিত অন্য এক ধরনের গল্পের সঙ্গে মিল করতে গিয়েই মেঝো ভাইয়ের কল্পনা করতে হয়েছে। আসলে কাহিনীর মধ্যে মেঝো ভাইয়ের কাজ কিছু নেই। )

উর, লগুন ও মেরেটি, রাম লক্ষণ ও সীতার মতোই, দু'ভাই অর্থাৎ, নাগত্য ও দত্ত, এবং উবার প্রতিচ্ছবি। নাগত্য হল উর, দত্ত হল—লগুন, বুড়ী হল দেবমাতা বেলে অদিতি—উবার মা। ষাটো-কাগড় ছোকরার সঙ্গে রামকথার বানরের মিল খুবই স্পষ্ট। হনুমান যেমন সীতার সন্ধান এনেছিল,—এও তেমনি ভয়ঙ্কর উপত্যাকা থেকে লগুনের নির্গমনের উপায় দেখিয়ে দিয়েছিল।

অজুরাবিনময় ঘটনাটিও রামকথা মনে পড়ায়। এক রামকথা জাতকে পাই যে কৌশল্যার মৃত্যুর পরে হনুমান তাঁর এক বিলাস-সঙ্গিনীকে মহিষী করেছিলেন। এই গল্পের রানীর মধ্যে কৌশল্যা ও বিলাস-সঙ্গিনী মিলে গেছে।

রামকথায় সত্যিও পরীক্ষা হয়েছিল—বধূর, এ গল্পে—হয়েছে শান্তডীর।

উপরের আলোচনা থেকে মনে হয় যে গল্পটিতে রামকথার ভ্রণাবস্থার ইচ্ছা মিলেছে। তা যদি হয় তবে এটি রামকথার প্রাক-ইতিহাসের প্রথম সাক্ষী।

দ্বিতীয় ভ্রণ গল্পটিতে সীতাহরণ থেকে সাতা পরিত্যাগ পর্যন্ত রামকথার প্রতিবিম্ব আছে। এতে নায়ক রাজপুত্র নয়, সাধারণ সৈনিক যুবক। তবে নায়িকা রাজকুমারী বটে। গল্পটির নাম—দৈব বনকল ('The Magic Berries')।

রাজা, রানী ও তাদের স্ত্রীকন্যা। একদিন ঘাটে এক জাহাজ এসে লাগল। ধনী কোন বণিক এলেছে বাণিজ্য করতে। তার জাহাজের ঐশ্বর্য দেখে লোকের তাক লেগে গেল,—সকলে ছুটল জাহাজ দেখতে। রাজকন্যাও জেদ খরল বাবে বলে। সেও গেল। তাকে দেখে বণিক জাহাজে আহ্বান করে আনলে—ভিতরের ঐশ্বর্য দেখাতে। রাজকুমারী জাহাজে পা দিতেই তাকে এক কামরার পুরে জাহাজ ছেড়ে দিলে। তবু তবু করে জাহাজ চোখের বাইরে চলে গেল।

বণিক মাহুদ নয়, সে লানব। তার নাম নেমাল চেলোভেক্ (Nemal Chelovck) অর্থাৎ হেঁড়ে মাহুদ। দক্ষিণ সমুদ্রে তার জাহাজ রাজকুমারীকে নিয়ে গৌছে গেল তার রাজ্যে। সে তার ভাগ্যে বা ভাইপোর সঙ্গে বিয়ে মেবে বলে রাজকন্যাকে হরণ করে এনেছিল। তার ভাগ্যে বা ভাইপো ড্রাগন গোরিনিচ (Dragon Gorinich)। নেমাল চেলোভেক্ ছিল অত্যন্ত দুর্ধর্ষ এবং প্রায় অমর। তার মরণ নির্ধারিত ছিল 'সামপনি-কার্টা' তলোয়ারে (Samorek)।

হারানো মেয়ের জন্য রাজা খুব খোঁজাখুঁজি চালাতে লাগলেন। কিন্তু কোন খোঁজ মেলে না। এক ছোকরা সৈনিক একদিন সন্ধ্যাবেলার রাজার বাগানে এক গাছের তলায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল। হঠাৎ সে শুনে পেল তার মাথার উপরে দুটো কাক মানুষের মতো কথাবার্তা কইছে। সে কান পেতে শুনে যে তারা বলারলি করছে রাজকন্যা-হরণের কথা। তাদের কথা থেকে সে বুঝতে পারলে, কে রাজকন্যাকে হরণ করে কোথায় রেখেছে আর কি উপায়ে তাকে উদ্ধার করা যেতে পারে। পরের দিন সে রাজার কাছে এসে বললে, সে রাজকুমারীর খোঁজ আনবে। রাজা প্রথমে তার কথা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। পরে মেনে নিয়ে সব যোগাড়-যন্ত্র করে দিলেন। বৃক সৈনিকের নাম ইভান (Ivan)। সে জাহাজে করে বেরোল রাজকন্যাকে উদ্ধার করে আনতে।

কাকদের কথা অহুসারে ইভানের জাহাজ গিয়ে পড়ল সমুদ্রে, তারপর ভিড়ল সমুদ্র মধ্যে একটি ছোট দ্বীপে। সে দ্বীপে নামল। একটু গিয়ে জানতে পারলে যে দুজন বুনো ভূত পৈতৃক তলোয়ারের অধিকার নিয়ে দীর্ঘকাল তিরিশ বছর ধরে মারামারি করছে। ইভান গিয়ে তাদের মধ্যস্থ হল। সে ঠিক করে দিলে তারা দুজনে তীর ছুঁড়বে এবং যে তীর আগে কুড়িয়ে আনতে পারবে সে ঐ তলোয়ার পাবে। তারা (ভূত) তাই করলে এবং ছুটল তীর কুড়োতে। এই অবসরে ইভান তলোয়ারটি হস্তগত করে জাহাজে উঠে পলায়ন করলে।

তারপর জাহাজ এসে ঠেকল নেমাল চেলোভেকের দ্বীপে। সে দ্বীপে কোন রক্ষাবাহিনী রাখবার প্রয়োজন হয়নি। ইভান সহজেই রাজকন্যার সাক্ষাৎ পেলে। দুজনে বিবাহ-প্রতিজ্ঞা করলে। রাজকন্যা তার আংটি ইভানকে দিলে। এমন সময়ে মানুষের গন্ধ পেয়ে নেমাল চেলোভেক হড়মুড় করে এসে পড়ল। ইভান সহজেই সেই তলোয়ার দিয়ে তার মৃত্যু কেটে ফেললে। কাটা মৃত্যু কীধে পড়ে জুড়ে বাবার উপক্রম করতে ইভান মৃত্যুটাকে দূরে ছুঁড়ে দিলে। নেমাল চেলোভেক তখন মারা পড়ল। রাজকন্যাকে নিয়ে ইভান দেশে ফিরল।

রাজকন্যা ইভানকে বিবাহ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কিন্তু দেশে ফিরে তার মত বদলে গেল। তার পিতারও মত ছিল না। মেয়ের জন্য বাপ যে রাজাকে বর ঠিক করেছিল রাজকন্যা তার দিকেই খুঁকে পড়ল। কিন্তু ইভানের সঙ্গে বিয়ে ঠেকান গেল না। রাজকন্যা পানিপ্ৰার্থী রাজার সঙ্গে বড়বন্দ করে স্বামীকে



(ইতানকে) কুলিয়ে তার ‘আপনি কাটা’ তলোয়ার লুকিয়ে রেখে দিলে। তারপর সেই রাজা এসে বুদ্ধ করে ইতানকে হারিয়ে দিলে। ইতান রণক্ষেত্রে মৃত বলে পরিত্যক্ত হল।

সে কিছু মরেনি। স্বপ্ন হয়ে সে অদ্ভুতকারে গুঁড়ি ঘেঁরে গিয়ে এক জমলে লুকিয়ে রইল। মিনের বেলা খিদের চোটে হলুদ-রাঙা দুটি বন-কল খেলে। তাতে তার মাথায় দুটো শিঙ্ গজিয়ে গেল। তার মহা ভাবনা হল সে লোকালয়ে যুধ দেখাবে কি করে। বনে ঘুরতে ঘুরতে তার আবার খিদে পেল—তখন সে হলদে বন-কল না খেয়ে লালচে, বন-কল দেখতে পেয়ে তাই দুটি খেলে। খেতেই তার শিঙ্ দুটি পসে পড়ল।

তারপরের দিন সে ডালায় হলদে বন-কল শাকিয়ে নিয়ে শহরে বিক্রি করতে এলো ছদ্মবেশ ধরে। রাজকন্যা প্রাসাদের জানালা থেকে দেখে তাকে ডেকে এনে কল কিনে নিলে ও খেলে। কল দুটি খেতেই তার মাথায় শিঙ্ গজিয়ে গেল। ধোঁজ ধোঁজ ফলগুয়ালাকে। সে ততক্ষণে অন্তর্ধান করেছে। তখন রাজকন্যার শিঙ্ খসাবার জন্য ওকা-বদ্বিদের ডাকা হল। কিছু কেউই কিছু করতে পারলে না। কিছুদিন পরে ইতান অনারকম ছদ্মবেশ করে হাতের থলিতে দুটি লাল কল নিয়ে রাজার কাছে এসে বললে যে সে রাজকন্যার মাথা থেকে শিঙ্ খসিয়ে দিতে পারে। তবে তার শর্ত হল এই যে, সে আর রাজকন্যা ছাড়া ঘরে কেউই থাকবে না। আর রাজকন্যা যতই চাৎকার কান্নাকাটি করুক কেউই সে ঘরে ঢুকবে না। যখন সে আসতে বলবে তখনই লোকে ঘরে ঢুকবে ॥ তাই হল।

নির্জন ঘরে ইতান আত্মপরিচয় দিয়ে পত্নীকে খুব ভৎসনা ও নিশীড়ন করলে আর তার কাছ থেকে তলোয়ার আদায় করে নিলে। তারপর লাল বন-কল দুটি খাইয়ে তার শিঙ্ খসিয়ে দিলে।

তারপর ইতান বুদ্ধ করে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিহত করলে আর অবিধাসিনী পত্নীকে ও তার শিশু-মাতাকে তাড়িয়ে দিলে রাজত্ব করতে লাগল।

পল্লটির নায়ক রামের মতো রাজপুত্র নয়। তবে তেমনি ধনুর্ধর। নারিকী সীতার মতো রাজকন্যা তবে অশ্রুধরনের পূর্বে তার বিয়ে হয়নি। বুনো কূত ছজনকে বালী ও স্ত্রীবেশে সঙ্গে তুলনা করা যায়। অশ্রুত নারিকাকে রাখা হয়েছিল লংকার মতোই ঘোঁষে। প্রতিদ্বন্দ্বীক রাবণের মতো রাক্ষস। তার কাটা মুহূর্বে কোড়া লেগে বেত তা দশগ্রীব রাবণকেই স্মরণ করায়। নায়ক

ও নারিকার মাথার শিঙ, গজান ব্যাপারটা সীতার হরিণী রূপে ইঙ্গিত করে। নারিকার নির্বাসনে সীতা পরিত্যাগের ইঙ্গিত।

অতঃপর একটি আনাতোলীয় ( বা তুর্কি অথবা হাঙ্গেরীয় ) গল্প বলছি যার অসাধারণ বিশেষত্বের জন্য বলা যায়—গল্পটি আসলে ঐক্য-আনাতোলীয় রামায়ণ। নাম 'শাহ মেরাম্ ও সাদে স্থলতান।' ( অর্থাৎ রাজা মেরাম ও সাদে রানী )। নাম দুটির মধ্যে রাম ও সীতা নামের অভ্রান্তধ্বনি আছে। মহীরাম ও সীতা ?

এক বাদশার তিন পুত্র। বাদশা মরে গেলে পর কে রাজা হবে তা নির্ধারণ করার জন্য ছেলেরা তীর ছোড়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে। যার তীর সব চেয়ে দূরে পড়বে সেই বাদশা হবে। বড়ো দুছেলের তীর পাওয়া গেল। ছোট ছেলের তীর পাওয়া গেল না। তীর খুঁজতে খুঁজতে তিন ভাই পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। খুঁজতে খুঁজতে ছোট ভাই এসে পড়ল এক রাজবাড়ির কাছে। বাইরে পাঁচিলের কাছে চল্লিশজন দস্তা জটলা করছিল কি করে পাঁচিল ভিঙাবে বলে। ছোট ভাই তাদের সাহায্য করবার চলে একে একে সবাইকে কেটে ফেললে। প্রাসাদে ঢুকে তিন ঘরে তিন স্থানর মেয়ে ঘুমিয়ে আছে দেখলে। ছোট মেয়েটির কপাটে সে ছোরা বেঁধে বেঁধে বাড়ি চলে এল। সবই ঘটল রাতারাতি। সকালে উঠে বাদশা দেখে শুনে ঢাঁড়া পিটোলে এই মর্মে, যে দরজার কপাটে গাঁথা ছোরাটি খসাতে পারবে তারই সাথে ছোট মেয়েটির বিয়ে দেবে।

তিন ভাই এল। ছোট ভাই নিজের ছোরা খসিয়ে নিলে। তিন ভাইয়ের সাথে তিন বাদশা কন্যার বিয়ে হল। তিন জনে বউ নিয়ে বাড়িমুখে হল। এক দানব এসে ছোট ভাইয়ের কাছ হতে তার বউকে ছিনিয়ে নিল। এই দানবের অন্তর ছিল সেই চল্লিশজন বাদশার ছোট ভাই কেটে ফেলেছিল। তারা গিয়েছিল মেয়েটিকে হরণ করতে। ভাইদের দর বেঁধে বলে ছোট চলল পত্নীর খোঁজে। কিছুদূর গিয়ে এক দানব-বুড়ীর দেখা পেলে। সে হল ঐ দানবের মা। বুড়ীকে মা বলে ডাকতেই সে বুড়ী গলে গেল। তার কথা শুনে সে বললে তার বড়ো বোনের কাছে যেতে। মেজো বোনের কাছে গেলে সে বললে তার বড়ো বোনের কাছে যেতে। তার কথা শুনে দানব-বুড়ীর বড়ো বোন তাকে নির্দেশ দিলে লম্বুতীরে একটা বিশেষ স্থানে গিয়ে সেখানে চল্লিশদিন অপেক্ষা করে থাকতে। সেই সময়ের মধ্যে একটা দিনে সিদ্ধঘোটকের

(Sea horse) ছানারা ডালার উঠে। সে বেন পশমের স্ততোহুটি নিয়ে ঝাড়িয়ে থাকে আর একটা ছানা সেই স্ততো নিয়ে ধরে নিয়ে আসে। সে তাই করলে। বুড়ী গিছুঘোটকের ছানাকে চরিশদিন ধরে খাওয়ালে আর শিকা দিলে। তার পরে বললে সেই ঘোড়ার চড়ে দানবের প্রাণাদে গিয়ে তার বউকে উদ্ধার করে আনতে। ছোট ভাই বউকে উদ্ধার করে বুড়ীর বাড়ি নিয়ে এল। বুড়ী বললে,—‘এইবার বাড়ি যাও, তবে এক কাজ তাদের নিরমমাসিক করতে হবে, রোজ তাকে একটি করে মাছের ষোপাতে হবে। ব্যতিক্রম হলে সে গিয়ে তাদের স্বামী-স্ত্রীকে গিলে ফেলবে।’ রাজি হয়ে ছোট ভাই ঘরমুখে হল।

একদিন দানব-বুড়ীকে মাছের পাঠাতে ভুল হয়ে গেল। বুড়ী এলে তাদের ধরে নিয়ে গেল। অনেক কষ্টে বুড়ীর হাত থেকে ছাড়ান পেয়ে তারা ঘরে ফিরছিল, পথে এক স্থানে তারা বিশ্রাম করতে থামে। পত্নীর কোলে মাথা দিয়ে ছোট বাবশালালা ঘুমোচ্ছে—এমন সময় দানব এসে মেয়েটিকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। বিকট চীৎকারে তার ঘুম জেগে গেল। মনে হল সে চীৎকার আসছে অনতিদূরে এক কুয়ার ভিতর থেকে। একটু পরে কুয়ার মধ্যে থেকে এক পাখি উড়ে এল। সে পাখি তাকে পরীদের বাদশার কাছে নিয়ে গেল। পরীদের বাবশা বললে,—‘যেখানে চাও পাখি তোমাদের নিয়ে যাবে। যদি তোমার কোন সংকট ঘটে তখন তুমি ‘আমার শাহ’ বলে ডেকো, আমি তোমাকে উদ্ধার করব।’ পাখির পিঠে চড়ে সে উড়ে গিয়ে পত্নীকে উদ্ধার করল। দানব খাওয়া করেও তাদের নাগাল পেলো না। তারা পাখির পিঠে চড়ে পরীদের বাদশার কাছে এল। পরীদের বাবশা বললে,—‘আজ তোমাদের দুজনের নাম হল—‘শাহ মেরাম ও লাদে সুলতান।’ তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। তবে খবরদার, ভুলেও তোমাদের পুরোন নাম আর উচ্চারণ কর না।’ তারা বাড়ি করে আনন্দ-উৎসব লাগালে।

উৎসব শেষ হয়ে গেলে একদিন রাজিতে যখন দুজনে ঘুমোচ্ছে তখন দানব ছানা দিয়েছিল। মেয়েটি ‘শাহ মেরাম’ বলে ডেকে ওঠার দানব অমনি পাষণে পরিণত হয়।

তাকে বাগানে রাখা হল জলাশয়ের ধারে। একদিন তারা বাগানে বেড়াতে বেড়াতে ভুল করে নিজের পুরোন নামে ডেকে ফেলে আর অমনি পাখর কেটে দানব বেরিয়ে পড়বার উপক্রম করে। তখন নতুন নাম ডাকার পাখর যেমন ছিল তেমনই হয়ে যায়।

অনেকদিন পরে মেয়েটি স্বপ্নে দেখলে যে এক দরবেশ এলে তাকে বলছে যে তারা যদি কখনো নিজেকে নাম ( নতুন নাম ) ভুলে যায় আর দৈত্য হুযোগ পেয়ে পাথর ফেটে বেরিয়ে আসে তখন তারা যেন জলাশয় থেকে জল নিয়ে পাথরের মূর্তির মাথায় ছিটিয়ে দেয়। তাহলে তার থেকে সোনা ও মানিক স্বরবে আর তাদের কখনো দানবের উদ্ভ থাকবে না।

একদিন তাদের নামের ভুলে দানবের আবির্ভাব হল। বাদশাহাদা তাকে ছোরা নিয়ে আক্রমণ করলে তার পত্নী 'সাদে হুলতান' বলে ডেকে উঠল। অমনি দানব পাষাণে পরিণত হয়ে জলাশয়ে পড়ে গেল। আর জল সেট থেকে তার রক্তে রান্না হয়ে গেল। পরে একদিন দরবেশ দেখা দিয়ে জানিয়ে দিলে সে তার কথা অমূল্যে ঠিকমতে কাজ না করাতেই তারা পাষাণ মূর্তি থেকে সোনা মানিকের বরণাধারা আর পেলেন না। দরবেশ চলে যাবার পর সে বাগানে বাওয়া আসা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হল।

এ গল্পটিতেও রাজার তিন ছেলে, তবে মেয়ের উল্লেখ নেই। সাহায্যকারী হল পরীদের রাজা ও তার অশুচর পাখি। নায়ক ছোট ভাই। তিন ভাই বিয়ে করেছে, তিন বোনকে, যেমন সামায়ণে। পরীক্ষা তীর ছোড়ায় ও বাছবলে। প্রতিদায়ক আসলে ঝড়-দানব। ছিনিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটা প্রায় রাবণের কাজেরই মতো। দানবের দুর্গ রসাতলে।

## আট

তৃতীয় কথার বিষয় প্রথম কথার মতোই সঙ্গীর্ণ। এক রাজার পত্নী বিনা দোষে স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছিলেন। তখন তিনি সসত্তা ছিলেন। আশ্রয় পান এক মুনির কুটীরে। সেইখানেই ছুটি পুত্রের উদ্ভ দেন। মুনির কাছে শিক্ষা পেয়ে ছেলে দুটি ওস্তাদ গায়ক হয়। তাদের গান শুনে রাজা খুশি হয়ে তাদের পরিচয় জেনে তাদের পুত্র বলে গ্রহণ করেন। পত্নী অভিমানে দেহত্যাগ করেছিলেন।

কথার নায়ক মুনি যিনি বিজ্ঞ ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন।

এ গল্পের উদ্ভা বীজ বেশী মেলেনী। কিন্তু যে দু একটি মিলেছে তাতে এ গল্পের মূল যে খুব পুরানো তা বলতে হয়।

প্রথমে আইরিশ সাগার গল্পটি বলি।<sup>১</sup> — 'ওইসিনের মা'।

<sup>১</sup> Irish Sagas and Folk-tales, translate by Eileen O' Erolin, Oxford Universite Press.

একদিন বীর কিন্নু দুটি গোষ, কুকুর নিয়ে শিকার করতে গিয়ে এক অপূর্ব সুগন্ধি ফেন্ডে পায়। তাড়া করায় সে হরিণী এমিক-ওমিক ঘুরে ফিরে শেষে কিন্ননেরই দুর্গে ঢুকে পড়ে। কিন্নু তা জানতে পারে নি। রাজ্যবেলায় হরিণী খুব স্তম্ভরী নারী হয়ে কিন্ননের কাছে এসে নিজের পরিচয় দেয়। তার নাম সাবা (Sava), পরীষের মেয়ে। এক কালো ঋইদ<sup>১</sup> তাকে বিয়ে করতে চায়। সে রাজি না হওয়াতে তাকে মস্তবলে হরিণী করে দিয়েছে। ঋইদের এক শিষ্য তাকে বলে দিয়েছিল যে কিন্ননের বাড়ি ঢুকলে সে আবার তার পূর্বরূপ ফিরে পাবে। তিন বছর ধরে সে পশুরূপ ধরে আছে।

কিন্নু তাকে আশ্রয় দিলে তার পরে বিয়ে করলে। তার পর তাকে একদিন বৃদ্ধ করতে চলে যেতে হয় দুর্গ ছেড়ে। বাবার আগে কিন্নু মানা করে দিলে সাবাকে সে যেন তার স্বামীর অঙ্গপন্থিতিকালে দুর্গের বাইরে পা না বাড়ায়। কিন্তু ঋইদ তাকে তাকে ছিল। কিন্নু বাবার দুচার দিন পরেই সে কিন্ননের মূর্তি ধরে তার মতো দুটো কালো কুকুর নিয়ে দুর্গের অদূরে দেখা দিলে। তাকে দেখে কিন্নু ফিরে এসেছে মনে করে সাবা আনন্দে ছুটে বেরিয়ে যায় দুর্গ থেকে তাকে আগত জানাতে। তখন ঋইদ কবলে পেয়ে তাকে আবার হরিণী করে নিয়ে চলে যায়। কিন্ননের লোকজন সন্ধান করেও কিছু করতে পারলে না।

বৃদ্ধ জন্ম করে কিন্নু ফিরে এল। সাবার বৃদ্ধান্ত শুনে সে খুব কাতর হয়ে পড়ল। তারপর সে নিজে সাবার অঙ্গসন্ধান করতে লাগল। অঙ্গসন্ধান সাত বছর কেটে গেল। তখন সে সাবার আশা ত্যাগ করে আগেকার মতো বৃগয়া করে দিন কাটাতে লাগল। একদিন সে শিকারে গিয়ে এক গুহার কাছে একটি স্তম্ভর বালক দেখতে পেল। তার কুকুর দুটি দৌড়ে গিয়ে ছেলেটির গা চাটতে লাগল। কিন্নু ছেলেটিকে বাড়ি নিয়ে এল। তাকে নিজের ছেলের মতো মাল্টি করতে লাগল। ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করা হল, তার মা-বাবা কে? তা-সে জানে না। জানে এইটুকু মাত্র, যে তাকে পালন করত সে এক হরিণী। মাঝে মাঝে একটা কালো লোক এসে হরিণীকে মারধর করত। শেষবারে এসে সে হরিণীর সঙ্গে অনেক বকাবকি করে তারপর একটা কাঠের ডাঙা দিয়ে মেয়ে তাকে জোর করে ধরে নিয়ে কোথায় গেছে। বাবার সময় হরিণী বারবার পিছু ফিরে তার দিকে চাইছিল। তারপর সে ঘুমিয়ে পড়ে কখনো কখনো। জেমে

উঠে সে ঘেঁষে বে সে অস্ত্র এক পাহাড় ওয়ার রয়েছে। তারপর কিন্নরের সঙ্গে তার দেখা।

হেলেনটিক কিন্ন নিজে বলে গ্রহণ করলে। তার নাম রাখলে 'ওইসিন' (Oisín, মানে যুব)। পরে সে কিন্নরের মধ্যে বড়ো বীর বলে গণ্য হয়েছিল। কবি অর্থাৎ গায়ক-কথক রূপেও তার খুব নাম হয়েছিল।

এই গল্পটির সঙ্গে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের গল্পের যোগ চট করে নজরে না পড়লেও গভীর বটে। রাম পত্নীকে হারিয়েছিলেন তবে পুত্র পেয়েছিলেন। পুত্রবয়স্ক সঙ্গীতদক্ষ ছিল এবং পরবর্তীকালে বীর বলে গণ্য হয়েছিল। ঋতু-হরিণী ব্যাপারটি দ্বিতীয় কাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। রাম কোন মন্ত্রসিদ্ধ মুনির কন্যার মনোহরণ করে বিবাহ করেছিলেন। আইরিশ গল্পের সাবার সঙ্গে কিন্নরের সম্পর্কও সেইরূপ। আর সাবার হরিণী হওয়া ব্যাপারটি আর একটি পুরোনো উড়ো বৌ ঘা বৈদিক গদ্য গ্রন্থে<sup>১</sup> মিলেছে। সে গল্পটুকু এই—

প্রজাপতি (মানে জীব-সৃষ্টিকর্তা) নিজের কন্যার প্রতি আগ্রহ হয়েছিলেন। প্রজাপতি ধরেন যুগ রূপ আর তার কন্যা ধরেন যুগী রূপ। দেবতারা দেখতে পেলেন যে প্রজাপতি অসুচিৎ কর্ষে উদ্যোগী হয়েছেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে এমন কাউকে পেলেন না যিনি প্রজাপতিকে দমন করতে সমর্থ। তখন তাঁরা করলেন কি, নিজেদের মধ্যে যারা ভীষণ ছিলেন তাঁদের একত্র সমাবেশ করলেন। সেই দেবতারা সমাবিষ্ট হয়ে এক নূতন দেবতা হলেন। তাঁর নাম হল ভূতবানু।<sup>২</sup> ভূতবানুকে দেবতারা বললেন অসুচিৎ কর্মকারী প্রজাপতিকে বাণে বিদ্ধ করতে। তিনি রাজি হলেন এই শর্তে যে তাঁকে পতনের আধিপত্য দিতে হবে। তিনি তখন গিয়ে প্রজাপতিকে শরবিদ্ধ করলেন। সেই থেকে প্রজাপতিকে বলা হয় গয় আর তাঁর কন্যাকে বলা হয় লাল গাই (বা লাল ঘোড়া)।<sup>৩</sup>

দ্বিতীয় মূল কাহিনীর সঙ্গে এ গল্পটির বেশ মিল আছে। রামকথার যারীচ কর্তৃক অপহরণ ব্যাপারে কালপুরুষ যুগশিরা নক্ষত্রের মোটিকের মিল আছে।

আইরিশ গল্পের ওইসিন হল কুশীলব (অর্থাৎ কুশ ও লব একত্র)।

১। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ ৫-৩০।

২। মানে, যে উৎপন্ন হয়েছে। অন্য ব্রাহ্মণে ইনি কয়।

৩। বৈদিক সাহিত্যে গল্পটি যুগশিরাঃ নক্ষত্রের জন্মকথারূপে উপস্থাপিত হয়েছে।  
‘অস্তারত বনবর্ষে’ বিদ্ধত রামকথার সাবণের সঙ্গে যুদ্ধে এই নক্ষত্রের উপস্থিতি দেখা  
হয়েছে।

‘অর্থবাবু যুগঃ রামোঃ কৃত্তভারাপণঃ বশাঃ ১৭৮-২০।

## নয়

রামকথার একটি অদ্ভুত রকম উড়ো বীজ মিলেছে বোনের উপকথায়। উড়ো বীজটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে তৃতীয় আখ্যানের সঙ্গে। তবে নারক রাম নন, রাবণ। আর রাবণ এখানে রামশত্রু নয়, বৈদিক গল্পের প্রজাপতির রূপান্তর। সেই সঙ্গে যোগ আছে রাবণের এবং রামের। এখন গল্পটি বলি। এটি সংগ্রহ করেছিলেন বোম্মশাস।<sup>১</sup>

এক ছিল রাজা। সে রাজ্য নাটতে, মৃগ ধূতে যেত একটা পুকুরে। সে পুকুরে একটা বড়ো মাছ ছিল। সে মাছটা রাজার মুখে খোয়া কুলকুচো থেকে খাদ্যকণা খেত। তার ফলে তার গুত্ব হল। যথাকালে মাছটা প্রসব করলে দুটি মাছবের ছেলে। ছেলে দুটি বড়ো হলে পর পুকুরের পাড়ে উঠে অপর ছেলেদের সঙ্গে খেলা করত। একদিন একটা লোক অপরিস্ফুট স্বপ্নর ছেলে দুটিকে দেখে তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। তারা বাপের নাম জানে না, তাই কিছু বলতে পারলে না। তখন ছেলে দুটিকে সে বেজম্মা ভেবে গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে খেলা করার অজুপযুক্ত বলে মারধর করে তাদের তাড়িয়ে দিলে। মাছ-মায়ের কাছে গিয়ে তারা কাঁদতে কাঁদতে সব কথা বললে আর জানতে চাইলে তাদের বাবা আছে কিনা। মাছ তখন তাদের বাপের নাম বলে দিলে—রাবণ রাজা।

তারপর দুই ভাই বেরোল বাপের খোঁজে। অনেক দূর গিয়ে একটা লোক দেখতে পেয়ে তাকে রাবণ রাজার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলে। তাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে লোকটা তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে। তারা বললে, আমরা রাবণ রাজার ছেলে। রাবণ রাজা ছিল লোকটার দেশের শত্রু। তাই সে ছেলে দুটির কথা শুনে শত্রুর ছেলে বলে কেটে ফেললে। ওদের দেহ যেখানে পড়ে রইল সেখানে গজিয়ে উঠল দুটো বাঁশ গাছ। গাছ দুটো যখন মোটা হয়েছে তখন কোথা থেকে এক বোগী এসে সে বাঁশ গাছ দুটো কেটে নিয়ে গেল। তার থেকে সে দুটো বাঁশ তৈরি করলে। সে বাঁশিতে চমৎকার সুবর্ণের গান বেরোত। যে শুনত সেই আশ্চর্য হয়ে যেত। বাঁশি-বাজিয়ে বোগী ঘুরতে ঘুরতে রাবণ রাজার দেশে এল। রাজার কানে তার খবর গেল। রাজা বোগীকে ডেকে পাঠালে। বাঁশি নিয়ে বোগী রাজার সামনে আসতেই

বাণির মধ্যে থেকে ছেলে দুটি রেহিয়ে এল। তাদের মুখে তাদের পরিচয় শেয়ে রাজা তাদের নিজের বলে গ্রহণ করলে। বোঙ্গীকে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হল।

গল্পটিকে তৃতীয় কাহিনীর সঙ্গে মেলানো গেল,—রাবণ=রাম; মাই=সীতা; বোঙ্গী=বান্দুকি; ছেলে দুটি ও বাণি=কুশ ও লব।

আহারের কলে গর্ভসংস্কারের ব্যাপার কিলিপি রামকথার আছে।<sup>২</sup> রাম-সীতার জলকেলির কলে সীতার গর্ভসংস্কারের উল্লেখ আছে মালয়ের রামকথার।<sup>৩</sup>

এখন প্রশ্ন হচ্ছে গল্পটির নায়ক রাম না হয়ে রাবণ হল কেন। ভ্রান্তিবশে রাম-রাবণ নামের বিপর্যয় ঘটেছে,—এ অসুমান খুব টেকসই নয়। রামায়ণ হরিবংশ ইত্যাদিতে রাম-সাগার (saga) মতো রাবণ-সাগাও আছে। দূর অতীত কালে যে এই দুই সাগার মধ্যে কাহিনীর অদল-বদল হয়নি তাই বা কে জোর করে বলবে। সীতা রাবণের কন্যা, সে কন্যায় আগন্তু হয়েছিল, দৈব নানারূপে সে মিলনে বাধা দিয়েছিল—এ গল্প তো বিভিন্ন রাম-কথার যথেষ্ট মিলেছে। শুধু হোমের গল্পেই নয়, দ্বীপময় ভারতেও রাম-কথা রাবণ-কথা রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। কিলিপি রাম-কথা কাব্যের নাম ‘মহারাদিয়া লাওয়ানা’ (=মহারাজা রাবণ), মালয়ের একটি প্রসিদ্ধ রাম-কথা রচনার নাম ‘হিকায়ং মহারাজা রাবণ’ (=মহারাজা রাবণের কথা)।<sup>৪</sup>

এর থেকে অসুমান করতে পারা যায় যে গোড়ার দিকে কোন কোন লৌকিক গল্প বীজে কাহিনী রাবণরাজার গল্প বলেই চালিত ছিল। রাম ছিলেন আগন্তুক রাজপুত্র, অ্যাডভেঞ্চারার। সাগা ছিল আসলে রাবণেরই। রাবণই জুইন্ড বান্দুকি। রাবণই বৈদিক গল্পের প্রজাপতি।

### দশ

মহাভারত বনপর্বে রামকথার যে বিস্তৃত বর্ণনাটির কথা আগে বলেছি, সেটিকে ‘মার্কণ্ডেয় রামায়ণ’ বলা যায়। এ কথা মার্কণ্ডেয় মুনি বলেছিলেন যুধিষ্ঠিরকে দ্রোণদী হরণের লজ্জায় তাঁকে শাস্তনা দেবার জন্যে। এ কাহিনীতে উত্তরকান্ডের সীতা পরিত্যাগের কাহিনী নেই। কুশ-লবও নেই। বান্দুকির কোন উল্লেখই নেই।

২। রাম-কথার প্রাক্ ইতিহাস পৃ: ১১ জটবা

৩। ঐ পৃ: ২২, ২৩।



এ কাহিনীর শেষ স্লোকের শেষার্ধ্বে মহাত্ম্যতে অন্য সব কথাগুলিরই মতো ।<sup>৪</sup>

অতো দেববিসংহিতঃ সবিক্তঃ গোমতীম্ অহু ।

দশাশমেখান্ আক্রেতুঃ জরথ্যান্ ন নিরুগ্ধান্ । ২০২-৭০ ।

‘তারপর (রাম) দেববির সহিত গোমতী নদীর তীরে দশ অশমেখ অহুতান করেছিল—অজস্র ভোজ্য বস্তুর আয়োজন করে ।’

### এগার

এখন রামকথার আলোচনা শেষ করছি রামায়ণ-কাব্যের বিভাগগুলির নামকরণ নিয়ে কিছু বিশ্লেষণ করে । রামায়ণ ছ কণ্ডে বিভক্ত,—বাল (আদি), অযোধ্যা, অরণ্য, সুন্দর, কিঙ্কিধ্যা ( কিঙ্কিধ্যা ) ও লঙ্কা ( বুদ্ধ ) । দুটি ছাড়া সবই স্থান-বাচক । ‘বাল’ কাণ্ড নামটির কোন ব্যাখ্যার আবশ্যক নেই, কিন্তু ‘সুন্দর’ কাণ্ডের আছে । তার আগে ‘অযোধ্যা’ ও ‘কিঙ্কিধ্যা’ ( কিঙ্কিধ্যা ) সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে ।

দশরথের রাজধানীর নাম অযোধ্যা । নামটির মানে কী । অথর্ব সংহিতায় ‘অযোধ্যা’ শব্দটি আছে, মানে “যার সঙ্গে বৃদ্ধ করা যায় না, অভের” । কিন্তু নগরের দুর্গ অথবা রক্ষীর কোন উল্লেখ নেই । তা ছাড়া নামটি ঐতিহাসিকও নয় । ইতিহাসে ও বৌদ্ধ সাহিত্যে এ নগর ‘সাকেশ’ নামেই প্রসিদ্ধ । সুতরাং নামটি রূপকথার হওয়ারই সম্ভব । তাহলে অর্থ হবে “বৃদ্ধ করবার অসম্ভব শক্তিপূর্ণ ।”

‘কিঙ্কিধ্যা’ ( কিঙ্কিধ্যা ), নামটি বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক । এ নামটি বিশুদ্ধ রূপকথার । বালী-সুগ্রীবের স্থান । আমার অনুমান হয়, নামটি এসেছে কিস্কিম্-খা ( খা ) থেকে । মানে, “কে-কাকে-চেনে” বালী-সুগ্রীবের এক চোয়ার ইচ্ছিতময় ।

‘সুন্দর’ কাণ্ডের বহু অত্যন্ত অসুন্দর,—সীতাহরণ ও রামবিলাপ । এ নামটির ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারেন নি । অথচ মানে হাতের কাছেই আছে । ‘সুন্দর’ এসেছে বৈদিক ‘সুন্দর’ থেকে, আবেষ্টীয় ‘হনর’ প্রাচীর পারসীক ‘হনরা’ আধুনিক ফারসী ‘হুজু’ । মানে দক্ষ, বিজ্ঞ, সুন্দর জ্ঞানবান্ ও শক্তিমান্ । এই অর্থ বাংলা ‘নরসুন্দর’ কথাটিতে এবং বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর সুন্দরে পাওয়া যায় । রামায়ণ কাহিনীতেও সুন্দর—সুন্দর হচ্ছে রাবণ । ( বৌদ্ধ সাহিত্যে এক সপ-দানবের নাম ‘সুন্দর’ । ) এই নামের দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, সুন্দরকাণ্ড নামটি কাহিনীর একটি প্রাচীন পূজ্য ধরে রেখেছে ।

৪ । রামকথার প্রাক্ ইতিহাস, পৃঃ ২৫-২ ঐষ্টব্য ।

## সীতাকথা প্রাচীনতর ?

রাম-সীতার কাহিনীর মধ্যে যে রূপকটু লুকিয়ে আছে তা ভারতীয় মহাকাব্যটির নারক-নারিকার নাম দুটি নিয়েই জমে উঠেছে। আমি একাধিক প্রবন্ধে বলতে চেয়েছি যে, অ-বল্ল ও অ-ব্যক্তিবাচক মূল শব্দ দুটি ভিন্নখানে ব্যক্তিবাচকতার অঙ্গুরোধগম্ব করেছিল এবং পরে তা ভারতবর্ষে রামায়ণ কাহিনীতে জমাট হয়ে যায়। বিবেচনা করে দেখলে বোঝা যায় যে, লক্ষ্মণ সীতার চরিত্রই আগে জমাট বাঁধতে শুরু করেছিল। এবং তা ঘটেছিল ভারতবর্ষে। রামচরিত্রের জমাটবাঁধন স্বতন্ত্রভাবে শুরু হয়ে গিয়েছিল প্রাচীন ইরানে। একথা আমি 'রামকথার প্রাক্ ইতিহাস' পুস্তিকাটিতে দেখিয়েছি।

ওই নিবন্ধটিতে 'রাম' নামটির (অথবা বিশেষণটির) প্রথম প্রয়োগের উদাহরণ দিয়েছিলুম ঋগ্বেদের দশমমণ্ডল থেকে একটি শ্লোক (৩.৩) উদ্ধার করে। এই শ্লোকটির অঙ্গুরোধে ও ব্যাখ্যায় একটু ত্রুটি রয়ে গিয়েছে। সে ত্রুটি এখন সংশোধন করা প্রয়োজন। আমার মনের মধ্যে তখন ঘুরছিল রামায়ণ-কাহিনীর তিনটি মূল চরিত্র—রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা। তাই আমি শ্লোকটির মধ্যে তিন ব্যক্তিকে দেখাতে চেষ্টা করেছিলুম। পরে বুঝেছি ও ব্যাখ্যায় আমার কষ্টকল্পনা ছিল। ও শ্লোকের প্রথম অর্ধে রাম-সীতা আর দ্বিতীয় অর্ধে দশরথ-রাম ছাড়া আর কোন ভূমিকা-কল্পনার স্থান নেই। শ্লোকটি এখানে অঙ্গুরোধসহ উদ্ধৃত করে দিই—

ভজো ভজরা সবমান আগাং

স্বসারং জারো অভ্যোতি পশ্যাং ।

সুপ্রকেতৈর দ্ব্যভির অগ্নির বিতিষ্ঠন

রুশদ্বিত্ব বনৈর্ব অতি রামম্ অস্বাং ॥

—'ভজ (রাম) ভজার সঙ্গে এগিয়ে চললেন। ভগিনী পিছু পিছু আসছে। সমুজ্জল জ্যোতিতে স্থির হয়ে অগ্নি (দশরথ) জ্যোতির্ময় আভায় রামের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন।'

হবিটি রামসীতার বনগমনের দৃশ্য। এর মধ্যে লক্ষ্মণকে টেনে আনা কিছু কষ্টকল্পনার ব্যাখ্যার। রামকথার কোন কোন প্রাচীন প্রসঙ্গের লক্ষ্মণ চরিত্রই নেই। রামকথার মৌলিক প্রসঙ্গে লক্ষ্মণচরিত্র অবান্তর।

রামকথার সঙ্গে উত্তরকাণ্ডের কাহিনীর কোন আলগা যোগাযোগ নেই। যেটুকু আছে তা গল্পের খেঁই জোড়বার মতো। উত্তরকাণ্ডের কাহিনী রামকথার অঙ্ক বলে স্বীকার করে নিলে একটা বড়ো সমস্যা দাঁড়ায়। সে সমস্যার দিকে কোন সমালোচকের দৃষ্টি পড়েছে বলে আমি জ্ঞাত নই। সে সমস্যা উড়িয়ে দেবার নয়।

কুশ ও লবকে যদি রাম নিজের ছেলে বলে স্বীকার করে নিলেন তা হলে তাদের কাউকে অযোধ্যার পাটে না বলিয়ে অযোধ্যাকে উদ্ধার করে প্রয়াণ করলেন কেন? কেন তিনি লব-কুশের কাউকে কাছে না রেখে তাদের অস্ত্র স্থানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন? তাঁর পিতা তো চার ছেলের বেলায় এসব ব্যবস্থা করেন নি।

তা হলে কী বুঝব কুশ-লব তাঁর সন্তান হলেও তারা রাজসিংহাসনে বসবার যোগ্য ছিলেন না? এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভারতবর্ষের কোন কোন প্রচলিত রামকথার রামের পুত্রকে বানর বলা হয়েছে। সীতাকে উদ্ধারের পর হুত্মানের সঙ্গে রামের ব্যবহার পুত্রবৎ মনে হয়। এই প্রসঙ্গে মনে করতে হয় নাম দুটির মৌলিক অর্থ। “কুশ” মানে কুশাবন, “লব” মানে কাটা, কাটারি, কাটাগুলো অথবা খণ্ড। ‘সীতা’ নামের মৌলিক অর্থের সঙ্গে এ অর্থ বেশ খাপ খায়। ছেলে দুটি যদি চাষাড়ে হয়ে থাকে তাহলে তাদের রাজা করে পৈতৃক সিংহাসনে বসানো যায় না।

‘সীতা’ নামটির আলগা অর্থ চবা ভূঁইয়ে লাঙলের রেখা বা ধরে চাষী বীজ বুনে যায়। এই অর্থ রামকথা থেকে একেবারে মুছে যায় নি। ঋগ্বেদের একটি শ্লোকে (৪.৫৭) এই সীতা নারীরূপাঙ্গিত হয়ে দেবীজ্ঞানোচিত বন্দনা পেয়েছেন (“সীতে বন্দ্যামহে স্বা”)।

উত্তরকাণ্ডে এলে সীতা ও লব-কুশের সম্বন্ধে এই কয়টি প্রশ্ন জাগে। কেন সীতাকে পরিভ্রাণ করে আসা হল? কেন বাস্তবিক—যাঁর বিশেষ দেখাদেখাৎ ইতিপূর্বে মেলেনি তিনি সীতার তত্ত্বাবধারক হয়ে গেলেন? কেন সীতা পাতাল প্রবেশ করলেন? কেন লব অথবা কুশ অযোধ্যার সিংহাসনে বসল না? প্রয়ত্ত্বগিরি উত্তর থেকেই উত্তরকাণ্ডের অতিনাস্তি সমস্তার সমাধান হবে।

প্রথম প্রশ্নের জবাব। সীতা—উর্বর কৃষিক্ষেত্র-চবা। তাতে বীজ ছড়ালেই খালান। মাঠ যেমন ছিল তেমনি থাকে। চাষী কসল করে আনে, মাঠকে নয়। হুত্মাণ চাষের পর মাঠ ছেড়ে আসা অভ্যস্ত স্বাভাবিক ব্যাপার।

দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব। মাঠ খোলা পড়ে থাকে। তার তত্ত্বাবধান করেন সেই স্থানের অধিষ্ঠাতা দেব বা দেবজন। ঋগ্বেদে এমন দেবতাকে বলা হয়েছে—“কেন্দ্রপাল পতিঃ”। পরবর্তীকালে এমন দেবতাবনা নাম পেয়েছে “কেন্দ্রপাল”। খোলা মাঠের কেন্দ্রপাল বলতে উই চিপি ছাড়া আর কী হতে পারে ? তাই অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই বাস্তবিক হয়েছেন সীতার তত্ত্বাবধায়ক।

তৃতীয় প্রশ্নের জবাব। ফসল উঠে গেলে পর জুমিতে আর লাঙলের বেগাটুকুর আভালও থাকে না। তখন কৃষিক্ত্রী সীতাদেবী মাটির তলায়, মাতা পৃথিবীর অন্তঃপুরে চলে যান। এই হল সীতার পাতাল প্রবেশের সহজ অর্থ।

চতুর্থ প্রশ্নের জবাব। কুশ আর লব শব্দটির মৌলিক অর্থ একটু আগে বলেছি। এককথা বলা যায় “কুশীলব” মানে কাটা ঘাস ( বা কাটা বাজে ফসল )। ফসলের মতো ফসল নয়, তাই তারা উত্তরাধিকারীর লম্বান লম্বান পার্শ্ব পায়নি।

এই চারটি প্রশ্নের জবাব থেকে বলা যেতে পারে যে, উত্তরকাণ্ডের গল্পটি একটি প্রিমিটিভ রূপক গল্প যার সঙ্গে রামকথার যোগাযোগ কল্পনা মোটেই আবশ্যিক নয়।

যদি কোথাও বিন্দুমাত্রও সমর্থন মেলে তবে এই অনুমান জোরদার হয়। এইবার সেই চেষ্টা করি।

বৈদিক আর্থরা ভারতবর্ষে আসবার আগে থেকেই কিছু কিছু কৃষিকার্য শিখেছিলেন। কিন্তু তাঁদের প্রধান জীবনোপায় ছিল পশুপালন। এদেশে এসে তাঁরা ধীরে ধীরে পশুপালন বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে প্রায় পুরোপুরি কৃষিজীবী হয়ে পড়েন। ঋগ্বেদের অধিকাংশ কবিতায় তাঁদের পূর্বতন বৃত্তিরই প্রতিফলন দেখা যায়। তাই তাঁদের ধরিজী মাতা পৃথিবীকে তাঁরা “অদিতি”—বন্ধনহীন গোমাতা কল্পনা করেছেন। নবীন বৃত্তির প্রতিফলন পাই পরবর্তী কালের বৈদিক সাহিত্যে, এবং দৈব্যাং ঋগ্বেদে। ( আগে দেখুন )। নবীন বৃত্তির দেবভাবনা—সীতা, সরস্বতী ইত্যাদি—বৈদিক আর্থরা বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে পেয়েছিলেন। কেননা তাঁদের জাতিগোষ্ঠী কারো ঐতিহ্যে এ দেবভাবনা নেই। ( যেটুকু আছে তা অন্তদেশ থেকে নেওয়া বলে প্রমাণিত হয়েছে। )

কোথা থেকে ভারতীয় আর্থরা এই কৃষিজাতা বাণিকভাবে পেলেন সে প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তর এখন দিতে পারা যায়।

আর্থর। এদেশে আসবার হাজার-সহস্রহাজার বছর আগে যে সিদ্ধসভাতা ছিল সে সভাতা ক্রিষ্টানিষ্ঠের ছিল বলে পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেছেন। সুতরাং এদের কাছ থেকে আমরা সীতা-কথার প্রাক-ইতিহাসের যদি ইঙ্গিত পাই তা হলে তা আমার অধ্যয়নের সমর্থক হতে পারে।

সিদ্ধসভাতার ধর্মবিবাহল অথবা ধর্মচরণ কেমন ছিল তা জানা যায়নি। তবে অনেক ছোটখাট সীল পাওয়া গেছে যাতে এমন অনেক মূর্তি আগে বা প্রকাশ্যে না থেকে ঘরোয়া ভাবে পূজা পেত বলে মনে হয়। একটি দেবতা সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নেই। ইনি যোগী নকুলীশ পশুপতির পূর্বরূপ বলে মনে হয়। এ দেবতার উদাত্ত লিঙ্গ লাঙলেরই প্রতীক। লিঙ্গ-পূজা যে সিদ্ধ-সভাতার বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। দু-চারটি সীল-মূর্তিতে দেবীর ম্যোত্তনা আছে।



### প্রথম সীল

নীচু খাটে যোগাসনে উপবিষ্ট—নকুলীশ পশুপতির মতো একটি মূর্তি, তাঁর দুপাশে ছতন উপাসক বসনা করছে। তাদের পিছনে দুটি সাপ উচুতে কথা ভুলে উপাসকদের মতো দেবীর নিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই সীল ছবিটি দেখলেই মনে পড়ে যায়—মূর্তিটি যদি নারীর হয়—মনসা মঙ্গলের কথা—দেবী মনসার দুপাশে ধনা-মনা ও তাদের সর্প-স্বরূপ। (প্রথম সীল)

বিভিন্ন সীল ছবিতে দেবী-উলক-দাঁড়িয়ে আছেন অবশ্য বৃক্ষের দুটি কাণ্ডের মাঝখানে। তাঁর ডানদিকে এক উপাসিকা বা হাঁটু মুড়ে হাত জোড় করে দেবীর নিকে বাড়িয়ে আছে। তাঁর পিছনে এক বড়ো ছাগল বা ভেড়া, তাঁর মুখ মাহুঘের মতো। একটু তকাত্তে সারি বেঁধে আঙপিছু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে লাভজন মেয়ে। পিঠে তাদের চুল ঝুলনো, মাথার তাদের লম্বা পাখির

পালক ( ময়ূর পুচ্ছ ? ) । দেবীর বা দিকে উপাসিকার লম্বু ছুরছে একটি ঝেৎ



### দ্বিতীয় নীল

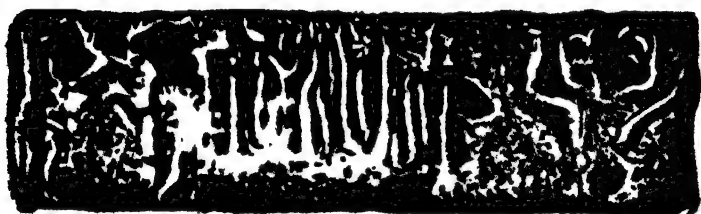
লম্বা বাক্সর মতো আছে । খাঁচা হতে পারে । ( তা হলে তাতে কোন পোষা  
জীব থাকতে পারে ? ) জলপাত্রও হতে পারে ।

নারীমূর্তিটিকে ঘন্টী অঙ্গুরা অথবা ডাকিনী মনে করা যেতে পারে ।  
উপাস্যা ও উপাসিকা দুজনেই উলঙ্গ এবং এলোকেশী । সুতরাং ডাকিনী  
হওয়া সম্ভব । অঙ্গুরারী ডেড়া পুষত, আর ডাকিনীরী পুরুষ মাত্রকে  
ডেড়া করে নিজের অধীনে রেখে দিত । তাই পুরুষমুখ ডেড়ার ছবিতে ডাকিনী  
নির্দেশ করে । সারি বাঁধা সাতজন এলোকেশী নারীমূর্তি কঙ্গবেদের একটি  
বিষকাড়া মস্তুর কথা ( ১.১২১.১৪ ) স্বরণ করায়—“লপ্ত স্বপারো অশ্রবঃ”  
( ‘সাত বোন তারা আইবুড়ো’ ) । উপাসিকাকে ধরলে এদের আটজনকে  
দেবী চণ্ডীর ঐন্দ্রিয়িকার প্রতিরূপ বলেও ধরা যেতে পারে । ( দ্বিতীয় নীল )

তৃতীয় সীলটির দু'দিকে ছাপ, একই বিষয়ের দুটি দৃশ্য। কোনটি আগে আর কোনটি পরে তা বোঝবার উপায় নেই। মার্শাল সাহেব হড়ঙ্গার প্রাপ্ত এই সীলটিকে ছবির পৌৰাণিক বা ধরেছেন তা আমার মতে ঠিক নয়। মার্শালের অজ্ঞমিত প্রথম পিঠ আসলে দ্বিতীয়। দ্বিতীয় পিঠ আসল। এইভাবে দেখেই আমি দু'পিঠেরই ছবি দুটির তাৎপৰ্য ধরতে পেরেছি। অর্থাৎ একরকম তাৎপৰ্য আমার মনে জেগেছে। ছবি দুটি দেইমত লাকালুম। (৩য় সীল)।



তৃতীয় সীল : প্রথম পিঠ (মার্শালের মতে দ্বিতীয়)



তৃতীয় সীল : দ্বিতীয় পিঠ (মার্শালের মতে প্রথম)

প্রথম ছবিতে একজন পুরুষ কাটারি বা কান্তে হাতে ধাড়িয়ে। তার সামনে এক উলঙ্গ স্ত্রীলোক বসে। তার মাথা থেকে গাছ বেরিয়েছে পাতা ছড়িয়ে। দ্বিতীয় ছবির বাঁ দিকে দুটি জন্তু-মাহুৰ অথবা জুত-মাহুৰ সামনা-সামনি রয়েছে। ডানদিকে এক উলঙ্গ স্ত্রীলোক মাথা নীচের দিক করে শুয়ে আছে। তার গর্ভ থেকে গাছ বেরিয়েছে পাতা ছড়িয়ে। দুটি ছবিতেই কিছু লেখা আছে অজানা অক্ষরে। দুটি ছবিরই অক্ষরগুলি প্রায় একরকম।

প্রথম ছবিটি সীতা পরিত্যাগের ইঙ্গিত দেয়। চাষী (অথবা চাষীর প্রতিনিধি,—সঙ্কণ) চবা মাঠ ছেড়ে চলে আসছে (অথবা ফসল কাটতে গেছে), চবা মাঠ প্রতিবাদ করছে। দ্বিতীয় ছবিটিতে জন্তু-মাহুৰ দুটি বেন লব-ফুশ, চবা-মাঠের ফসল। উলঙ্গ স্ত্রীলোকটি বেন পরিত্যক্ত চবা-মাঠ,

কসল তোলা হয়ে গেলে সে মাঠের আশ্রয় ঘন জুমিসর্গে প্রবেশ করে বিজ্ঞান নিচ্ছে।

সীতা-কথা যদি প্রতীক হয় তবে তাঁর গর্তাবস্থার পরিভ্রমণের পর পাতাল-প্রবেশ পর্বত কাহিনী আসলে এমনি ছবির অহুসারী হওয়া খুবই সম্ভব। কাহিনীটির কোন স্পষ্ট আভাস ভারতবর্ষের বাইরে স্বাধীনভাবে মেলেনি। সুতরাং কাহিনীটি এখানেই গড়ে উঠেছিল। নিছকসত্যতা কবিত্বলব্ধ। তাদের মধ্যে সীতাকথার এই অংশটুকুর উদ্ভব হওয়া খুবই সম্ভব।

ছবির সঙ্গে এই যে মিল দেখানুম এ সবটাই কল্পনা। তবে ভরসা করি এ কল্পনার কটনাক্ষাত্য বেশি নেই। যদি মিল সত্য হয় তবে তা লিপির পাঠোদ্ধারে সহায়তা করতে পারে।



## কর্তাভজার কথা ও গান

অধ্যাক্ষসাপনায় আচার-অহুষ্ঠান তদ্রম্যকে উপেক্ষা করে ক্ষয়বৃদ্ধিকে সবার উপরে স্থান দিবে শ্রীচৈতন্য বাঙালির ব্যক্তি ও সমাজ চেতনায় নতুন প্রেরণা জাগলেন। মুসলমান অধিকার কার্যেমি হবার আগে থেকেই দেশে অধ্যাক্ষচিত্তার এবং সমাজশাসনে ব্রাহ্মণের সার্বভৌমতা স্বীকৃত হয়ে এসেছিল। মুসলমান অধিকারের ফলে সমাজে ব্রাহ্মণ প্রায় দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে উঠল। ব্রাহ্মণের আত্মগত ছাড়া দেশের ও দেশের কাছে বড়ো হবার কোনো পথ রইল না! এমন অবস্থার দ্বারা নির্ধন, অশিক্ষিত, সমাজবহির্ভূত, সশাচারহীন তারা বৃহত্তর সমাজের পরিধিপ্রান্তে নির্বাসিত হল, অনেক বাধ্য হল অল্প সমাজ আশ্রয় করতে। হিন্দুসমাজের এই আত্মঘাতী উৎকেন্দ্রিক ও বিস্ময়জনক প্রবণতা যখন প্রকটতম সেই সংকটের দিনে শ্রীচৈতন্য ব্রাহ্মণ-স্নেহ, স্ত্রী-শূত্র, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ ভেদ গ্রাহ্য না ক'রে সকলকে ডাক দিলেন নিঃসীম উদার আকাশের তলে হরি-সংকীৰ্তনে। তাঁর চরিত্রমহিমায়, তাঁর ভাবতত্ত্বরতায় হিন্দু সমাজের বড়ো বড়ো সংস্কার বাবধান ভুটে গেল। মাছুষে-মাছুষে কোনো তুফাত রইল না ধর্মের আসরে, যেখানে ভেদাভেদের গণ্ডী ছিল নির্মমতায়। ভক্তিকে তপস্বীর উপরে স্থান দিলেন শ্রীচৈতন্য, ভক্তকে ভগবানের উচুতে। ভগবান্ যৈষ্ণবধর্মশালী, ভক্ত দীন। কিন্তু সে ভগবানের মহিমা নয়, ভক্তেরই সর্বতাপী প্রেম। ভগবান্কে রাজসিংহাসনে বসিয়ে ভক্ত খেজুর ডিকার ফুলি কাঁখে নিয়েছে। দারিদ্র্যের এই মহনীয়তা অধ্যাক্ষচিত্তার নবীন বেগ এনে দিলে বোধশ শতাব্দীতে।

শ্রীচৈতন্যের ভিরোধানের পর ধীরে ধীরে উদার বৃহৎ বৈষ্ণব সমাজে আচার-বিচার-অহুষ্ঠান-সংস্কারের ছোট-বড়ো দেওয়াল উঠতে লাগল। শ্রীচৈতন্যের সহজ ভক্তিরসধারা নতুন শাস্ত্রের ও নব নৈটিকতার ভাঁড়ে মূদো-চাপা পড়ল। গুরু আগে ছিলেন দ্বুতী, এখন হলেন মহাপ্রতীহার। বংশীবটের তটে নিত্য খেজু চরানো রাখাল অচলায়তনের গর্ভগৃহে জন্ম হলেন। তাঁর খেলুড়ি নকরবন্দী হয়ে রইল বাইরের উঠানে। ভগবানের প্রাণ্য অধিকার করলেন গুরু। গোলাই উপাধি তাঁরই কার্যেম হল।

ঐচ্ছিকের প্রাপ্যবান্ সত্য ধর্ম যাহুদের মনকে জাগিয়ে দিয়েছিল। সে মনকে আর একেবারে ঘুম পাড়ানো গেল না। ভক্তিরসের প্রশস্ত নদীর মুখে বীধ পড়ল, জল ছাড়া হতে লাগল কাটা খালে। কিন্তু এই বাহু, সহজ-সমধারা অবিচ্ছেদ্যে বইতে লাগল তলে তলে সমাজবহির্ভূত অনাচার-লাঞ্ছিত স্বদরিদ্র সাধকগোষ্ঠীর চিত্তক্ষেত্রকে সরল-উর্বর করে দিয়ে। আউল-বাউল-দরবেশ-সাঁই নামাঙ্কিত এই “সহজ” সাধকগোষ্ঠীই চৈতন্ত-সাধনার স্বাভাবিক অধর-সাধক।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাকের দিকে যখন কালের হাওয়ায় দিক-পাল্টানোর সূচনা হচ্ছে তখন এমন একজন “সহজ” সাধক আবার উদার ভক্তিসাধনাকে গোষ্ঠীগুহা থেকে বাইরে টেনে এনে ধর্মসাধনায় সকল যাহুদের সমান অধিকারের দাবি মেনে নিতে চেষ্টা করলেন। ইনি কর্তাভজা-সম্প্রদায়ের আদিগুরু “সত্য মহাপ্রভু” আউলেচাঁদ। এঁর সম্বন্ধে জনশ্রুতিই সম্বল। সে জনশ্রুতি কিছু কিছু সংগ্রহ করে গেছেন হোরেল হেয়ান উইলসন তাঁর ইংরেজি প্রবন্ধে, এবং অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর বাংলা বইয়ে। অন্যত্রও টুকিটাকি খবর পাওয়া যায়।

প্রসিদ্ধি আছে, উলাগ্রামবাসী মহাদেব বাকুই তাঁর পানের বরোজে নামগোত্রহীন শিশুকে পেয়ে যাহুধ করেন। ইনিই আউলেচাঁদ। এই নামকরণের হেতু সঠিক বলা যায় না। বাল্যকাল থেকেই এঁর ধরন ছিল পাগলাটে। সেজন্য “আউলে” (আকুল) নাম হতে পারে। আর আউলেচাঁদ মুসলমান কলন্দর-ফকীরের মত বেশ করতেন। সে কারণেও “আউলে” (আউলিয়া সূফী সাধকের উপাধি) নাম সম্ভব। আউলেচাঁদের গুরুর হাদিশ মেলে না। এ অজুমান নিতান্ত অধৌক্তিক নয় যে, তিনি হয়তো কোনো মুসলমান সহজ-সাধকের শিষ্য ছিলেন। আউলেচাঁদের মুসলমান শিষ্যও অনেক ছিল। কর্তাভজাদের সম্প্রদায়ে মুসলমান গুরু (“মহাশয়”) অজ্ঞাত ছিল না। আউলেচাঁদের শিষ্যবাণ্ড অনেকে ফকীরের মত থাকতেন। ছড়ায় আছে—

আউলেচাঁদ দোয়া গুরু সঙ্গে বাইশ ফকীর বাছুর তার।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধর্মসাধনায় ও ধর্মাহুষ্ঠানে যেখানে হিন্দু-মুসলমান-মত-নিরপেক্ষ উদার সমন্বয়ের প্রকাশ হয়েছে সেখানেই “সত্য” কথাটি একটি বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে। সূফী সাধকেরা আত্মাহুকে যখন পার্গিন্যাল দৈবর বলে ভাবতেন তখন তাঁকে নাম দিতেন “হক্”, সত্য। এই “হক্”—এরই প্রতিধ্বনি

পাই সত্যপীর-সত্যনারায়ণে<sup>১</sup> আর সত্য—মহাপ্রকৃতে। কর্তাভজারা সত্যের উপর খুব কোঁক দিয়েছেন। তাঁদের এ সত্য নীতিবন্ধার ব্যবহারিক সত্য-বিষায়ের সত্য নয়, এ সত্য দেশকালোচিতশাস্ত্রী অবয়ব অটল সত্য, সৎ।

চিন্তার বাক্যে কর্তে সত্য ও সহজ আচরণ আউলোটাদের প্রধান উপদেশ। পুরানো একটি গানে আ লোটাদের সত্যনিষ্ঠার, সহজ-স্থিতির ও ভাবনিষ্ঠরতার ছবি ফুটেছে—

এ ভাবের মানুষ কোথা হতে এল

এর নাইক রোষ সলাই তোষ মুখে বলে সত্য বল।

এয় সঙ্গে বাইশ জন

সবার একটি মন

‘অন্ন কর্তা’ বলি বাছ তুলি করলে প্রেমে ঢলাঢল

এ যে হারা দেওয়ার মরা বাঁচায় এর হুকুমে গঙ্গা শুখোল।

অবোধ স্বাধীনতার মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্কে কঠোর সংঘর্ষের উপরেও খুব জোর দিয়েছিলেন কর্তাভজা সাধকেরা। তাই ছড়ায় বলে—

মেয়ে হিজড়ে পুরুষ খোজা

তবে হয় কর্তাভজা।

আউলোটাদকে তাঁর ভক্তরা ঐশ্বেত্যের অবতার বলে মানতেন। চৈতন্ত-চরিতামৃত তাঁদের ধর্মগ্রন্থের মধ্যে প্রধান ছিল। বৈষ্ণব-ধর্মের সঙ্গে কর্তাভজার নান্দীর যোগ কখনো ছিন্ন হয়নি। তবুও কর্তাভজারা সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধে এড়িয়ে চলেছিলেন। তাঁরা উপাসাকে নাম দিয়েছিলেন কর্তা, যেমন কোনো কোনো সাধক সম্প্রদায় বলত সাঁই (“স্বামী”)। এই কর্তা, ঘরের কর্তা, আর সাধক লেখানে গিরী; সুতরাং সম্প্রদায়ে সাধক ছাড়া ব্যক্তির নাম হল “বরাতি” (বরবাজী)। শুধু মুসলমান বাঙালি কবিরাই ঈশ্বরকে “কর্তা” বলেছেন রীতিমত। এও বোধ করি কর্তাভজার সঙ্গে স্বকীসাধনার আর-একটা যোগসূত্র। “কর্তা” এই নাম দিয়ে ঈশ্বরকে এবং তাঁদের ইষ্টগুরুকে ভজনা করত বলেই বাইরের লোকে এই সাধনা ও সাধকগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করেছিল “কর্তাভজা” নাম দিয়ে।

১। মানিকপীরের মানিক বোধ করি প্রাচীন ইরানীয় খ্রীষ্টীয় ধর্মসম্প্রদায় প্রবর্তক মানিক (গ্রীক মানিকখোইওস্ - Manikheos)। ইরানে একলা (তৃতীয়-পঞ্চম শতাব্দী) এই ধর্মের প্রচার হয়েছিল। সুফীরা একে পীর স্বীকার করে নিয়েছেন।

আউলেটটাই বলতেন, “সত্য বল”, তাঁর অহুচর ভক্তরা ঘোণ করলেন “ওক ধর”—“সত্য বল ওক ধর সঙ্গে চল,” “সত্য বল সঙ্গে চল এই সার কথা”।<sup>২</sup> ভক্তদের কাছে সত্য আর ওক এক হয়ে গেল।<sup>৩</sup> ওকর উপর অটল নিষ্ঠার তাঁদের চরিত্র দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হল। “ওক সত্য বিপদ মিথ্যা”—এই হল কর্তৃত্বের সাবিত্রী মন্ত্র।

আউলেটটাদের প্রধান শিষ্য ছিল বাইশ জন। তাঁদের নাম—আম্বিরাম (আনন্দরাম), মনোহর দাস, নিত্যানন্দ দাস, নয়ান দাস, লক্ষীকান্ত, প্যালারাম (বা খেলারাম), কৃষ্ণদাস, কিহু, গোবিন্দ (মতান্তরে কিহু-গোবিন্দ ও রামনাথ), শ্যাম কীলারি, ভীমরায় রক্তপুত, পাঁচকড়ি (বা পাঁচু কইদাস), শিওরাম, বিজ্ঞানাস, শবর, হট্ট ঘোষ, বেচু ঘোষ, হরি ঘোষ, কানাই ঘোষ, নিতাই ঘোষ, রামশরণ পাল।

আউলেটটাদের মৃত্যু হয় সম্ভবত ১৬২১ শকাব্দে (১৭৬২-৭০ খ্রীষ্টাব্দে)। মৃত্যুর পর শিষ্যদের মধ্যে দু-মত হয়েছিল ওকর সমাধিব্যবস্থা নিয়ে। শেষে দু জনগায় দু রকম সমাধি দিয়ে মামাংসা হল। আউলেটটাদের কাঁধার সমাধি দেওয়া হল বোরালে গ্রামে, তাঁর দেহ সমাহিত হল চাকদার কাছে পরারি গ্রামে। শেষ পর্যন্ত শিষ্যদের মধ্যে প্রধান হলেন আটজন—হট্ট ঘোষ, বেচু ঘোষ, হরি ঘোষ, কানাই ঘোষ, নিধিরাম (মতান্তরে লক্ষরাম) ঘোষ, ভীমরায় রক্তপুত, শ্যাম বৈরাগী ও রামশরণ পাল। রামশরণ পাল এই দলের নেতা হন এবং ইনি ও ঐর ত্রী সতীমা ঘোষপাড়ার পাঁঠ স্থাপন করেন। আউলেটটাদের প্রত্যেক শিষ্যের নিজের নিজের দল ছিল, কিন্তু প্রায় সকলেই ঘোষপাড়ার সর্বাধিনায়কত্ব স্বীকার করে নিলে। রামশরণ পালের পর সতীমা, তারপর পুত্র রামচুলাল পাল (“শ্রীযুত চুলালচন্দ্র”) এবং তারপর পুত্রবধু ঘোষপাড়ার গদি পেয়েছিলেন। ওক তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচন করতেন। কর্তৃত্বের গুরুত্ব “মহাশয়” এবং শিষ্যরা “বরাতি” নামে পরস্পর উল্লিখিত হতেন। ঘোষপাড়ার পাঁঠাধিকারী ছিলেন প্রধান মহাশয়, “শ্রীযুত”।

২। জয়নারায়ণ ঘোষালের কর্মস্থানস্থান বিদ্যমান। পৃঃ ২১৮

৩। “ওক বলে সত্য কর্তা আছে একজন,” “সত্য মহাপ্রভু বলি ডাকিল সকলে,”

জনজন্তি বলে যে, ছিয়াত্তরের মহত্তরের সময়ে (১৭৬২-৭০) দুখশাপেরে হাটে চাল কিনতে গিয়ে রামশরণ আউলেটোদের দেখা ও কৃপা পান। একথা সত্য হলে রামশরণ আউলেটোদের শেষধরনের শিষ্য ছিলেন। কর্তা-তজ্ঞাদের সন্ম-সৃষ্টি রামশরণেরই কাজ। এই সন্তের প্রার্থনা হল পূরাপূরি আত্মলম্পণের—

কর্তা আউলে মহাপ্রভু  
তোমার হুখে চলি বুলি  
যা বলাও তাই বলি  
যা খাওয়াও তাই খাই  
তোমা ছাড়া তিলাৎ'নই  
গুরু সত্য বিপদ মিথ্যা।।

অথবা

ঠাকুর কর্তা আউলে মহাপ্রভু,  
আমি তোমার ভূমি আমার  
দয়া কর ঠাকুর।  
গুরু সত্য বিপদ মিথ্যা।।

কর্তাতজ্ঞার শীল হল তিনটি—সত্য, অব্যভিচার এবং অন্তের।

রামশরণ পালের প্রভাব ক্রমশ গুরুর গৌরব আচ্ছন্ন করে ফেললে। কলিকাতার ধনী ও শিক্ষিত সমাজের সময়ে ও অন্যরে এঁর ও এঁর গোষ্ঠীর অধিকার বিদ্রুত হতে লাগল। ভূঁইয়াদের মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে কলিকাতার বোধ করি সবচেয়ে প্রগতিশীল ব্যক্তি ছিলেন।<sup>৪</sup> এঁরা বৈষ্ণব বংশের ছেলে, তবুও ইনি কর্তাতজ্ঞার মাহাত্ম্য অস্বীকার করতে পারেননি। বাংলার সবচেয়ে বড়ো কৃষ্ণলীলা-কাব্য

৪। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে ইনি এবং এঁর পিতা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল বড়লাটের কাছে এক সুদৃষ্টিত দরখাস্ত দিয়েছিলেন কলিকাতার অনাথ আতুরদের অন্নবস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা সংকর ইত্যাদির সুব্যবস্থার জন্য। এই জন্য এঁরা কলিকাতার অনাথ আতুরদের আদমস্ফোরীও করেছিলেন। দ্রাবিড় সুলক্সেনাথ সেন সম্পর্কিত প্রাচীন বাঙ্গালা পদ্যসংকলন চুক্তি।

লিখেছিলেন অন্নরায়ণ কাশীতে বলে ১২২১ সালে। এতে তিনি ঐক্যের ভবিষ্যৎবাণীরূপে দিক্‌শাল ধর্মার্চ্যদের মধ্যে রামশরণ পালের নাম করেছেন বীতশ্রী, কবীর, নানক, বল্লভ ও লামার সঙ্গে।

পশ্চিমেতে ইচ্ছা মণিঃ উত্তরে কবীর গুণী  
পূর্বদিকে ঐরামশরণ

দক্ষিণে বল্লভ নামে মনোরম গুণধামে

মোর তত্ত্ব কবির বাথানে।<sup>৬</sup>

উত্তরেতে লামা গুরু নানক দক্ষিণে<sup>৭</sup>

রামশরণ নামে এক হবে পূর্বধামে।

পূত্ররূপী অবতার হইবে পশ্চিমে

ইসু জাইটে নাম তার রাধিবেক জনে।

তিন দেশী তিন পন্থ করিয়া মিলন

ইয়ুকে সকলে তারা করিবে প্রধান।

ইসু বিনা গতি নাই হইবে মন্ত্রণা।<sup>৮</sup>

উপরের উদ্ধৃতি থেকে কর্তাভজা সম্প্রদায়ে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাবের গুরুত্ব বোঝা যায়।

## চুই

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের কোনো কোনো শিক্ষিত ভক্ত খ্রীষ্টধর্মের মুসলমান ধর্মের ও রামমোহন রায় প্রবর্তিত ব্রহ্ম-উপাসনার মিলন ঘটিয়ে একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছিলেন। এই সম্প্রদায়ের গুরুর নাম রামবল্লভ, তাই সম্প্রদায়ের নাম হল রামবল্লভী। ভক্তদের নাম হল বল্লভ-বল্লভী। রামবল্লভী গোষ্ঠীর প্রাথমিক ঐক্য ধর্মের তথা “ব্রহ্ম” মতের প্রাধান্য স্পষ্ট ছাপ আছে—

হে দেহ আত্মার স্রষ্টকর্তা অদ্বিতীয় পরমাত্মা সচ্চিদানন্দময়  
সত্য ও তোমার নিত্যদাস অগণগুরু নিগুণ শিব ঐরামবল্লভ

৫। অর্থায় Manichee ( পূর্বে চন্দ্রব্য )

৬। পৃঃ ২১৪

৭। পাঠ “পশ্চিমে” ৮। উপসংহার

ঠাকুর, উভয়ের ধর্মবাদের পূর্বক নিবেদন করিতেছি অধ্যাত্মম  
বলতবলতী সকল, ইহাদিগের প্রার্থনা এই যেন কোন শাস্ত্রাদি  
অধ্যয়ন দ্বারা যে তোমার তত্ত্ব বোধ হয় এমন বুদ্ধিসিদ্ধ হয় না,  
যেহেতু এক শাস্ত্রে এক মত সিদ্ধ হয়, দ্বিতীয় শাস্ত্রে তন্নির। অতএব  
মত হইতে মতান্তর বহুপি হইল, তবে কি প্রকারে স্থির হইতে পারে ?

হে কর্তা, আমরা অজ্ঞানী ও অবোধ, আমাদিগকে তৃপ্তা করিয়া  
সত্য বোধ করাইয়া প্রবোধ দিতে আজ্ঞা হউক।

হে মহাপ্রভো, মন্দ হইতে রক্ষা করুন, এবং সংকর্য করিতে  
প্ররুতি ও সাহস ও সম্পত্তি প্রদান করুন। ইহা করিতে বহুপি  
আপনকার সন্তোষ হয়, তবে সিদ্ধ হউক।<sup>১২</sup>

বাঁশবেড়ের শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণকিঙ্কর গুণসাগর ( বা গুণাকর ) ও  
মতিলালবাবু রামবল্লভী গোষ্ঠীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এঁর: ১৮৩১  
খ্রীষ্টাব্দের ফাল্গুন মাসে কাঁচড়াপাড়ার কাছে পাঁচঘরা গ্রামে এক বিরাট উৎসব  
অনুষ্ঠান করেছিলেন। সমসাময়িক সংবাদপত্রে এক প্রত্যাকদশী<sup>১০</sup> এ উৎসবের  
কৌতুকবহু বিবরণ দিয়েছিলেন—:

এই কএকজন বাবু একত্র হইয়া মোর কাঁচড়াপাড়ার অন্তঃপাতি  
পাঁচঘরা সাকিনে একজন পোদের তবনে এক ইষ্টকনির্মিত বেদি  
তত্বপরে চৌকী এবং তত্বপরে কুহুমমালা প্রদানপূর্বক পরম স্নেহে  
পরম সত্য নামক বেদি স্থাপন করিয়া বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য আয়োজন-  
পূর্বক বিবিধবর্ণ প্রায় পঞ্চ সহস্র লোক এক পংক্তিতে বসিয়া অন্ন-  
ব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়াছেন এবং ত্রিবেণী ও বাঁশবেড়িয়া ও  
হালিশহর নিবাসী একশত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া এক এক পিতলের  
খাল ও সন্দেশাদি বিদায় পাইয়াছেন এবং তৎস্থানে কিরিকীতে  
বাইবেল পুস্তক পাঠ করিয়াছে এবং মুসলমানে কোরাণ পাঠ করিয়াছে  
এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গীতা পাঠ করিয়াছেন এবং ঐ পরম সত্য বিষয়ক  
হুই নহবত হুই স্থানে বসাইয়াছিলেন একটা শুন্তের খালের সম্মুখে

৯। উপদেশক পটিকা ১৮৪৭ পৃ: ২৫৪

১০। অঙ্গলন্দ মুখোপাধ্যায়, সংবাদ প্রভাকর। ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৮৩১ ( সংবাদপত্রে  
সেকালের কথা। দ্বিতীয় খণ্ড। পৃ: ৩১১ )

আর একটা ঐ বেদির নিকটে আর দুই ইশতেহার কবিতা দুই স্থানে রাখিয়াছিলেন তাহাতে পরম সত্য বিষয়ের অনেক বিবরণ লেখা ছিল... অক্ষয়কুমার মস্ত বলেন, “অন্ত হওয়া দিরাছে, ইহারি খেচরার ও গোমাংসাদি সকল ত্রব্যেরই ভোগ দিয়া থাকেন। ইত দুই, মহেশ্বর ও নানকের এক এক ভোগ হয় এবং এক এক জন এতৎ মহাজন স্বরূপ হইয়া তদীয় ভোগের নামগ্রী ভক্ষণ করিয়া থাকেন।”

## তিন

কর্তৃত্বজ্ঞানের বাধাধরা কোনো শাস্ত্র গ্রন্থ নেই। তাঁদের সাধারণ পাঠ্য ছিল চৈতন্যচরিতামৃত, নরোত্তমের প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা ও বৈষ্ণব সহজ মতের “লালশরী রচে বা ভাবে সে বলতে পাচ্ছে না মুখে”। তবুও চেষ্টা করেছেন সাধ্যমত সহজ করে অনেকর জ্যোতার বোধগম্য করতে—

তাই নাগাড়ের তদ্বিরে কেউ পারে না এড়াতে,  
বিবেচনা করে বিধিমতে দেখ তা সাক্ষাতে  
দেখ সন্তান আদি যে নারীর হয়নি হবার নয়,  
তবু সেই দোষে তারে বড়্যা হবে কর,  
গর্ভে খলো না,  
কোলেও করে না,  
ছেলেপিলের জননী সে হ'তে পারে না,  
তবু বড়্যাদোষ খেদ নিম্নিত তার সেই ঝড়িয়ে রয়েছে নাড়ে,  
লালশরী কর সে নৌকা চালার হাল ঠেলা পাল গুণ বাড়ি।

ভালোমন্ডর দোটারী ঝড়িয়ে প্রয়োজন-আয়োজনের বোকা নামিয়ে দিলে



তবেই ভিত্তে সহজ আনন্দের উল্লস হয়। এই কথাটাও কবি কিরে কিরে বলেছেন—

পিছে ভর গিয়েছে ঘুচে ইচ্ছে যা হতেছে অনারাগে গাছতলাতে ব'লে পাই।  
পরমসাধা-বস্ত্র সাধনলভ্য নয়, “যমেবৈষ কুণ্ডে তেন লভ্যঃ”—

ভাবলে কি ভাবের মাহুয পাবে,  
তার আশ্ৰিতা থেকে ইচ্ছেটি না হলে কি করতে এসে দেখা দেবে।  
তাই ভাবটি সে কি রাজি হবে।  
তাট রে অভাবিত অব্যাহিত ভাবতে হয় বারে  
তার পরজি হয়ে রাজি করতে হয় তারে,  
যদি দেশজন্মণে এসে কোনক্রমে মনজন্মে অমনি কিরে বাবে।

অহংকারের আড়াল ঘুচে গেলে অন্তরে সহজভাবে প্রবেশ হয় অব্যাহিত।—

যারা নেকড়া পরে আখড়া করে কাড়াল বেশে,  
সহজে তার হিরার মাঝে বিরাজে সেই সহজে এসে,  
এই যে ব্রহ্মপদ পদার্থ তত্ত্ব না করে  
নির্বচ অনির্বচ অর্থ তার ঘরে,  
লালশয়ী বলে যে আদেশে উড়ছে খুশির নিশানা।

“ব্যবশায়ান্তিক্য বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে” -

যদি ভিক্ষা মেগে খেতে বাই এই ভবের বাজারে,  
মালসা হাতে ক'রে পথে পথে ভোর-কপনি পরে,  
আমি যে লোকের শাফাতে জানাইগে জিগির,  
তখনি সে দেখতে পেয়ে বলে তুই কোন দেশী ফকীর,  
বলে, “তাক্তা! তাক্তা লাগু কুড়া কুড়” না বাজাস না গাস,  
অমনি কি আমার কাছে ধামকা ভিক্ষা নিতে চাস।  
আমি সেই অবধি ভেবে দেখি পোষায় না ভাই কিছুইতে।  
লালশয়ী বলে ভেবে দেখি পোষায় না ভাই কিছুইতে।

হঠাৎ-আলোর বলকানি যে কখন চিত্তকে উদ্ভাসিত করে দেয় তার ঠিকঠিকানা নেই বিবিধ নিবন্ধ। কর্তৃত্বজ্ঞানের নিজের কথার তাঁদের মত ও তত্ত্ব পাওয়া যায়, শুধু লালশশীর গানে। গানগুলি সংখ্যায় প্রায় পাঁচ শ।<sup>১১</sup> গানের ভণিতার কবির নাম পাই "লালশশী", কচিং "শশীলাল" ও "শশীলাশন"। "লালশশী"র আসল নাম হুলালচন্দ্র।<sup>১২</sup> "হুলাল"-এর "হু" ছেড়ে দিয়ে "চন্দ্র"-এর প্রতিশব্দ "শশী" নিয়ে লালশশী নামের উৎপত্তি। ইনি ছিলেন রামশরণ পালের পুত্র রামহুলাল পাল। লালশশীর জন্ম ১৮৮২ সালের আষাঢ় মাসে<sup>১৩</sup>, বৃত্তা ১২৫৯ সালের পরে নয়<sup>১৪</sup>। অনেকগুলি গান ১২০১ থেকে ১২০৫ সালের মধ্যে লেখা ঘোষণাডায় কান্ডন ও আষাঢ় উৎসব উপলক্ষে<sup>১৫</sup>। অনেকগুলি গান কবিগানের মত "সওরাণ-ভাবাব" রূপে লেখা। এগুলিকে কবি "সহর" নামে উল্লেখ করেছেন। অল্প গানগুলির নাম "টেউ"। সহর ভাবতরঙ্গিনীর, টেউ ভাবসমুদ্রের।

গানগুলির মধ্যে তত্ত্বকথা আছে, কিন্তু সে তত্ত্বকথার নাম তত বেশি নয় মত রচনার অভাবনীয় সরল নবীনতার। অপরিচিত ছুঁছুঁ শব্দ একেবারেই নেই। চলিত বিদেশী শব্দ বজ্রনের চেষ্টা নেই। সাধুভাষার ব্যাকরণের কোনো উদাহরণ এর থেকে মিলবে না। যে কথা মুখের সবচেয়ে কাছাকাছি যে ভাব মনের অন্তরঙ্গ কর্তৃত্বজ্ঞান কবির কারবার তাই নিয়ে। ছন্দেও মুখের সরল ভাষার ও মনের সহজ অবাধগতি। মোটকথা সেকালের

১১। 'কর্তৃত্বজ্ঞান গীতাৱলী' (প্রথম খণ্ড ১২৭৭) ও 'প্রীতীমুদ্রের পদ' (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩০০) নামে মুদ্রিত

১২। 'প্রীতীমুদ্রের পদাবলী' (কর্তৃত্বজ্ঞান গীতাৱলী পৃঃ ২)

১৩। প্রীতীমুদ্রের পদাবলী পৃঃ ২২০

১৪। প্রীতীমুদ্রের পদাবলীর শেষ গানে এই তারিখ পাই। এটি লালশশীর রচনা নয়। তাঁর মৃত্যুর পরে কোন ভণ্ডের লেখা বলে মনে হয়।

১৫। প্রীতীমুদ্রের পদাবলী। পৃঃ ৫৭, ৬০, ৮২, ৮০, ৮২, ৩০২

পোশাকি কাব্যকলার সাজ গানগুলিতে একেবারেই নেই। অধিকাংশ গানে সেকালের জনগণের পরিচিত ও অল্পমোহিত তত্ত্বকথার নিরর্থ বাগাড়ম্বর আছে। তবুও বলব এই গানগুলিতে সেকালের বাংলা গীতিকবিতার প্রাণস্পন্দন আছে, শ্রাবীজনাথের আগে আর কোথাও পাইনি। স্তম্ভরায় লালশর্মীর বিশিষ্ট করেকটি গান বিগত শতাব্দীর গোড়ার দিকের “আধুনিক কবিতা”। লালশর্মীর গানে এমন ছত্র দুর্বল নয় যা পড়লে অনুপেক্ষিত অভিনবত্বে শ্রাবীজনাথের প্রতিধ্বনি ভেবে চপ্পকে উঠতে হয়। যেমন, “রাস্তার উপর বাসাঘর নাগর দোলনা”। “তোমার মনের কথা আমারে শুনালে ভূমি”, “ভূমি ভাবচ মনে কশে কশে যে ডাবনা”, “আসতে আর যেতে পথে পথেতে কাল গেল”, “অপরাধ মার্জনা কর প্রভু”, “ভাবতে লেগেছি ব’লে করব কি „এখন”, “আমার এখন মনে হলো”, “ঘারা দারে ঠেকিলে কাঁদে, দার কাটালে কথার বোলে ঢাল তলোয়ার বাঁধে”, “এলে এলে এলে না কেন গে বড় কঠিন”, “কাজ কি গেই মনের মাছুর বাইরে বার করে”।

ভাথের অগম্য ভাবার অধ্বা অধ্যাত্ম-অহুভূতি কবি যে প্রকাশ করতে পারেননি লেজন্ত ব্যাকুলতা জানিয়েছেন বারে বারে,

কিন্তু তাই মনের মাছুর চিনতে পারিনে।

আমি তথতে ব’লে ব’লে

ফিরছি ঐ তল্লাসে

সকলকে দেখতে পাচ্ছি এখানে,

হবে কি তাই ভাবতেছি শরনে শপনে।

আমি আপন হতে কোন মতে বুদ্ধিমত্ত নই,

দেখতে যে না পার চক্রে সাক্ষাতে দেখিয়ে বলে ঐ,

বত আশ্রমানেতে পাখী ওড়ে অহ্নি পাখা দিই শুনে।……

একবার অগ্রবীণের মহোৎসবে দেখতে পেলাম একা,

আখড়াধারী কত পুরুষ নারী হয়না লেখা জোখা।

হ'ল দেখতে দিয়ে বারেক চেরে আপনান্তে তুল,  
বল কি তুল হ'রে দেখি আজ বুঝি বাবল আরতুল<sup>১৬</sup> ।  
জানি আত্মপাত্ত অবিশ্রান্ত মন্ত<sup>১৭</sup> বিচক্ষণ,  
অমনি সে গুণমণি আপনি<sup>১৮</sup> করেন অরণ ।  
বা হারিয়েছিলাম বসন্তে গেলাম দেখতে পেলাম মর্পণে ।  
লালশশী বলে বসন্তে গেলাম দেখতে পেলাম মর্পণে ।

দাস্তভাব ভক্তের আভাবিক । বৈষ্ণবকবি প্রেমাদিশব্যে ভক্তকে ভগবানের  
উপরে তুলছেন, ভগবান ভক্তের মহিমার কাছে নতশ্রি হয়েছেন, তা দেখেছি ।  
আমাদের কর্তাভা করি ভক্ত-ভগবানের সম্পর্কে ছোট-বড়ো ভেদাভেদ  
একেবারে উড়িয়ে দিয়েছেন । নিভেদের নিঃসীম দৈন্তের অন্ত কোনোরকম  
কৈক্ল্যত নেই । গরীব সংসারের গিঞ্জির মত তিনি জানেন যে, এর বেশি  
কর্তার মরোদ নেই—

বল কি আমি সবার দশার কথা,  
কাঙালের পলটনকে যে বানালে সে ত গরীব বিখ্যাতা,  
তুনিলে পাছে মনে পায় ব্যথা ।  
দশার কথা মনে করিলে  
তখনি তাই বহে ধারা নয়নের<sup>১৯</sup> জলে,  
ভেনে কুটে কবুতে কবুতে অগ্নি তাই ধরে মাথা ।

১৬ । পাঠান্তর 'কাঁদিল আর তুল' ।

১৭ । ঐ 'জানি অন্ত ধরে সন্তসারে মন্ত'

১৮ । ঐ 'তখনি' ।

১৯ । ঐ 'নয়ন' ।

তোমরা গড়নদারকে জান না এ বড় বিষয়,  
 লাঙএল আর দোরের বত ছিরে চাহারম,  
 তবে মাত্র বিধি এই চার জন,  
 চার বর্ষে হচ্ছে দেখ ত্রিকূল স্বজন,  
 যদি কিরে তাকিরে না দেখিবে দেগবে সিরে কি কোথা ।

এই বিখ্যাত ভোগাভোগ ভোগান সবারে,  
 বিষয় বুঝে দিচ্ছে বারে বারে,  
 যে বত সহিতে পারে ।

দেখ খোস খোরাকে পোষাক আদি যার বত আশা<sup>২০</sup>  
 খুব সে ঘটার অট্টালিকায়<sup>২১</sup> সকলের বাসা,  
 মণিমুক্তা প্রবালে খচিত ;  
 কোন স্থখে কেহ ত তাই নহেকো বকিত,  
 তাই আচারে ব্যবহারে কোন বিধি কেমন<sup>২২</sup> দাতা ।

দেখ আমাধিগের গড়নদার জোড়েন নেকড়া-কানি,  
 চাইলে পরে তাই করেন আমদানি,  
 তাই দেখ তার নিশানি ।

২০। এ 'সকলি বাসা' ।

২১। এ 'খুব বড় অট্টালিক' ।

২২। এ 'যে বিধি কেমন' ।

এই ঘূষের নদী জলের তাঁড় নিকড়ে<sup>২৩</sup> বত  
 চাইতে না চাইতে যে ভাই পাই অবিরত,  
 কুঁড়ে বই আর গড়নদারে গড়তে পারেন ন',  
 আর শইলালে হেনে বলে শব্দে খেজুরের পাতা ॥

এ কথা এমনভাবে এর আপে আর কে বলেছে !

২৩। এ 'আকড়ে'।

---